# বাঙালি মেয়ের ভ্রমণকথায় বিবর্তমান বাঙালি সমাজঃ  কৃষ্ণভাবিনী থেকে নবনীতা (নির্বাচিত রচনা অবলম্বনে)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি. ( কলা শাখা )

উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষকঃ শ্রেয়সী চক্রবর্তী

তত্ত্বাবধায়কঃ ড. শম্পা চৌধুরী, ড. বাসবী রায়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২১

# বাঙালি মেয়ের ভ্রমণকথায় বিবর্তমান বাঙালি সমাজঃ  কৃষ্ণভাবিনী থেকে নবনীতা (নির্বাচিত রচনা অবলম্বনে)

**Certified that the Thesis entitled**

" বাঙালি মেয়ের প্রসঙ্গকথায় বিবর্তমান বাঙালি সমাজ : কৃষ্ণভাবিনী থেকে নবনীতা (নির্বাচিত রচনা অবলম্বনে) "

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Sampa Chaudhuri, Professor, Department of Bengali and Dr. Basabi Roy Retired Professor, Department of Bengali, Jadavpur University

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor : Basabi Roy 16.01.2021
Dated :
Sampa Chaudhuri. 16.01.2021

Candidate : [signature]
Dated : 15.01.2021

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

২০১৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পিএইচ.ডি. স্কলার হিসেবে যোগদান এবং থিসিসের কাজ শুরু করার পর সময় বয়ে গিয়েছে হুহু করে। জীবনে সাংঘাতিক সব পরিবর্তন এসেছে কালের নিয়মে। কিন্তু কিছু মানুষ রয়ে গিয়েছেন একই রকম সাগ্রহ স্থিতাবস্থায়। তারও বহুবছর আগে থেকে একই বিভাগের ছাত্রী হওয়ার ফলে কিছু মুহূর্ত রয়ে গিয়েছে অনন্তের ফ্রেমে বন্দী হয়ে। প্রথমেই বলব আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রীমতী শম্পা চৌধুরী এবং শ্রীমতী বাসবী রায়ের কথা। শম্পা দি আমার জীবনের সমস্ত উত্থান-পতনের সাক্ষী এবং এই কাজটির দিকে আমাকে এগিয়ে দিয়ে অনন্ত স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। স্নেহের সঙ্গেই করেছেন প্রয়োজনীয় শাসন। প্রতি অধ্যায় কাজের ভালো মন্দ খুঁটিয়ে বিচার করে বারে বারে মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। আজ তারই ফলশ্রুতি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি। দূরে থাকার কারণে বাসবী দির সঙ্গে দেখা কম হয়েছে, কিন্তু সর্বদাই তাঁর স্নেহে এবং সুপরামর্শে অভিসিঞ্চিত হয়েছি।

এবার বলব বাবা মায়ের কথা। জীবনের সুকঠিন সময়ে হাল ধরে পাশে থেকে এই বিপুল কর্মযজ্ঞ উত্তরণে তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাবা এই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিনিয়ত তাড়না করে গিয়েছেন, বকেছেন (ঠিক স্কুলজীবনের মতো ), বুঝিয়েছেন, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন। মা ও সে বিষয়ে পিছপা ছিলেন না। এই একটি বিষয়ে বাবা মায়ের মতবিরোধহীন যৌথ পদক্ষেপ আমাকে বিস্মিত করেছে!

ব্যাঙ্গালোরের বাড়িতে বসে একমনে কাজ করতে গিয়ে বারবারই মন কেমন করেছে পুত্র পূর্বমেঘের জন্য, বন্ধ দরোজার ওপার থেকে বারে বারে তার করুণ গলার ডাক শুনে। তাকে তার প্রাপ্য থেকে যথেষ্ট বঞ্চিত হতে হয়েছে মায়ের থিসিসের কল্যাণে। সেটুকু এইবার সে সুদে আসলে পুষিয়ে নেবে আশা করি। গৃহকর্তাটিরও বহুদিন যাবৎ বেহাল দশা এইবারে মেরামত করা গৃহিণীর পক্ষে সম্ভব হবে হয়তো। তাছাড়া তিনি আমার বিপদে মধুসূদন, যাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ হবে না ঋণ।

যাদবপুরে পড়তে আসার বহু আগে থেকে যে মানুষটির গলার স্বর শুনতাম ফোনে , আর পড়তে আসার পর যিনি আমাকে নাতনী সম্বোধনে আত্মীয়তায় আবদ্ধ করেছিলেন, সেই স্যর, শ্রীযুক্ত পিনাকেশ চন্দ্র সরকারকে আমার প্রণাম। জীবনের প্রতিটি আনন্দ এবং যন্ত্রণার মুহূর্তে তিনি আমাকে মানসিক ভাবে শক্তি যুগিয়েছেন। কোনোদিন ভুলব না যাদবপুর ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সমস্ত স্যর এবং দিদিদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছি স্ট্যাকে একা একা। তাঁরা উষ্ণতায় স্নেহে মুড়ে দিয়েছেন যতদিন কলকাতায় ছিলাম এবং নিয়মিত লাইব্রেরিতে গতায়াত ছিল ততদিন পর্যন্ত। বিভাগে যোগদান করার সমস্ত রকম প্রশাসনিক এবং দপ্তরী-দায়িত্ব একা হাতে সামাল দিয়েছিলেন রিসার্চ সেকশনের শ্রদ্ধেয় গৌরাঙ্গ দা। উনি না থাকলে আক্ষরিকার্থেই এই কাজটি শুরু হতে পারত না। ওঁকে স্মরণ না করে এগিয়ে গেলে সে অন্যায় ক্ষমাহীন। শম্পা

দির আগ্রহে মেয়েদের কথার কাণ্ডারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী চর্চা কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্রী অভিজিৎ সেনের সঙ্গে দেখা করে অত্যন্ত সুপরামর্শ পেয়েছি।

আরো প্রচুর মানুষ, বিবিধ আত্মিক সম্পর্ক , বিভিন্ন লাইব্রেরি (বিশেষত সাহিত্য পরিষৎ এবং দিদির চিঠি নিয়ে গুটি গুটি পায়ে হাজির হওয়া উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি) , প্রচুর পুরোনো বই, পত্র-পত্রিকা, একা একা ঘুরে বেড়ানো বইমেলা এবং বাংলা ভাষা কে আমার সশ্রদ্ধ বিনতি। আমার অতিবৃদ্ধ ল্যাপটপটি শতচ্ছিন্ন অবস্থাতেও আমাকে এই গবেষণা বৈতরণী পার করে দিলেন, এঁকে শুধু কৃতজ্ঞতা জানালে কিছুই বলা হয় না।

সবশেষে আমার জীবনদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতার পালা সমাপ্ত করলাম।।

# সূচী

ভূমিকা

ক. ভারতবর্ষ ভ্রমণ

১. তীর্থভ্রমণ

২. শহুরে ভ্রমণ

৩. মুসলিম মেয়ের ভ্রমণ

৪. গ্রামবাংলায় ভ্রমণ

৫. কবির সঙ্গে ভ্রমণ

৬. জেল ভ্রমণ

৭. একাকী অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণ

খ. ভারতবর্ষের বাইরে ভ্রমণ

১. বিলেত ও ইয়ুরোপ

২. মধ্যপ্রাচ্য

৩. জাপান

৪. চীন

উপসংহার

পরিশিষ্ট- গ্রন্থতালিকা

# ভূমিকা

মেয়েদের কথা এবং নন-ফিকশন এই দুই সংরূপের লেখা পড়তেই আমি খুব ভালোবাসি। একটা সময়ে পর পর রানী চন্দ, রাণী মহলানবিশ, নবনীতা দেবসেন-এর দিকপাল ভ্রমণকথাগুলি পড়তে পড়তে মাথায় এসেছিল এঁদের নিয়ে কাজ করার ভাবনা। মনে হয়েছিল এই নারীদের নিয়ে যদি কাজ করার সুযোগ আসে, তাহলে আরো আরো গভীরে ডুব দিতে পারবো। এমন সব অসামান্য লেখার সঙ্গে কাটবে দিন-কাল। আমাদের কাজের বিষয় ‘‘বাঙালি মেয়ের ভ্রমণকথায় বিবর্তমান বাঙালি সমাজঃ কৃষ্ণভাবিনী থেকে নবনীতা (নির্বাচিত রচনা অবলম্বনে)’’। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির জন্য আমরা বেশ কিছু ভ্রমণকাহিনীকে বেছে নিয়েছি আমাদের বক্তব্যবিষয়টি প্রাঞ্জল করার লক্ষ্যে। এগুলি ছাড়াও মেয়েদের লেখা প্রচুর ভ্রমণকাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিন্তু হাতে গোনা কয়েকটি ছাড়া খুব ভালো (সুসম্পাদিত) সংকলন গ্রন্থ একেবারেই বেশি নেই, এবং আজকের যুগেও আমাদের অগ্রজা এই পূর্বনারীদের দু’একজনেরই নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। সকলের নাম জানা বা তাঁদের কাজের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার কথা তো ছেড়েই দিলাম। কোথাও কোনো বিখ্যাত সংকলকের সংকলন গ্রন্থে জ্ঞানদানন্দিনী হয়ে গিয়েছেন জ্ঞানদাসুন্দরী আবার কোথাও বা পুরোনো ভাষাকে নতুনের মত করে তোলার চেষ্টায় সম্পাদক কলম চালিয়েছেন মূল লেখাগুলির উপরে। প্রথমটি মুদ্রণ প্রমাদ ভেবে নিলেও দ্বিতীয়টি আমার একেবারেই অসমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়েছে। বেশিরভাগ সময়েই প্রবাসে থাকার দরুণ আমাকে কিছুক্ষেত্রে এই বইগুলির সহায়তা নিতে হয়েছে, কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি সাহিত্য পরিষৎ বা জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীর মতো পুরোনো লাইব্রেরী থেকে পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে পুরোনো মূল লেখাগুলি দেখার। বিশেষ করে একটি সংকলন গ্রন্থে স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখার বিভিন্ন অংশ কাটছাঁট করে সম্পূর্ণ লেখা হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে, যা আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয়েছে একটি অত্যন্ত বিপদজনক প্রবণতা। সৌভাগ্যবশত বেশ কিছু বছর আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যাচর্চা বিভাগের অতি যত্নে এবং অত্যন্ত সুসম্পাদনায় প্রকাশিত কিছু বই আমার কাছে ছিল, সেখান থেকে আমি সহজেই পরবাসে বসেও স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখার মূল পাঠ উদ্ধার করে ফেলতে পারি এবং কাজটি অনেকাংশে সৎ এবং মূলানুগ থাকার সুযোগ পায়।

আসলে আমাদের আলোচিত নারীরা এক এক জন মণিমঞ্জুষা বিশেষ। যেমন তাঁদের ভাবনার পরিধি, তেমনি গভীরতা আর ততোধিক সুন্দর তার প্রকাশভঙ্গী। প্রতিটি ভ্রমণকথা (এমনকি একই গন্তব্যের হলেও) অদ্বিতীয়। আমি মনে করেছি এই লেখাগুলি একেবারে মূলানুসারী হয়েই পাঠকের কাছে পৌঁছনো উচিত। এই কারণে বিভিন্ন অধ্যায়ে সারদাসুন্দরী দেবী, সৌদামিনী দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস বা  স্বর্ণকুমারী দেবীর  (এবং আরো অন্যান্যদের) লেখা আমি যতোটা সম্ভব সরাসরি তুলে দিয়েছি। সেখানে নিজের কলম চালানোর প্রয়োজন একেবারেই বোধ করিনি। ফলে কিছু ক্ষেত্রে কয়েকটি অধ্যায়ে উদ্ধৃতির পরিমাণ বেশ বেশি হয়ে পড়েছে। তবে কিছুতেই তাকে অনাবশ্যক বাহুল্য বলা যাবে না সে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত। অবশ্যই ভবিষ্যতে এ বিষয়ে নিজের আবেগকে আরো অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়াসী হবো।

কোনো কোনো লেখা ট্রাভেল এক্সপেরিয়েন্স অর্থাৎ ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা (অন্যান্য স্মৃতিকথা বা ডায়েরির অংশবিশেষ; যেমনঃ সব হতে আপন থেকে নেওয়া শ্রী রানী চন্দের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা),  আবার কোনো লেখা ট্রাভেলগ, অর্থাৎ নির্ভেজাল ভ্রমণলেখ বা ভ্রমণস্মৃতি। তবে এই দুরকম উপসংরূপ ই মিলে যায় ট্রাভেল-ন্যারেটিভ-এর সুবিস্তৃত অঙ্গনে। তাই সবই

ভ্রমণকথা, যেখানে ভ্রমণই মূল কথা। তাতে সময়ের চলন সরল কিম্বা অধিকমাত্রায় বক্রগতিতে হলেও ভ্রমণ আর প্রাণভরা ভ্রমণের আনন্দ, ফাঁক ফোকর গলে পাওয়া স্বাধীনতার স্বাদ থেকে স্বাধীন দেহমনের অনন্ত নীলাকাশ, নারীর নিজস্ব বয়ানের সামাজিক এবং ব্যক্তিক গুরুত্ব এই ধারনাগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই কাজে। যে কারণে কিছু অনুলিখন কেও আমরা আমাদের কাজের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি। সারদাসুন্দরী দেবীর অনুলিখনটির গুরুত্ব সমধিক। কেশব চন্দ্রে সেনের অনুগামীদের কাছে এটি ঐতিহাসিক মর্যাদায় মন্ডিত।

আমাদের নির্বাচিত ভ্রমণকথাগুলিকে আমরা মূলত গন্তব্য অনুসারে বিন্যস্ত করেছি আমাদের কাজের সুবিধার জন্য। শুধু ভ্রমণকথার খুঁটিনাটি আলোচনাই  নয়, প্রতিটি ভ্রমণকথা থেকে নিজেদের সমাজের চিত্র কীভাবে কতোটা উঠে আসছে এবং তাতে কালানুক্রমিক ভাবে বাঙালি সমাজের কী কী বিবর্তন ধরা পড়ছে তার একটি সময়ানুসারী ভাষ্য গড়ে তোলা আমাদের ঈপ্সিত ছিল। তাই আমরা লেখাগুলিকে মূলত দুটি পর্বে ভাগ করেছি। প্রথমটি , 'ভারত ভ্রমণ' এবং দ্বিতীয়টি 'ভারতবর্ষের বাইরে ভ্রমণ' । যেহেতু কোনো ভ্রমণই একরকম নয়, তাই কাছাকাছি ভ্রমণগুলিকে নিয়ে এক একটি অধ্যায় নির্দিষ্ট হয়েছে। কোনো অধ্যায়ে একাধিক লেখা গৃহীত হয়েছে আবার কোনো অধ্যায়ে একটি লেখাই তার সমস্ত বিশেষত্ব উজাড় করে হাজির হয়েছে। ভারতভ্রমণের মধ্যে 'তীর্থভ্রমণ', 'শহুরে ভ্রমণ', 'মুসলিম মেয়ের ভ্রমণ', 'গ্রাম বাংলায় ভ্রমণ' , 'কবির সঙ্গে ভ্রমণ', 'জেল ভ্রমণ' এবং 'একাকী অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণ' এই সাত টি বিভাগ। ভারতবর্ষের বাইরে ভ্রমণে এসেছে, চারটি অধ্যায়ে 'বিলেত এবং ইয়ুরোপ', 'মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ', 'জাপান ভ্রমণ' এবং 'চীন ভ্রমণ'। সরলাদেবীর বার্মা ভ্রমণ কে উপসংহারে রাখা হয়েছে।

বহুকাল ধরে বাঙালি মেয়েরা ঘর আর ঘোমটা সামলেছে। প্রথমে বিদেশী, বিধর্মী ইসলামী শাসন আর সেই শাসনকালে ক্রমশ গড়ে ওঠা অনুদার  সমাজব্যবস্থা এবং স্মৃতিশাস্ত্রের প্রবল চাপে মেয়েরা ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিলেন একক সত্তা হিসেবে। পুরুষালি অত্যাচারকে স্বধর্ম মেনে চলা সমাজে ক্রমশ মেয়েরা প্রান্তবাসী হয়ে পড়ছিলেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান সমাজে মেয়েদের জন্য গাঢ় কালির নিকষ সংসার, কঠিনতম এবং ঘৃণাজনক সংসারের নিয়ম একের পর এক বরাদ্দ হয়েছিল। মেয়েরা শুধুই ভোগ্যপণ্য এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ; এই ভাবনাই ছিল সমাজের মূলস্রোতের ভাবনা। মেয়েদের জন্য কোনো পেশা তো নির্দিষ্ট ছিলই না, ছিল না কোনো সম্মান ও। সাধারণ সুখ-সুবিধার কথা তো বলাই বাহুল্য। ফলে পর্যটনের মতো খোলা মনের আনন্দে মেয়েদের ততোদিন পর্যন্ত স্থান হয়নি, যতোদিন পর্যন্ত মেয়েরা সেটা ছিনিয়ে না নিয়েছে। তীর্থভ্রমণের একটা চল চৈতন্য-পরবর্তী যুগে অবশ্যই গড়ে উঠছিল বিশেষত জাহ্নবা দেবীর প্রভাবে, কিন্তু সেই মেয়ের দল কিছু লিপিবদ্ধ করে যাওয়ার কথা ভাবেননি। তাছাড়া মেয়েদের গলা টিপে রেখেছিল সতীদাহ, বাল্যবিবাহের মতো কু আচারগুলি। এগুলি খুব বেশিদিনের কথা নয়। এই তো সেদিন ১৮২৯ এ রাজা রামমোহন রায় এবং লর্ড বেন্টিংকের সহায়তায় সতীদাহ রোধ আইন বলবৎ হল। তার প্রায় দুশতক পর দাঁড়িয়ে বলা যায় আইন করে কুপ্রথা কমানো গেলেও একেবারে নির্মূল করা অসম্ভব। কিন্তু মেয়েদের জীবনের এবং অস্তিত্বের জন্য একটা সুরক্ষাবলয় প্রয়োজন ছিল। সেইটি করে গেলেন রামমোহন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ রোধ করে, মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুলের পর স্কুল খুলে, বিধবাবিবাহ প্রচলন করে বিদ্যাসাগর এবং সম্প্রদায় সত্যিই চিরজীবী হয়ে রইলেন আমাদের কাছে। আর সেইজন্যই সারদাসুন্দরী স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের ইচ্ছেমতো ভ্রমণের সুযোগ পেলেন জীবনে। যদিও 'পরিবার-পরিজন' যথোচিত বাধা

প্রদানে কিছু কসুর করেনি, তবু সারদাসুন্দরীদের বেঁধে রাখা গেল না। তীর্থযাত্রা থেকে শুরু করে মেয়েরা মহাকাশ যাত্রায় পাড়ি জমালেন। পাশ্চাত্যের মেয়েরা কিন্তু দেশ পর্যটন শুরু করেছিলেন অনেক আগেই। আমরা ইংল্যান্ডের মার্জারি কেম্পের (১৩৭৩-১৪৩৮) কথা জানি, যিনি এক খৃষ্টীয় সাধিকা। তিনি তাঁর তীর্থভ্রমণের কথা লিখে গিয়েছেন। ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর এই হোলিল্যাণ্ড ভ্রমণ। ইয়ুরোপ , মধ্যপ্রাচ্য এবং আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন তিনি। তাঁকেও কম মূল্য দিতে হয়নি। জেলবন্দী ও থাকতে হয়েছে কিছুদিনের জন্য অন্যায় অপবাদে বিদ্ধ হয়ে। তবু মার্জারি ভ্রমণের পর ভ্রমণ করেছেন। তিনিও বই লিখেছেন, অবশ্য সেটিও ছিল অনুলিখন।[১] পাশ্চাত্যেও পিলগ্রিমেজ বা তীর্থভ্রমণ দিয়েই মেয়েদের যাত্রা শুরু।

The Virago Book of Women Travellers[২] -এ প্রচুর মেয়েদের কথা জানা যায় যাঁরা ভ্রমণ করেছেন ক্রমাগত । লেডি মারি মন্টাগু, মারি ওলস্টোনক্রাফট, ইজাবেলা এবেরার্ট, আমেলিয়া এডওয়ার্ডস, এলিজা ফার্নহ্যাম থেকে এলা মালার্ট, রোজ মেকলে, মারি ম্যাকার্থি, এমিলি হান বা আলেকজান্ডার ডেভিড নীল এমন বহু নারীর কথা ধরা আছে। এছাড়াও এলিজাবেথ জেন কোকার্ণ ( ১৮৬৪-১৯২২)- এর কথা জানা যায় যিনি পেশায় সাংবাদিক সমস্ত বিশ্ব ভ্রমণ করে ফেলেছিলেন মাত্র ৭২ দিনে ! নেলি ব্লাই ছদ্মনামেই তিনি আমাদের কাছে সমধিক পরিচিত। পাশ্চাত্যের মেয়েদের স্বাধীনতার সংজ্ঞা আমাদের দেশের থেকে একেবারেই আলাদা ছিল, ফলে তাঁদের ভ্রমণ ও খুব অল্প সময়েই অসামান্য বিস্তার লাভ করতে পেরেছে। কৃষ্ণভাবিনী দাস, অবলা বসু , দুর্গাবতী ঘোষ বা অমলা শঙ্করের লেখায় বার বার উল্লেখ করা হয় ইয়ুরোপ আমেরিকার প্রতিটি পরিবারের সমস্ত সদস্যদের ভ্রমণস্পৃহা বিষয়ে। সেই স্পৃহা এ যুগে আমাদের দেশের মেয়েদেরও স্পর্শ করেছে। এবার মূল অধ্যায়গুলিতে সেই শিকল ভাঙার শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে।

1. The Book of Margery Kempe, 1501. Wikipedia.
2. Mary Morris with Larry O' Connor (Edited by), The Virago Book of Women Travellers, 1993, Virago Press, London.

# ক. ভারতবর্ষ ভ্রমণ

## [ ১ ]

## তীর্থ ভ্রমণের সেকাল একাল

পূর্ণের পদপরশ পাওয়ার আশায় পুণ্য ভ্রমণ বাঙালি মেয়ে করে চলেছে যুগে যুগে। আজো তার শেষ হয়নি, শুধু ভাবে-রূপে বদলে গিয়েছে মানসতীর্থ। কখনো বিশ্বের বিখ্যাত লাইব্রেরিগুলি হয়ে উঠছে ভ্রামণিকের তীর্থক্ষেত্র তো কখনো দুর্লঙ্ঘ পর্বতমালা। সে কোনো ইষ্ট দেবতার টানে নয়, মনের তীব্র আকুলতার আহ্বানে। বা বলা যায় কালের ফেরে অনেক ক্ষেত্রে বদলে গিয়েছে ইষ্টদেবতার রূপ। কিন্তু তীর্থদর্শনের জন্যই যে তীর্থ গুলি মেয়েরা পরিক্রমণ করেছিলেন, বা আজো করে থাকেন সেগুলি নিয়ে আলোচনা শুরু করলেই দেখা যাবে একটা অদ্ভুত বিষয়! বাঙালি মেয়েদের অনেকেই প্রথম থেকেই বেশ স্যেকুলর। কোনো মোহাবরণ রেখে তাঁরা তীর্থে যাননি। যাওয়া আসার পথে চোখ খোলা রেখেছেন আর সেইমত বর্ণনা করেছেন! আবার অনেকেই ঈশ্বর চরণে শান্তি লাভের আশায় তীর্থ করেছেন, বিনা প্রশ্নে সকল আয়াস সহ্য করেছেন।

তীর্থযাত্রার বিবর্তন বোঝাবার জন্য আমরা মোট ছয় জন নারীর তীর্থভ্রমণলেখ বেছে নিয়েছি আমাদের বিশ্লেষণে।

প্রথমে বলা যাক, ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকায় ফাল্গুন ১২৭০ এ প্রকাশিত রমাসুন্দরী ঘোষ (১৮৪৯-১৯১৩) এর ‘‘কাশী-দর্শন’’। [১] তৎকালীন রীতি অনুসারে পদ্যে লেখা ভ্রমণ কাহিনী। এটি খুব সম্ভবত কোনো বাঙালিনীর লেখা প্রথম ভ্রমণকাব্য। লেখার নাম থেকেই গন্তব্য স্পষ্ট। কিন্তু বিশ্বনাথের গলির ফেলুদা-সুলভ সমস্ত আগাম নস্টালজিয়াকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে রমাসুন্দরী লিখলেন,

> পরেতে যখন গেনু গলীর ভিতর।/ দুর্গন্ধ আইল যবে নাসিকা ভিতর।।/ তখন হইল মম, যেরূপ অন্তর। / লিখিব কি তাহা ওহে করি সবিস্তার।।

এবং তারপর কাশী-বিশ্বনাথ দর্শন করে মোক্ষম উক্তি পর দিন যে সময়,

> দেখিতে দুর্গেশ। / যাইলাম মনে করি, আনন্দ অশেষ।। / যেমন দেখিব এবে, বারাণসী শিব। / যাহার কারণ মুক্তি, পায় যত জীব।। / দেখিনু পরেতে ওহে সেই বিশ্বেশ্বর। / মন্দিরের মধ্যে আছে কেবল প্রস্তর।।

এরপর মন্দির এবং দেবতার চমৎকারিত্ব বিষয়ে সন্দিহান লেখকের রসনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে ‘কাপট্য আচার’ বিষয়ে। এই লেখার সময়কাল ফাল্গুন, ১২৭০ অর্থাৎ ইংরেজি সাল ১৮৬৪। এই সময়ে এমন দৃঢ় নির্মোহ দৃষ্টি অবশ্যই বিবেচনার দাবী

রাখে! তবে তার পিছনে লেখকের বংশপরিচয় ও বিশিষ্টতার দাবী রাখে। রমাসুন্দরী বিখ্যাত ইয়ং বেঙ্গল সভ্য ডিরোজিওপন্থী শিবচন্দ্র দেবের কন্যা। শিবচন্দ্র দেব ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক। ফলে জন্মাবধি বাড়িতে তিনি এই নির্মোহ এবং বিশ্লেষক আবহাওয়াই দেখে এসেছেন, তাঁর মনের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবেই সেই পরিবেশে-সঞ্জাত মূল্যবোধই গড়ে উঠেছিল। ফলে তাঁর লেখা এই ভ্রমণকথা তীর্থভ্রমণকথা সংরূপের এক উল্লেখযোগ্য দলিল।

এবার ঠিক সাত বছর পর লিখছেন শ্রী লক্ষ্মীমণি দেবী (বসু) (জন্ম-মৃত্যু জানা যায়না)। যথারীতি ছন্দে লেখা ভ্রমণকথা।

প্রকাশ পাচ্ছে ১২৭৭ এর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (ইং ১৮৭১) বামাবোধিনী পত্রিকায় 'বামাগণের রচনা' অংশে।[২] 'বিদেশ ভ্রমণ' নামক কবিতায় ব্রাহ্ম লক্ষ্মীমণিও পয়ারছন্দে গাঁথছেন পথের দৃশ্য, আসা যাওয়ার আনন্দ, দ্রষ্টব্যের বর্ণনা। কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন হয়ে দেশে ফেরা। এবং কাশী প্রসঙ্গে সেই অমোঘ অপছন্দ,

কাশীর ভিতরে দেখি গলি অতিশয়। /শঙ্খ ঘন্টা বাজিতেছে যত দেবালয়।। / পচাগন্ধে বমি ওঠে নাহি থাকে নাড়ি। / ঘেঁষাঘেঁষি কত শত পাষাণের বাড়ী।।

এরপর এলাহাবাদে কুম্ভ মেলায় মহা অপছন্দের মস্তক মুণ্ডনের কথা আসে। তারপর আগ্রা দেখে খুব খুশি লক্ষ্মীমণি যথারীতি বৃন্দাবন গিয়েই স্থানমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেও ব্রজবাসীকে নির্দয় এবং অর্থলোভী বলেছেন,

মহা বনবাসী ধরে টানাটানি করে। /অর্থ নাহি পেলে তারা জোরে গিয়া ধরে।। / এমন তীর্থেতে বল শ্রদ্ধা কার হয়?!

সঠিক প্রশ্ন। এরপর কানপুর এটোয়া টুন্ডলা হয়ে ঘরে ফেরা। মাঝে গয়াক্ষেত্রে গিয়েও বিরাগে মন পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে নানান অপছন্দের কারণে। লিখছেন,

পরিশেষে সঙ্গী সবে গয়া তীর্থে যায়।/ পিন্ড দিবে মনে করে গদাধর পায়।।/সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম তুষ্ট নহে মন।/ ... দিবানিশি ভাবিতেছি সত্য সনাতন।/ আশীর্ব্বাদ করো পাই সেই নিরঞ্জন।।/ এ কথা শুনিয়া সবে কাণে দিল হাত। / বলে তুমি হও গিয়া ত্বরায় নিপাত।।

বোঝা যায় তার্কিক একটি মন নিয়ে তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। তাই বিন্দুমাত্র অসন্তোষ ও সহ্য করতে পারেননি। তবে তীর্থপর্যটন শেষে এইবার উপস্থাপিত হল সাংঘাতিক সামাজিক চিত্র।

দেশে দেখি প্রতিবাদী প্রতিবাসীগণ।/ চুল আছে মাথে বলে কথা নাহি কন।।

এই সামাজিক বর্জন চিত্র (সোশ্যাল বয়কট) খুব সুখকর নয়। এবং অবস্থা ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছিল তা আমরা বুঝতে পারব ক্রমশ সৌদামিনী দেবীর লেখায়।

তবে আগে সারদাসুন্দরী দেবীর কথা। সারদাসুন্দরী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)। সারদাসুন্দরীর জীবনকাল ১৮১৯-১৯০৭। তিনি তাঁর জীবন কথা বলে গিয়েছিলেন মুখে মুখে ১৮৯২তে যোগেন্দ্রলাল খাস্তগিরকে। সেই লিপিবদ্ধ কাহিনী [৩] প্রকাশ পায় সারদাসুন্দরীর ইচ্ছানুসারে তাঁর মৃত্যুর কিছু বছর পর ১৯১৩ তে। এই কাহিনীতে একটা বড় স্থান পেয়েছে ভ্রমণের ঈপ্সা এবং ভ্রমণ। পারিবারিক বিভিন্ন বিরুদ্ধাচরণের পাশাপাশি উঠে এসেছে ধর্মীয় আন্দোলনের সামান্য ছবি এবং পরিবারে তার প্রভাবের চিত্রও। দেওয়ান রামকমল সেনের পুত্র প্যারীমোহন সেনের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল সারদাসুন্দরীর। প্যারীমোহন পরলোক গমন করেন সারদাসুন্দরীর ২৫ বছর বয়সে। ১৮৪৪ সাল। তার ঠিক দেড় বছর পর থেকে সারদাসুন্দরীর তীর্থ ভ্রমণের সূচনা। অর্থাৎ ১৮৪৫-১৮৪৬ নাগাত। তিনি ভ্রমণকথা না লিখলেও সর্বপ্রথম যে তীর্থভ্রমণের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে তা সারদাসুন্দরী দেবীরই। কেননা তার আগে ১৮২৯ পর্যন্ত মেয়েরা ভাবত জ্বলন্ত স্বামীর চিতায় প্রবেশের কথা কিম্বা বিধবার অশেষ দুর্গতির কথা কিম্বা বহুবিবাহিত কুলীনের অবহেলার স্ত্রী হয়ে অন্যের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে চলা প্রায় বিকৃত, নিপীড়িত জীবনের বিড়ম্বনার কথা। খুব বেশি তীর্থভ্রমণ বা বাড়ির বাইরে পা রাখার কথা তাঁদের পক্ষে স্বপ্নেও ভাবা সম্ভব ছিল না। তবু অবস্থা বৈগুণ্যে আর পরিবার ভেদে কিছু কিছু নারীরা তীর্থে যেতে পারতেন বৈকি। সারদাসুন্দরী এ বিষয়ে জোর করে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর এই ভ্রমণের লাইনে লাইনে পরিবারের ছবি উঠে এসেছে; যে পরিবার ধনে, মানে, শিক্ষায় তৎকালীন অগ্রগণ্য বাঙালি পরিবারগুলির অন্যতম।

সারদাসুন্দরী প্রথম গিয়েছিলেন গঙ্গাসাগর তাঁর মায়ের সঙ্গে, পারিবারিক ব্যবস্থায় একজন দারয়ান এবং খানসামার ভরসায় কোলের সন্তান তিন বছুরে কৃষ্ণবিহারীকে কোলে নিয়েই। এই যাত্রার জন্য যদি ভাশুরের অনুমতি না পান তাই রাহাখরচের জন্য লুকিয়ে দাস-দাসীদের নিয়ে নিজের পায়ের মল বিক্রী করেছিলেন। কারণ তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর চতুর্থ দিন থেকেই তাঁর উপর পারিবারিক ভাবে মানসিক অত্যাচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। পথের টান তাঁকে টেনেছিল বারবার। সাত দিন ভ্রমণের পর ফিরে এসেছিলেন, পথে ছোট্ট শিশু কৃষ্ণবিহারীর প্রাণসংশয় হয়েছিল কিন্তু তাই বলে আবার ঠিক ছয় মাস পর শ্রীক্ষেত্রে যাওয়া বন্ধ করেননি। এবং এবার আরো তীব্র তাঁর টান। তিনি কৃষ্ণবিহারীকে বাড়িতে অন্যান্য সদস্যদের কাছে রেখে পরিবারেরই অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে যাবেন তা স্থিরনিশ্চিত। স্বামীর এবং বড়মেয়ে ব্রজেশ্বরীর মৃত্যুর পর,

> শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করলাম। পাগলের মতো হইয়া বাহির হইলাম। ... আমার কৃষ্ণবিহারী তখন তিন বৎসরের। আমি একখানি কাপড় হাতে করিয়া বলিলাম, "চল্লাম, আর তোরা যদি আমাকে যাইতে না দিস্, আমি কিছু চাইনে, এই কাপড় হাতে করে হেঁটেই চলিয়া যাইব!" ... আমি নিতান্ত যখন যাইতে চাইলাম তখন তাঁহারা সব ঠিক করিয়া দিলেন, সঙ্গে লোকজন দিলেন এবং পাল্কীর ডাক বসিল। আমার ভাশুর বাপের বাড়ী থেকে আমার ভাজকে কৃষ্ণবিহারীর জন্য আনাইয়া লইলেন।। [পৃ.১৩, 'ফিরে দেখা' সিরিজ]

অথচ সারদাসুন্দরীর লেখা থেকে জানা যায় পথে সকলের জন্য খোঁজ নিয়ে চিঠিপত্র এলেও, সারদাসুন্দরীর খোঁজ নিয়ে কেউ কোনো চিঠি পাঠাননি। আমরা মনে করতে পারি এখানেই লুকিয়ে আছে ভাবীকালের উজ্জ্বলতমা বিদ্রোহিনী

কৃষ্ণভাবিনী দাসের প্রতি তাঁর শ্বশুর এবং শ্বশুরপক্ষীয়দের গর্হিত আচরণের বীজ। নারীকে নানাভাবে মনোকষ্ট দিয়ে ভঙ্গুর করে টুকরো টুকরো করে ফেলার নিদান বাঙালি সমাজের হাতের মুঠোয়। সারদাসুন্দরী নিদারুণ মনোকষ্টে এবং শারীরিক অসুস্থতায় কোনোক্রমে ডাকাতের ভয়ে প্রাণ হাতে করে পুরী পৌঁছলেন। এবং সংকল্প করলেন রথযাত্রা পর্যন্ত থাকার দেবসেবা করার। আর সেইদিনই চিঠি এল বাড়ি থেকে। এই ঘটনা থেকেই তাঁর মনে এই ভাবনার সূত্রপাত হয়, “মানুষ যে সাকার উপাসনার দ্বারা মুক্তি পায় না, এই কথা আমি বলিতে পারি না। ” [পৃ. ১৭, তদেব] এই ভাবনা পরে পরিণত হয়েছিল আমরা দেখতে পাব।

কুড়ি দিন শ্রীক্ষত্রে কাটিয়ে সম্পূর্ণ হিন্দুমতে ধর্মীয় অনুশাসন গুলি পালন করে বাড়ি ফেরার পথে ছেলেদের ডাকিয়ে আনিয়েছেন কালীঘাটে। সব সন্তানের সঙ্গে মিলন হচ্ছে বিশেষত কৃষ্ণবিহারীর সঙ্গে। এবং দাপটের সঙ্গে বাড়িতে জানিয়েছিলেন চিঠি লিখে সন্তানদের কালীঘাটে না পাঠালে সারদাসুন্দরী আর বাড়ি ফিরবেন না। ধর্মকর্ম এবং তীর্থদর্শন করতে করতে তাঁর এই যে শ্বশুরঘরের ভীত বধূ থেকে একজন একক স্বাধীন দৃঢ়চেতা মানুষে এই উত্তরণ মুগ্ধ এবং শিক্ষিত হওয়ার মতোই। এরপরেও সারদাসুন্দরী আরো বিভিন্ন তীর্থে গিয়েছেন। কাশী-প্রয়াগ-বিন্ধ্যাচল-মথুরা-বৃন্দাবন। এইসময় সমস্ত পথ রেলগাড়িতে যাওয়া যেত না। রাণীগঞ্জ থেকে ডাকগাড়িতে কাশী গিয়েছিলেন। কাসী থেকে আগ্রা হয়ে মথুরা বৃন্দাবন। কিন্তু এই বৃন্দাবন ভ্রমণ নিয়ে আবারো পারিবারিক ঝড় ঘনীভূত হয়েছে তার ইঙ্গিত মেলে,

> “কয়েক বৎসর পর আমার বড় জা বৃন্দাবন যাইবেন, ঠিক করিলেন। আমারো সেই সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা হইল, আমার ভাশুরও মত দিলেন। কিন্তু আমার জা’র মত হইল না, সেই সঙ্গে আমার যাওয়া হইল না।” [পৃ. ২৪ ]

এর পরের বছর আবার পেশ হল বৃন্দাবন যাওয়ার আর্জি ভাশুরের দরবারে, কিন্তু যৎসামান্য পথখরচ ছাড়া আর কিছু মেলেনি। তখন পুত্র নবীন চন্দ্র মাকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে যান এবং এই সময় লিখছেন আগ্রা পর্যন্ত রেলগাড়ি চলছে, তাই রেলেই ভ্রমণ করা গেল। পথে আগ্রা থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য উটের গাড়িতে চড়ছেন , সে এক আশ্চর্য বর্ণনা! তিনতলা গাড়ি এবং ভয়ানক দোলে। গড়োয়ান যাত্রীদের দেখতে পায়না আর মোটে একদিন চলার পরেই গাড়ি উলটে পপাত ধরণীতলে! মজা এবং সাজা দুইই অনুভব করেছেন সারদাসুন্দরী।

সারদাসুন্দরী নিজে বলেছেন স্বামী প্যারীমোহনের মৃত্যুর (১৮৪৪) বছর দেড়েক পর থেকে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান কৃষ্ণবিহারীর মৃত্যুর পর (১৮৯৫) পর্যন্ত বিভিন্ন তীর্থে একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন। তীর্থভ্রমণ এবং তার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর মতামত বেশ যুক্তিপূর্ণ। সে বিষয়ে কথা বলার আগে আরো একটা প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনা করতে হবে, তা হল হিন্দু ধর্ম থেকে ব্রাহ্ম ধর্মের আন্দোলনের প্রভাব এবং ফলশ্রুতি সারদাসুন্দরীকে ব্যক্তিগত ভাবনায় কীভাবে চালিত করেছিল। সারদাসুন্দরীর বয়ানে পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানতে পারা যাচ্ছে কেশব চন্দ্র সেন বাহ্ম ধর্ম গ্রহণ কালে (১৮৫৮) মাকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর পাশে থাকতে এবং সারদাসুন্দরীও তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। কেশব চন্দ্রের ব্রাহ্ম হওয়া নিয়ে তাঁর পারিবারিক বিরুদ্ধতা বাঙালির রিফর্মেশন ইতিহাসের একটি সামাজিক অধ্যায় সংযোজন করেছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহায়তায়। যদিও তা অন্য প্রসঙ্গ। শুধু এই টানাপোড়েনের স্থায়ী ছাপ পড়েছিল সারদাসুন্দরীর ভ্রমণ-ভাবনাতেও সেটা আমরা দেখব। ব্রাহ্ম হওয়ার পর কেশব সেনের সহকারী অনুগামী নববিধান প্রচারক প্যারীমোহন চৌধুরীর সঙ্গে হরিদ্বার এবং

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্য, অমৃত, মহেন্দ্র এবং হরনাথ বোসের সঙ্গে দেরাদুনের নালাপানি, গুহ্যপানি এবং মুসুরী পাহাড় ভ্রমণ করেন। কেশব সেন স্বয়ং এখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কেশব সেন চেয়েছিলেন নিরাকারের সাধনায় মাকেও মগ্ন করতে এবং কিছুটা সফল হয়েছিলেন। কিন্তু সারদাসুন্দরী শেষ পর্যন্ত পারিবারিক এবং সম্পত্তিগত বিবাদের ফলে ভীত হয়ে কেশব চন্দ্রকে ত্যাগ করেন, ক্রমে কেশব চন্দ্রকে আলাদা হয়ে যেতে হয় এবং তাঁর বাড়িতে জলপান বা খাদ্যগ্রহণ করবেন না এই মতে উপনীত হতে বাধ্য হন সারদাসুন্দরী। এবং মনে মনে নিজেকে দোষারোপ করতে থাকেন, এমনকি বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমার সময়েও নিজের এই কাজকে তিনি ভুল বলেই চিহ্নিত করেছিলেন। জয়পুরে গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতি দর্শনের সময় যেন গোবিন্দজীকেই সাক্ষাৎ করেন সিঁড়ির উপরে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ানো। কিন্তু সারদাসুন্দরী জোর করে তাকে সরিয়ে ঢুকে পড়েন মন্দিরে। পরে স্মৃতিকথা বলার সময়ে বলছেন,

> এখন হইলে আমি ওইরকম করিতাম না। এখন আমি বুঝিতেছি যে গোবিন্দজীর ইচ্ছা ছিল না আমি সাকার ভাবে তাঁহাকে দেখি। কেন যে আমি কেশবকে ছাড়িলাম? তাই এত কষ্ট হইতেছে। তিনি (কেশব) আমায় নৈনিতালে তাঁহার সিদ্ধিস্থানে হিমালয়ে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমার যাওয়া হইল না। [পৃ.৩০]

এছাড়াও তীর্থদর্শন কেন করেন এই ভাবনা থেকে বলেছেন,

> আমি ভালোবাসার উপর তীর্থদর্শন করি। যেমন ছেলেপুলে এবং আপনার লোকেদের ভালোবাসি, সেইরূপ তীর্থ ব্রত ইত্যাদি বাহিরের কর্ম্ম হইলেও আমি ভালোবাসি। কিন্তু এইসব করিলেই যে আমার পরিত্রাণ হইবে তাহা আমি বিশ্বাস করিনা। ... শুধু তাঁর পাদপদ্মে থাকিব এইমাত্র ইচ্ছা। [পৃ.১৭]

সারদাসুন্দরী বার বার বলেছেন সাকার নিরাকার একই তবু মৃত পুত্রকে দেওয়া কথা অনুসারে তিনি বিশ্বাস করেন তাঁর যদি মুক্তি হওয়ার থাকে তা নিরাকারেই সম্ভব। যে মতেই হোক না কেন ঈশ্বর একই। তাই ব্রাহ্ম সমাজে তাঁকে ১৮৯৬ এর পরেও শুনতে হয়েছে, "তিনি এইরূপ সুন্দর প্রার্থনা করেন আবার একদিকে এইসব করেন কেন?" [পৃ.১৭ ]

অথবা যেখানেই গিয়েছেন কাশী বা মথুরায় বাঙালিরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি কেশব সেনের মা আপনি কেন হিন্দু তীর্থ করেন?! [পৃ. ২৯ ]

এইরকম মনোভাব আরো দৃঢ়ভাবে দেখতে পাই প্রায় সমসাময়িক সৌদামিনী দেবীর লেখায়।[৪]

সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা। 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২১ সনের আষাঢ় এবং ফাল্গুনে তাঁর দুটি ছোট্ট ভ্রমণকথা প্রকাশিত হয়। সে দুটি যথাক্রমে, 'ভিজিগাপত্তম' এবং 'তীর্থ দর্শন' ।

ভিজিগাপত্তম বা ভাইজাগে গিয়ে পাহাড় আর সমুদ্রের অনন্ত মেলবন্ধন ছাড়াও সৌদামিনী দেবী লিখেছেন বিশেষ করে 'হিন্দু তীর্থ' দর্শনের কথা। একটি চার্চ এবং মসজিদের কথাও আছে, কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে অন্য কোনো ধর্মের অভিজ্ঞান সম্বোধন-স্থলে লাগিয়ে দেওয়া হয়নি। মধুপুর হয়ে মথুরাতে তীর্থদর্শনের সময়ও 'হিন্দু তীর্থ' শব্দবন্ধ উল্লেখ করেছেন বারবার। যদিও মথুরায় হিন্দু ইতিহাস এবং তীর্থই সমস্ত, এবং হিন্দু ধর্মের প্রভাবই দেশে প্রবল এমন কথা লিখছেন, কিন্তু

বিশেষ করে সাকার আর নিরাকার বিষয়ে তাঁর মত প্রকাশ পেয়েছে ‘ভিজিগাপত্তম’ এ। মসজিদে গিয়ে পীরের আস্তানা দেখে লিখছেন,

> রেলিং ঘেরা তিন চার হাত স্থান ধূপধূনা ও ফুলগন্ধে ভরপুর। বলা বাহুল্য এখানে কোনো মূর্ত্তি নেই। মুসলমানগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই শূন্য মন্দিরে এসে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে। জানিনা, একজন হিন্দুর মনে এই দৃশ্যে কী ভাবের উদয় হয়—আমার মন ত এই দৃশ্যে সেই একোমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের প্রতি ভক্তির ভাবে ভরে উঠেছিল। ... ভগবান সকলের মধ্যেই বিরাজমান্, গঠিত মূর্তিতে যে ভক্তির উচ্ছ্বাস তাহা কেবল আশৈশব –শিক্ষা সংস্কার মাত্র। [পৃ. ৪৬, পিতৃস্মৃতি ও অন্যান্য রচনা]

আর দেবদেবীর কাছে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বাতি মানতের রীতি দেখে সৌদামিনীর মনে পড়েছে করালবদনা দেবী কালীমূর্তির সামনে রক্তলহর বইয়ে দেওয়া হিন্দুদের বলি প্রথা। মনে রাখতে হবে ততদিনে ‘বিসর্জন’( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ১৮৯০)[৫] রচনা হয়ে গিয়েছে। ফলে এই ভয়ঙ্কর রীতি নিয়ে অসন্তোষ থাকা অসম্ভব নয়। তাছাড়া হিন্দুদের থেকে ব্রাহ্মরা বেশ দূরত্ব রাখতেন (এমনকি মানসিক ভাবেও) তাও এই লেখায় বেশ প্রকাশিত।

আরো একজন ব্রাহ্মিকা রাজলক্ষ্মী দেব্যার (জন্ম ১২৭৪/ ১৮৬৭ মৃত্যু ১৩৫৭/১৯৫০) সত্তর বছর বয়সে কেদার বদ্রী ভ্রমণকাহিনীতে[৬] সমাজ চিত্র সেভাবে কিছু পাওয়া যায় না। তবে ১৯৩৭ সাল নাগাদ তিনি যে পরিচিত জনেদের সঙ্গে বৃদ্ধ বয়সে একাকিনী তীর্থ করতে গিয়েছিলেন (কেদার বদ্রী ভ্রমণ, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৪২) এটি খুবই আনন্দের বিষয়। তিনি নিজে ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু সারদাসুন্দরীর মতো পারিবারিক বা সামাজিক বাধার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়নি। অর্থাৎ আশা করা যায় এই সময় থেকে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে মানসিকতার সম্পূর্ণ বদল না হলেও ‘আলো ক্রমে আসিতেছে।’

এই গেল তীর্থদর্শনের সেকালের কথা। এবার আসব একালের কথায়। একাল বলতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরবর্তী তীর্থযাত্রার কথা বলা হয়েছে।

একালের মধ্যে দুটি বিষয়ের এবং জায়গায় খুব চমৎকার ভ্রমণকাহিনীর পরম্পরা পাওয়া যায়। একটি কুম্ভস্নানের। যথাক্রমে হরিদ্বার এবং প্রয়াগে। আর আরেকটি আগের কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মথুরা বৃন্দাবন। শেষটি কেদারবদ্রী দর্শন। এখানে আমরা আলোচনার জন্য শ্রী রানী চন্দের ‘পূর্ণকুম্ভ’ (১৯৫২) এবং ‘হিমাদ্রী’ (১৯৫৬) আর নবনীতা দেবসেন এর ‘করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে’ (১৯৭৮) এবং ‘হে পূর্ণ তব চরণের কাছে’(১৯৮৩) এই চারটি কালানুক্রমিক ভ্রমণকাহিনী বেছে নিয়েছি।

প্রথমেই বলতে চাইব স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের দেশজ চরিত্র, শিক্ষার হার, জনস্বাস্থ্য, মেয়েদের শিক্ষা এবং কর্মের হার , আর্থ-সামাজিক অবস্থান সমস্ত কিছু বদলে গিয়েছিল আগের আমলের তুলনায়। মেয়েরা ঘর থেকে বাইরে কাজের জন্য দলে দলে বেরিয়ে পড়েছেন। নানা পদে নানা কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। রানী কোনো বাঁধা কাজ করেননি কিন্তু নবনীতা করেছেন। এই দুই নারীই উত্তরকালের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার্হ এবং দুজনেই অমিতরত্নপ্রসবিনী বাংলা সাহিত্য জগতে। দুই দিকপাল। আর দুজনেরই লেখায় অন্তর্জগত উন্মোচিত হয় স্বপ্নসম্ভব ভঙ্গীতে। বাঙালি সমাজের বাংলার মেয়েদের আঁতের

কথা তুলে আনেন এই দুই অসমবয়সিনী, মালা গাঁথেন হাসি-কান্নার দোলায়। শান্ত শীতলপাটির পাড়ে পাড়ে আঁকা অভিজ্ঞতা-জারিত সমাজ নকশায় ডুব দেয় পাঠক অনিবার অমোঘ। এই দুজনেরই লেখায় সময়ের চলাচল ভারি অদ্ভুত। বর্তমান সময়ের জঠর থেকে বেরিয়ে আসে অতীতের সঞ্চিত জীবনবেদ। বারে বারে সময় মুখ ফেরায় পশ্চাদবর্তী আবর্তনে। আবার যেন জাম্পকাট দিয়ে ফিরে আসে স্বস্থানে। পরম রমণীয় সে ভ্রমণ-সময় ।

রানীর 'পূর্ণকুম্ভ' ৭ বইয়ে শুধু হরিদ্বারই নয় ঢুকে রয়েছে মথুরা বৃন্দাবনের কুম্ভচিত্রও। তার সঙ্গে ধরা পড়েছে বাঙালির আধ্যাত্মিক ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড চিত্র। যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্য থেকে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের তীর্থভ্রমণের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ বার বার উচ্চারিত হয়েছে। এসেছে শ্রী মা সারদা দেবী থেকে মা আনন্দময়ীর পরম্পরাক্রম। পূর্ণকুম্ভ শুরু হয়েছে প্রথমেই যাওয়ার পথের বাধাবিঘ্ন আশঙ্কার কথা দিয়ে। সন্তানের প্রবল শারীরিক বিপর্যয়ের অশনিসংকেতে। সে সমস্ত পেরিয়ে মন শক্ত করে কোনো মা যে বেরিয়ে পড়তে পেরেছেন পথের টানে তা নিতান্তই দূরকালের পাঠকের পাঠ-সৌভাগ্য। বাস্তবে প্রচুর মেয়েদের জীবনে এবং সাহিত্যে এমন উদাহরণ আছে যেখানে সন্তানের অসুস্থতাকে বাড়ির বাইরে বেরোনোর বিরোধিতা করার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হিশেবে প্রয়োগ করা হয়েছে পরিবার এবং সমাজের তরফ থেকে। এমনকি একালেও সে বাধার জুজু মাঝে মাঝে মুখ বাড়ায় বইকি! তাই রানীর বেরিয়ে পড়তে পারার ইচ্ছে এবং সাহসকে কুর্নিশ। নিজেই বলছেন বেরোতে পারার আগের কথা,

হঠাৎই চলে আসা আমার। কী করে যে ঘটে উঠল নিজেই অবাক মানি। সংসার থেকে নিজেকে আলগা করে তুলে নেওয়া --- বড়ো কঠিন। ... বড়দিদের সঙ্গ নেব, মনে মনে যখন ঠিক, বাধা দিল অভিজিত আমায়। কাঁপতে কাঁপতে বিছানা নিল একদিন। ... বাঁধা মোট ---মেঝে হতে সরিয়ে খাটের নীচে ঠেলে রাখলাম। একদিন, দুদিন, তিনদিন... জ্বরের তাপ বাড়তেই থাকে। এদিকে খবর আসে, 'টিকিট কেনা হয়ে গেছে, আর সময় নেই, চলে এসো কলকাতায়'... কথা বলিনা, সাড়া দিইনা, দাগে দাগে কাঁচের গ্লাসে ওষুধ ঢালি, আর ডাক্তার ও রোগীর মুখ নীরবে মিলিয়ে দেখি। শেষে, যাত্রার শেষ দিনের শেষ ট্রেন ছাড়বার ঠিক আগমুহূর্তে ছাড়া পেলাম । [পৃ. ১১, পূর্ণকুম্ভ]

এই টানাপোড়েন যুগন্ধর। কেউ পেরিয়ে যেতে পারেন, কেউ পারেননা। এ সময় রাণীর স্বামী অনিল চন্দ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ঘরের দায়িত্ব কিন্তু নারীটির জন্যই বরাদ্দ। তখনো মেয়েরা সেভাবে চাকরি শুরু করেনি দলে দলে। এই সময় রাণী বেরিয়ে পড়লেন। বড় ননদ নন্দাই এবং এক অচেনা বৈষ্ণব সঙ্গীর (নন্দাইয়ের পরিচিত) সঙ্গে। যাত্রা করলেন পূর্ণকুম্ভের উদ্দেশ্যে হরিদ্বার। সেখান থেকে গেলেন মথুরা বৃন্দাবন জয়পুর এবং আবার হরিদ্বার। কারণ প্রথম বারে এসেই আগেভাগে যে স্নানটি করেছিলেন তা ছিল শিবরাত্রির স্নান! নিজেরা সকলেই ভেবে নিয়েছিলেন কুম্ভ স্নান! উঠেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রমে। সেখানেই মহারাজদের থেকে জানা গেল এই সংবাদ। এদিকে হরিদ্বারে স্নান শেষে দেশভ্রমণের সুচী ট্রেনের টিকিট কেনা আত্মীয়বাড়ির ভ্রমণ তালিকা তৈরি! তাই আবারো আসতে হল হরিদ্বারে। সত্যিকার কুম্ভস্নানের জন্য। কিন্তু তার মধ্যেই কি সুন্দর ফুটে উঠল শ্রী শ্রী মা সারদার কথা, বাঙালি যাত্রিণীদের ছবি, বাঙালি বৈষ্ণবী আর ভৈরবীর লড়াই হর-কি-পৌড়ি ঘাটে। যেন নানা ভাবে নারীসমাজের মিছিল। এরপরেও মথুরা বৃন্দাবন যখন গিয়েছেন বারে বারে এসেছে নানা মেয়ের কথা। এমনকি চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্ম-আন্দোলনের নারীমুখ শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর কথাও। এসেছে মা আনন্দময়ীর কথা। এতো বাঙালির ভাবজীবনের বিশিষ্ট ইতিহাস। তারপর হরিদ্বারে ফিরে গিয়ে আবার বসুমতী মায়ের কথা। এভাবেই বাঙালির অন্তর্জীবনের ধর্মাচারণের পারম্পরিক সময়চক্র (ক্রোনোলজি) ধরা পড়েছে রাণীর লেখায়। দেবী থেকে

মানবী সকলেই তার অঙ্গ হয়ে উঠেছেন। যেমন জয়পুরের দেবী যশোরেশ্বরী। শ্যামল প্রান্তর নদী ঘেরা যশোর থেকে প্রতাপাদিত্যকে হারিয়ে যাঁকে মানসিংহ তুলে নিয়ে গিয়ে জয়পুরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন! দেবীও পুরুষকারের হাতের পুতুল, তবে মানবীদের কিছু বিশেষ ছবি ধরা পড়েছে রাণীর মেধাবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

প্রথমে আসি মা সারদার মৃন্ময়ী রূপের ছবি নিয়ে। কনখল হয়ে হরিদ্বারের সেবাশ্রমে থাকার সময় রাণীরা সংস্পর্শে আসেন রামময় মহারাজের। তিনি ছিলেন একেবারে ছোট্টটি সেসময় শ্রী মা সারদার কাছে তাঁর আসা। মায়ের মৃত্যু হয়েছে ১৯২০তে। তার আগে বিশেষত রামকৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর পর থেকে তিনি ক্রমশ বাঙালি ভক্তচরিত্রের কাছে আইকন হয়ে উঠেছিলেন। যা তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত পৃথিবীকেই ছেয়ে ফেলেছে তাঁর কাজ, জীবনদর্শন এবং তাঁর বাণীর মাধ্যমে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন খুবই আর্থিক এবং নানাবিধ সাংসারিক সমস্যার মধ্যে কেটেছিল। কিন্তু এই নারী কখনো তাঁর স্থৈর্য এবং শীল হারাননি। তাঁর স্নিগ্ধমধুর সম্ভাষণ দেশী বিদেশী সব ভক্ত-শিষ্যের কাছেই পরম আদৃত ছিল। মা ইংরেজি বা অন্যান্য বিদেশী ভাষা জানতেন না। অনেক সময় এই রামময় মহারাজই দোভাষীর ভূমিকা পালনের জন্য উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু জানিয়েছেন, অবাক হয়ে দেখতেন সমস্ত বিদেশী ভক্তদের সঙ্গে মা অবলীলায় বাংলায় কথা বলছেন, তাঁরা তাঁদের ভাষায় আলাপচারী করছেন কিন্তু কোথাও কোনো ফাঁক নেই! ভাবের বিচ্ছেদ নেই। সকলেই একবাক্যে জানান ‘‘আই আন্ডারস্টুড’’! বাঙালি মহিলাদের মধ্যে শুচিতা-অশুচিতার যে ভয়ানক ছুৎমার্গ তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে মা শিষ্যের এঁটো থালায় অবলীলাক্রমে খেয়ে উঠেছেন ছোট্ট ছেলে রামময় সেই থালায় খাবার বেড়েছিল বলে! এই অপূর্ব উদারতার ছবি রাণীর কলমে প্রাণ পেয়েছে। জ্ঞান মহারাজ জানান তাঁর সাংঘাতিক পীড়ার দিনে মা কেমন করে দিন রাত জেগে হাত বুলিয়ে ওষুধ খাইয়ে সেবা করেছেন নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা না ভেবে। সর্বাঙ্গে সংক্রামক ঘা যা অন্য মানুষ হাত দিতে ভয় করত মা নিজের হাতে রোজ পরিষ্কার করে তাতে প্রলেপ লাগাতেন মলমের। প্রতি গ্রাস ভাতের মধ্যে মাগুর মাছ লুকিয়ে খাইয়ে দিতেন এক্কেবারে মাছ পছন্দ না করা জ্ঞান মহারাজকে, রক্ত পরিষ্কার করার জন্য। এই পরম করুণাময়ী ধর্মগুরু সম্পর্কে রাণী তাই বলেন, শুনি আর ভাবি, মায়ের এই ‘রূপ’ ছিল বলেই তো তিনি মা। তাই তো তাঁর সন্তানরা আজও পাকা-চুলে-ভরা মাথা নিয়ে শিশুভাবে রূপান্তরিত হন মা’র কথা বলতে গিয়ে। এ জিনিস বোঝায় কে কাকে? [পৃ. ৪১-৪২, তদেব]

একইসঙ্গে ফুটে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সেবাব্রতের রূপ। হরিদ্বারে স্বামীজির ইচ্ছেয় প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রম, সাধু-সন্ন্যাসীর চিকিৎসার জন্য। সেখানে কাতারে কাতারে আসে ভিখারির দল, টাঙ্গাওয়ালা আরো কত পেশার মানুষ**।** এক সর্বভারতীয় বাঙালির মানস-সেবাক্ষেত্র বাস্তব হয়ে ওঠে জীবসেবায়, শিবসেবায়। তখনো বাঙালির গৌরবের দিন অস্তমিত নয়। এ তারই ছবি। এমনকি মহারাজদের স্মৃতিতে এসেছে মানুষ বিবেকানন্দের মজার ছবি। শরৎ মহারাজের মুখে শোনা। পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়েছেন স্বামীজি। খুব ইচ্ছে হচ্ছে বেগুনের ঝোল খাওয়ার। এদিকে একজন লোকের বেগুন খেতও আছে আর স্বামী অভেদানন্দজী এবং শরৎ মহারাজ একবার চেয়ে এসে জানিয়েছেন একটা বেগুন ও পাওয়া যাবে না! স্বামীজির কি হাসি। হাসতে হাসতে বললেন ‘তোরা আমার কেমন গুরুভাই রে যে আমার জন্য দুটি বেগুন চুরি করতে পারলিনে?’ তারপর অভেদানন্দজী আর শরৎ মহারাজ আবার সেই বেগুন খেতের বাড়ি গিয়ে একজন জুড়েছেন পরমার্থ

প্রসঙ্গ, আরেকজন পট পট বেগুন ছিঁড়ে খেত থেকে ভরে ফেলেন ঝুলিতে ! ফিরে এসে স্বামীজির কি অট্টহাসি আর ছেলেমানুষী আনন্দ !

ঘুরতে গিয়ে সদ্য স্বাধীনতা লাভ করা দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাংলার ছবি মনে আসে রাণীর। দুধ ঘি ছড়াছড়ি যায়, শিশুদের সুস্বাস্থ্য... দীর্ঘনিঃশ্বাসে সঙ্গে মনে পড়িয়ে দেয় বাংলাদেশের মারী-মন্বন্তরধ্বস্ত ছোট ছোট হাড় জিরজিরে শিশুদের কথা।

দক্ষঘাটের কাছে দেখা হয়ে যায় এক সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে। বাঙালিনী। আর খানিক পরেই এক বৈষ্ণবীর সঙ্গে। দুজনেরই পেশা ভিক্ষাবৃত্তি। শুধু তার মধ্যে মিশে গেছে সাধন-ভজনের অঙ্গরাগ। এঁদেরি লড়াই লেগে গেল একদিন তীক্ষ্ণ কুৎসিত লালসার ইন্ধনে। কার ভিক্ষা বেশি পাওয়া উচিত এই প্রশ্নে। দেখা গেল কুস্তিগীরের কেরামতি কেউই কম জানে না আর জিভের বিষ ও কম নয়। রাণী হাসেন মনে মনে । বাংলার সমাজ থেকে দূরে এসেও সামাজিক কোন্দল কেমন ভুলতে পারে না তিলক কাটা বৈষ্ণবী-ভৈরবীর দল।

এরপর চলে আসে স্নান পর্ব। তার আগেই এক ঘর সংসার ছেড়ে বিবাগী হয়ে পড়া এক বাঙালি মেয়ে রানীকে দেখে ধরেই নিয়েছে নব্য-সাধিকা, যারা নিয়মমাফিক সাধন ভজন করে না কিন্তু ডুবে আছে আধ্যাত্মিকতার অন্তরালে। রানীর কাঁধের ঝোলায় খাতা থাকে। যখন তখন স্কেচ করে নেন সাধুদের, পথের দৃশ্যের আরো কতকি মানুষের। পরে হিমাদ্রীদর্শনে

দেখবো এই খাতার মাহাত্ম্য কতখানি। স্নানপর্বে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নেন রানী। কুম্ভের অমৃতস্নান আগে ভাগে সেরে বড় আনন্দ। হিমশীতল গঙ্গাজলে স্নানের পর ঘাটে উঠে সেবাওয়ালির থেকে ধানের ছড়া তিলক নিতে নিতে মনে পড়ে যায় ছোটবেলার গঙ্গাস্নানের কথা। সে তাঁর শান্তিনিকেতন যাওয়ারও অনেক আগের কথা। দাদা মুকুল দে’র কাছে আসতেন যখন মা তখন অন্নপূর্ণা আর রানই দুই বোন আসতেন সাথে। গঙ্গাস্নানের পথ তখন খুলে গিয়েছে মেয়েদের জন্য। অবরোধ বিলীন হতে শুরু করেছে তার আরো তিন দশক আগে থেকেই। কলকাতার গঙ্গায় স্নান করে উঠলে কপালে মুখে লাগত তিলক মাটির পদছাপ। রানীর মনে পড়ে যায় সেই ছটফটে মেয়েবেলার কাহন।

সেবাশ্রমেই দেখা মেলে এক বুড়িমার সঙ্গে। একা এসেছেন মানভূম থেকে। কথায় কথায় জানা যায় একা একাই হেঁটে হেঁটে কেদার-বদ্রী ঘুরে এসেছেন।  না কোনো সঙ্গীসাথী, না পথের বিশ্রাম কিম্বা বিলাসিতার নমুনা। অত্যন্ত ভক্তিমতী, সরলা, লজ্জাশীলা বালবিধবা। পাঁচ কুড়ি দু টাকা নিয়ে এসেছেন। নিজের অভিজ্ঞতায় জানান, “হেঁটেই গেঁইছিলাম। কত আর টাকা লাগে? আমার তো পঁচিশটেও লাগেক নি। দুখানা কম্বল নিজেই বগলে চেপে উঠে গেলাম।” [পৃ.৮৭]

এমন কতশত তীর্থযাত্রিণী ভ্রমণকথা না লিখেই ঘুরে বেড়িয়েছেন বৃহত্তর বাংলায় বা সমস্ত দেশ থেকে তার খোঁজ ইতিহাস রাখেনা।  সেসময় তীর্থযাত্রা বিষয়ে সমাজের কঠোর শাসন মেনে টিকে যাওয়া বালবিধবার জন্য খুব কড়াকড়িও হয়তো আর ছিলনা। কারণ নতুন শতক নতুন শিক্ষার ধারা সঞ্চারিত করতে পেরেছিল, তা সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলিত। রানীর এই তীর্থপথচিত্র একেবারে প্রহমান বাঙালি সমাজের ইতিহাসকে তুলে আনে চোখের সামনে। বাঙালি নারীর সামাজিক ইতিহাসের হীরকচূর্ণ , সামগ্রিক বাঙালি সমাজের ঐতিহাসিক ছবি ধরা পড়ে চলচ্চিত্রের মতো।

স্নানশেষে এবার দেশ বেড়ানোর পালা। কিন্তু জ্ঞান মহারাজের কথায় জানা গেল এ স্নান শিবরাত্রির স্নান। কুম্ভযোগ তো লাগেইনি। অতএব 'নব্যসাধিকা'রা হেসে কুটিপাটি। এদিকে ট্রেনের টিকিট কাটা। তাই চড়ে বসলেন দিল্লী হয়ে মথুরা বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। আবারো ফিরে আসতে হবে হরিদ্বার। তার আগে যতটুকু তীর্থভ্রমণ হয়। মথুরায় প্রথমে পৌঁছলেও দেখা শুরু হল বৃন্দাবন থেকে। রানীর লেখায় বৃন্দাবনের এবং মথুরার যে দুরন্ত বিশিষ্ট ছবি এবং বাঙালি সংযোগের ইতিহাস ধরা পড়েছে তা অনবদ্য। যেন এক সোশ্যাল গ্রাফটিং এর ইতিবৃত্ত ধরে দেন তিনি পাঠকের সামনে। তাঁদের ইতিহাস ভাবনাকে উসকে দেন অনবরত। এমন লেখা একেবারেই অদ্বিতীয়। আগের কোনো যাত্রীণীর লেখাতেই এই বিষয় টি পাওয়া যায়নি।

মথুরা স্টেশনে নেমে টাঙ্গাওয়ালার ছেঁকে ধরা অত্যাচার সামলে যা প্রথম রাণীর চোখে পড়ে তা হল দলে দলে তড়বড়িয়ে চলা বাঙালি বৈষ্ণবীর মিছিল। হাতে জপের থলি। দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ভিড় উপচে পড়ে মথুরা বৃন্দাবনে। এখানেও সেবাশ্রমেই আশ্রয়। অবাক হয়ে দেখেন যমুনার চরে বসেছে কুম্ভের মেলা। চর জুড়ে নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীর থিকথিকে ভিড়। নাগা সাধুদের স্কেচ করেন এই বাঙালি তীর্থযাত্রিণী। সাধুরা মজা পান। বন্ধু হয়ে যান। অতি ভয়ানকেও ভয় না পাওয়ার কি অভূতপূর্ব সারস্বত সাধনা! কুম্ভে এসেছেন যমুনাতীরে, স্নান তো করতেই হবে! এইবারে একটা মজার বর্ণনা। পরে আবার শ্রেষ্ঠ মজার বর্ণনাটি পাবো নবনীতার লেখায়।

যমুনার জলে কাছিমের পাহাড়। তাদের এড়িয়ে কিভাবে সম্ভব স্নান করা? এদিকে জলে নেমে দাঁড়িয়ে থাকলেই নাকি কাছিম দেবে কামড়। তবে উপায়? রাণীর মনে পড়ে যায় শিলচরের অলখ নিরঞ্জন বাবার কথা। সর্বাঙ্গে ঘন্টা বাজিয়ে ভিক্ষেয় বেরুতেন। থামতেন না কোত্থাও। সেই মনে করে "দোহাই অলোক বাবা" বলতে বলতে হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে লেফট-রাইট করতে করতে এক হাত জলে কোনমতে একটা ডুব দিয়েই উঠে এলাম পাড়ে। আজ আর কারুর নামে ডুব দেওয়া নয়! মনেই এলো না তাদের কথা!

স্নান সেরে শ্রীরঙ্গনাথ জিউ মন্দির, মানসিংহের মন্দির (যে মন্দিরের আসল বিগ্রহ গোবিন্দজী আছেন জয়পুরে), গোমাটিলা দর্শন। এখানেই উঠে আসে রূপ-সনাতনের বৈষ্ণব জীবনের নানা গাথা নানা ছবি, বৈষ্ণবীয় বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু এতো বিনয়ীরাও কেউ কৃষ্ণের পাশে শ্রীরাধিকাকে পছন্দ করতে পারেননি। আরো অনেক পরে নিত্যানন্দ-ঘরণী জাহ্নবাদেবীই প্রথম সওয়াল করেন রাধামূর্তিকে কৃষ্ণমূর্তির পাশে স্থাপন করার জন্য। তারপর থেকে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহান্তরা একত্রে যুগলমূর্তির সাধনা করছেন। কিন্তু এ বড় সহজ পথ ছিল না! তুমুল আপত্তি উঠেছিল সব মহল থেকে। কিন্তু মাতা জাহ্নবার শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তির কাছে পরাভূত হতে হয় সকলকে। জাহ্নবাদেবী যেমন জ্ঞানী তেমনি বুদ্ধিশালিনী ছিলেন। তাঁর পুত্র বীরচন্দ্রকে কিভাবে তাঁর যোগৈশ্বর্যসম্পন্না রূপ দেখিয়েছিলেন সে বিষয়ক কিংবদন্তীর উল্লেখ বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। আমরা একালের মানুষ এটাই মনে করতে পারি এক নারীর প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, আবহমানে ধর্মান্দোলনের পথে। পরবর্তীতে মা সারদার বিষয়েও এমন লেখা পাওয়া যায় নানা বইপত্রে, যেখানে মা কে পূজা দিতে গিয়ে ভক্ত জগজ্জননীর পাদপদ্ম দেখে অভিভূত হয়েছেন। এই সূত্রেই উঠে আসে আনন্দময়ী মায়ের কথা। তাঁর সাধনপদ্ধতির কথা। হরিদ্বারে নব্যসাধিকা বলে সাব্যস্ত করেছিল যে মেয়েটি রানীদের তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় আবারো। সেই বাঙালিনীও ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আত্ম-

আবিষ্কারের নেশায়, আধ্যাত্মিকতায় ডুব দিয়ে। আনন্দময়ী মায়ের সাধন প্রণালী বলে সে ঘোর শাক্তমতের আরাধনা। সে সবার সয় না, সবাইকে সয় না। নির্মলাসুন্দরী দেবীর ১৯২২ সালে আনন্দময়ী মা রূপে আত্মপ্রকাশ। ১৯৫২ তে দেশজোড়া ভক্ত তাঁর। তাঁর মহিমায় অনেকেই উদ্বুদ্ধ। নারীশক্তির এই বিজয়রথ-এর প্রবাহ রাণীর লেখা জুড়ে।

পথ চলতে চলতে শোনেন বাঙালি তীর্থযাত্রিণীদের ঘরের বাধার গল্প। কান পেতে রাখেন রাণী। ছুঁয়ে ছেনে কথামালা গাঁথেন দেশজ প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে। আবার দেখা হয়ে যায় রাধাদাসীর সঙ্গে। নিত্যগোপাল মহন্তের সেবা করে এই বালবিধবা তরুণী। মুর্শিদাবাদের মেয়ে। তীর্থে এসে আর ঘরে ফিরে যায়নি। মনে পড়ে যায় প্রসন্নময়ী দেবীর 'আর্য্যাবর্ত্ত' রচনায় এমত বৈষ্ণবীয় পাপাচার সংক্রান্ত ঘৃণাজনক ভাবনা।[৮] রাণী কিন্তু পরম শান্ত উদারতায় গ্রহণ করেছেন পথের এই দেখা শোনা, বাঙালি মেয়েদের পরিযায়ী জীবনের বৃত্তান্ত। এও হয়তো তীর্থাচরণের বিবর্তন। এরপর মথুরা হয়ে জয়পুরের পথে। মাঝে দেখে নিয়েছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব এবং মা সারদার স্মৃতিবিজড়িত পদধূলি ধন্য স্থানগুলি। মথুরাতে দেখা পেয়েছেন বাংলা ভুলে যেতে বসা বাঙালি সাড়ে আট ভাই পাণ্ডার। এরা হলেন, 'কানে লাড়ু সাড়ে আট ভাই' - সদর্পে ঘোষিত "Ladoo in ear 8½ Brothers". তাছাড়া দেখেন বাঙালি ঘাট, বাঙালিদের নামে নামে চলার পথ, যমুনার ঘাট। তখনি সব অবাঙালি সংস্কৃতিতে ঢাকতে বসেছে। একই যন্ত্রণার ছাপ দেখা গিয়েছে দু'দশক আগের (১৯৩১) বার্মা ভ্রমণের সময় কলকাতা বিষয়ে সরলা দেবীর লেখায়, যা আমরা উপসংহারে দেখে নিতে পারবো। রানী জানান মারোয়াড়ী গুজরাতি শেঠের দেওয়া ভিক্ষার ভাগ পায়না ছেঁচড়ে চলা বাঙালি বৈষ্ণবী; ব্যথিত করে রাণীকে এই দৃশ্য। পথে দেখেন একদল বাঙালি তীর্থযাত্রিণীকে যেমন তেমন করে পথে নামিয়ে দিয়ে অবাঙালি পাণ্ডা তম্বি করছে। মনে পড়ে হরিদ্বারের অসহায়া দলছুট বৃদ্ধা বাঙালিনীর কথা, যার ভাষা বোঝে না গড়োয়ান আর না তিনি বোঝেন গড়োয়ানের ভাষা। রাণীর মনে হয়েছিল ধীরে ধীরে নিখিল ভারত তার সমগ্রতার বোধ হারাবে, ক্রমে হারাবে অস্তিত্ব| যখন এই থিসিস লেখা হচ্ছে এসময় রাণী চন্দের দূরদৃষ্টি স্বাভাবিক ভাবেই সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

ট্রেনে জয়পুরে আসেন। দেখেন গোবিন্দজীউ মন্দির, মানসিংহের মন্দির থেকে যাঁকে ঔরঙ্গজেবের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছিলেন জয়পুরের মহারাণা। দেখা হয় দেবী যশোরেশ্বরীর মন্দির এবং বংশানুক্রমে বসবাসকারী বাঙালি পুরোহিতদের সঙ্গে। তাদের বাঙালিত্ব লুপ্ত। ইতিহাসের এই সাংস্কৃতিক গ্রাফটিং বিস্মিত করে রাণীকে। কেমন করে সুদূর বাংলার দেবী রাজস্থানের গোলাপী শহরে রাজকীয় বেশে অধিষ্ঠিতা, অথচ মুখখানি তাঁর করুণ গ্রাম্যবধূর। যেন একাকী অসহায়া বিদেশী পরিবেশে পরিবার পরিজন হারিয়ে নিতান্তই কাতর। যেন পাথুরে দেবীর মুখমন্ডলে খোদিত রয়েছে রক্তমাংসের মানবীর যন্ত্রণার্ত রেখাগুলি। বঙ্গের একপশলা সুদূর শ্যামল ইতিহাস ছেয়ে ফেলে মনকে।

এরপর আবার হরিদ্বার। পথে আর কিছুই হয়নি, কেবল এক অতি সুসজ্জিতা বর্ষিয়সী স্থূলকায়া মহিলার ক্লেপ্টোম্যানিয়ার শিকার হয় রাণীর চশমা, কলম, রং তুলি ক্রেয়ঁর বাক্স, যাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা যায়নি।

এবং হরিদ্বার। কুম্ভস্নান। এবং বসুমতী মায়ের কথা। রাণীর লেখায় বর্ণীত নারীরা কোনো না কোনো ভাবে সর্বদাই বিশেষ। ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে জমাট বেঁধে থাকে বাংলার কথা, বাঙালির কথা। বাঙালি মেয়ের কথা, বাঙালি সমাজের কথা। ফেলে

আসা দিনের ছবি সম্বলিত স্মৃতিচারণ। কেমন করে বয়ে যাওয়া বর্তমান সময় ইতিহাস হয়ে ওঠে তার এক নিদর্শন বসুমতী মায়ের কথা রাণীর কলমে। বসুমতী পত্রিকার কর্ণধার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী বসুমতী মা। নাম তাঁর ভবতারিণী দেবী। স্বামী, সন্তান, নাতি সব খুইয়ে সেবাশ্রমে পড়ে আছেন হরিদ্বারে। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি আইনের হাতে চলে গেছে, আত্মীয়রা ভাগে পেয়েছে। রামকৃষ্ণমিশনের শিশুপালনীতে দিতে পেরেছিলেন মাত্র বারো লক্ষ টাকা! তাই নিয়ে কি আক্ষেপ মায়ের। স্বামীজি ছিলেন তাঁর আর তাঁর স্বামীর ছোটবেলার খেলার সাথী। আর নিজে ছিলেন মা সারদার গ্রামের মেয়ে। শ্রী রামকৃষ্ণদেব তাঁর নামকরণ করেছিলেন ভবতারিণী। আগে নাম ছিল 'হাবি'। মেয়েদের এই হাবিজাবি আন্নাকালী নাম রাখার রীতি আজও কি ঘুচেছে? যাহোক আসি বসুমতী মায়ের স্মৃতিতে। পরমহংস দেবের স্মৃতি। যখনো তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ দেব হয়ে ওঠেননি সেই সময় থেকে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গলার ক্যান্সারের স্মৃতি… বসুমতী মা কেবলি বলে বলে যান… কেমন করে মেতে উঠেছিল সমস্ত বঙ্গদেশ শুদ্ধাভক্তির আবেশে। সে ইতিহাস বাঙালির আধ্যাত্মিক প্রয়াসকে সাবালক করে দিয়ে গিয়েছে। আজ এত বছর পর এই বই অবলম্বন করে লিখতে গিয়ে সে কথাই আমাদের মনে হয়। অন্তত নিজের স্ত্রীকে পূজা করেছিলেন যে পুরুষ, তাঁকে এক অর্থে যুগপুরুষ তো বলাই উচিত। বোঝা সম্ভব হয় নারীজাতির প্রতি কি অসীম সম্মান তাঁর ছিল। ১৮৮৬ তে রামকৃষ্ণ দেব দেহত্যাগ করেন। ১৯৫০ এ এই ভ্রমণ এবং ১৯৫২ তে পূর্ণকুম্ভ প্রকাশিত হয়; আজ এই ২০২০তে সর্বরকম সম্মানহানির যুগে এটি বেশ শিক্ষণীয় বলেই মনে করি।

এবারে 'হিমাদ্রী'।[১] ১৯৫৬তে প্রকাশিত। যাত্রাকাল যদিও সেপ্টেম্বর ১৯৫১। বইয়ের শুরুতেই রাণী বলছেন। এই বইটির মূল দাঁড়া পুরাণকাহিনী আর চলার পথে দেখার চোখ। মনের মধ্যে ওঠা স্মৃতির কথা। যদিও তা মাত্র এক দুবারই এসেছে। এখানে বাঙালি মেয়ের ভ্রমণকথা লেখার এক অদ্ভুত ক্ষমতা; অদ্ভুত রূপ-রসের মুন্সিয়ানার ছবি। ধরা পড়েছে কেদার-বদ্রী যাত্রার পথে চটি থেকে চটিতে চলতে চলতে ক্লান্ত হওয়া মেয়ের আঁকার খাতায় কিভাবে ধরা দেন কেদারনাথ স্বয়ং। এটি বাঙালি মেয়ের তীর্থভ্রমণকথায় এক দুরন্ত ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যখন সদ্য-স্বাধীন ভারতে সর্বমান্য দেবতা কেদারনাথের মুকুটের মাপ এবং ডিজাইন তৈরি করেন বাঙালি শিল্পী শ্রী রাণী চন্দ! অসামান্য গৌরবের এই বিরল মুহূর্ত নিয়ে যদিও খুব চর্চা হতে দেখা যায়নি কখনো বিদগ্ধ সমাজে।

প্রথমে বলতে চাইব আমরা এই ভ্রমণকথার অনবদ্যতা এবং অদ্বিতীয়তার বিষয়টি। বড়ননদ, নন্দাই, বিধবা মেজ ননদ, ব্রজরমণ, হরিদ্বার মিশন থেকে পাওয়া বগলা দিদি আর নিরুর সঙ্গে যাত্রা করেন রানী কেদার বদ্রী। এর মধ্যে সকলে সত্য, শুধু নিরু এক খাপছাড়া উল্কার মতো আসলে রানীর মন থেকে বেরিয়ে আসা ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। নিরু কে রানীই বানিয়ে তুলেছেন, নিজের সঙ্গে ভেদ রেখেছেন, সমস্ত পথ হাত ধরাধরি করে চলেছেন, আবার পূজারীর বিশেষ অনুরোধে 'সরস্বতী মায়ি' রানী কেদারনাথের বন্ধ দরোজা মন্দিরের ভিতর থেকে দেবতার মাপজোক নিয়ে এসে বেরিয়ে মিলে গিয়েছেন নিরুর সঙ্গে একান্ত একাঙ্গে। এইরকম করে নিজেকে ভেঙে বহুস্তরীয় প্রতিমা নির্মাণ অন্য কোন বাঙালি মেয়ের ভ্রমণকথায় দেখা যায় না।

এখানে একটা অদ্ভুত ছবি ফুটে উঠেছে দুই বাঙালি মেয়ের একান্ত মেয়েলি দৃষ্টিকোণে। বগলা দিদি প্রচলিত শাস্ত্রমানা কিন্তু অন্তরের শিক্ষা এবং পালিশহীন চরিত্র। নিরু তথা রানী অত্যন্ত শিক্ষিত, সংযত, স্পিরিচুয়াল ভাবের শিল্পী মানুষ। এই দুই ধরণের নারীর যে ভাগ সমাজ করে থাকে, এখানে নিরুর প্রতি বগলা দিদির কোপণ আচরণে তা স্পষ্ট। তিনি নিরুর লাফিয়ে চলা, উচ্ছ্বসিত বলা, হা হা হাসি, দার্শনিক মনোবৃত্তি কিছুই ভালো চোখে দেখতে পারেননা। পারেননা পছন্দ করতে পথের মানুষের সঙ্গে নিরুর ভাব করে ফেলার আশ্চর্য ক্ষমতা। ঠিক যেন বাস্তব জীবনে দেখা দুই রূপ নারীর। একদল বাস্তবের সীমায় আটকে থেকে নিজের যন্ত্রণাভোগ শতগুণ বাড়িয়ে তোলে অন্যকে যন্ত্রণা দিয়ে, আরেকদল চিরসুন্দরের চির-আনন্দের পূজারী। পথের সমস্ত পাথর বাধা টপকে জীবনের অনন্ত আনন্দ সন্ধান করে যারা বাস্তবের সীমা ডিঙিয়ে। সেই কাত্যায়নী, মৈত্রেয়ীর যুগ থেকে এই দুই দলের আড়াআড়ি। আবার বড়দির মতো বেশ কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা সহজে ধারণ করেন এই বহুকৌণিকতা, নিজের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে অন্য মানুষের অন্যতর ভাবকে সম্মান করতে পারেন অবলীলায়। কি সহজে পাঠক শিখে নিতে পারে এই অনন্য গুণাবলী!

হিমাদ্রী বইটি ছেয়ে আছে অধ্যাত্ম-দর্শনে। মানবজীবন তার নানা রূপ, ঈশ্বরকে পাওয়ার আকুল প্রয়াস এবং জীবনের সার্থকতা বা ব্যর্থতার ইতিহাস কিভাবে মানুষকে আরো প্রণত করতে পারে তার পাঠ সমস্ত বই জুড়ে। অল্পে খুশি হতে পারা এক মস্ত গুণ , পথে পথে বাঙালি সাধুদের জীবন যাপনের অনাড়ম্বর আয়োজন দেখে তাইই যেন মনকে টানতে থাকে। আবার এই পথেই দেখা পাওয়া যায় কতরকম পাহাড়ি মানুষের, যার কেউ কলকাতায় কাজ করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও আগে-পরে, দেখেছেন ভেদাভেদহীন এক নরম পৃথিবী। সেই মানুষটি বুঝতে পারেননি স্বাধীনতা পাওয়ার আগে কলকাতায় হিন্দু মুসলিমের দাঙ্গা কেন হল, কীভাবে হল? প্রশ্ন করেন বাঙালি মায়িকে, কলকাতার মানুষ এ কোন পৃথিবীর রূপ দেখালো? কেউ বা আবার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা, বুকের ভিতর নেতাজীর দেবস্থান গড়ে চায়ের দোকান খুলেছেন বদ্রীনারায়ণের পথে। মুখে জাতীয় সঙ্গীত। আবার কোনো পাহাড়ি বা দুই বৌ আর শিশুকন্যা নিয়ে চলেছেন দর্শনে, বুকে আঁটা নেতাজীর ছবি। মুহূর্তে আপন হয়ে যান এঁরা।

আবার এঁদের বিপ্রতীপে ঘুরে বেড়ান দেশ-গাঁয়ের বাঙালি রাজাবাবুর দল। যাঁরা ডান্ডি ছাড়া চলেন না, বিপুল লোক লস্কর নিয়ে তীর্থ করেন, কেদারনাথকে সোনা রূপার আভূষণে মুড়ে দিতে চান এবং পুরোহিতদের মনোযোগ সর্বদাই দাবী করেন টাকার মহিমায়। এই যাত্রীদের তীর্থভ্রমণ কতখানি আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার জন্য আর কতখানি আত্মমদগর্বের জেল্লা বাড়াবার জন্য তা রানী স্থির করে উঠতে পারেননি। তবে শেষ পর্যন্ত রানীর একটি বক্তব্য আমাদের মনকে আবারো নীড়ে ফিরিয়ে আনে। ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মস্বাদ আস্বাদনের পর ফেরার পথে, যাত্রা শেষের সময় ভাবেন,

কী দরকার আর হরিদ্বারে বিশ্রাম নিয়ে? ...পরের দিন এক্সপ্রেসটা ধরে সোজা কলকাতায় না গিয়ে বর্ধমানে নেমে কিউল প্যাসেঞ্জারে উঠে শান্তিনিকেতন চলে যাই যদি, তবে ঠিক পুজোর আগেরদিন ষষ্ঠীর সন্ধেয় গিয়ে পৌঁছতে পারব অভিজিতের কাছে। এক, দুই, তিন, চার— খেয়াল হয়, হাতের আঙুলে দিন গুনতে লেগে গেছি। পিছন ফিরে দেখি, দু ফার্লং ও আসিনি, বদরীনাথের চূড়া ঐ দেখা যায় এখনো; এরই মধ্যে হিসাব শুরু হয়ে গেল? কী আশ্চর্য! হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এসেছিলাম এখানে? [পৃ. ১৯৬, হিমাদ্রী]

রানীর যাত্রার আরো দু'দশকের বেশি কেটে যাওয়ার পর লেখা ভ্রমণকথা আমাদের শেষ উপস্থাপন নবনীতা দেবসেন। প্রথমে শুরু করব 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে'।[১০]

বাঙালি মেয়েদের মধ্যে এই মাত্র কটা দিন আগেও বিরাজমানা লেজেন্ড নবনীতা দেবসেনের (১৯৩৮-২০১৯) প্রথম ভ্রমণটি আবার একাকী ভ্রমণের পর্যায়ভুক্তও করা যায়। অসমসাহসী তো বটেই এক অসীম উৎসাহীর কুম্ভস্নানের প্রবল ঈপ্সা! যার জন্য কলকাতা টু হায়দ্রাবাদ রাউণ্ড ওয়ে প্লেনের টিকিট বদলে হয়ে যায় কলকাতা টু হায়দ্রাবাদ এবং হায়দ্রাবাদ টু দিল্লী, দিল্লী থেকে কাশী এবং কাশী থেকে গাড়িতে অপরিচিত এক্স-মিলিটারি পিতা শার্দূল সিংহের পুত্রীরূপে এলাহাবাদ এর কুম্ভ-রজঃ প্রলিপ্ত মহান অনন্ত জনসমুদ্র। এই জনসমুদ্রে প্রবেশের আগের গৌরচন্দ্রিকাতেই তিনি তুলেছেন মোক্ষম প্রশ্ন! একা মেয়ে কেমন করে সেমিনারের উজান ঠেলে কুম্ভে ঘুরে এলো (মানুষ-জন, শুভাকাঙ্ক্ষীরা আশা করেন নাকাল হয়ে এল) এবং জিজ্ঞাসায় প্রশ্নে একটি দণ্ড তিষ্ঠোতে দেন না তাঁদের মনে রেখে এবং তাঁদেরি উদ্দেশে নবনীতা বলছেন,

> গেছি তো গেছি। বেশ করেছি। তোমাদের তাতে কি? পাপকার্যে নিরত তো হইনি। গেছি পুণ্যকর্মেই। ... কোথায় তীর্থ করে এলাম আমাকে যত্ন করে পা ধুইয়ে দেবার কথা, তা নয়, ফিরে অবধি আপাদমস্তক আড়ংধোলাই চলছে। ... হঠাৎ পুণ্য? না বলে কয়ে? এত বড়ো আস্পর্ধা। কই ছেলেদের বেলায় তো কেউ কিছু প্রশ্ন তোলে না? [পৃ. ২৭ করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে, 'নবনীতা']

এবং এখানেই ক্ষান্ত নন। মানুষের 'এক্সপেকটেড অ্যাকশন' এর সঙ্গে নবনীতার পুণ্যকর্মের আইডিয়াটির একেবারেই মিল নেই দেখে সজোরে ধাক্কা দেন সামাজিক খোলনলচে কে! সমসাময়িক সাহিত্যিক (পুরুষ) কে নির্দেশ করে প্রায় বিরাগের সঙ্গেই লেখেন,

> নীললোহিতবাবু যত্র-তত্র ঘুরে বেড়ান, তাঁকে কি বাড়ির বড়োরা কেউ কিছু বলে? শুধু আমার বেলাতেই--? নেহাত মেয়ে বলেই এত কথা? ......উইমেন্স লিব টিব অদ্যাপি দূর অস্ত! [পৃ. ২৭, তদেব]

লক্ষণীয় এখানে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন মুক্তকচ্ছ ধর্মভীরু ভারতীয় হিসেবে। হিন্দু ফিমেল তিনি কদাপি নন, হ্যাঁ জন্মাবার সময় অবশ্যই ছিলেন এবং মৃত্যুর পর হবেন আবার। বর্তমানে তিনি কেবল নিজেই নিজের। ক্রমশ দেখা যাবে এই ভাবনাটি কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে নবনীতাকে ক্রমশ স্পিরিচুয়াল করে তুলেছে, তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে 'হে পূর্ণ তব চরণের কাছে' তে। তবে এখন অথ কুম্ভ-কথা।

১৯৭৬-এর কুম্ভমেলায় অমৃতকুম্ভ যোগের মহাস্নান নাকি আবার ফিরে আসবে ১৪৪ বছর পর। এক অপরিচিত ভক্ত পাঠকের থেকে এই সংবাদ পেয়েই নবনীতার মন আনচান। আহা যদি যাওয়া যেত! ওইদিনই সেমিনারের জন্য যেতে হবে হায়দ্রাবাদ। তা খুকু (নবনীতার ডাক নাম) যাদবপুরের গোল সামলে, আধখানা পেপার টাইপ করে এবং আকি আধখানা হায়দ্রাবাদের গেস্টহাউসে করে ফেলবেন মনস্থ করে তিনটি সোয়েটার , একখানি শাল, দুরন্ত এক কাঞ্চিপূরম শাড়ি (বাক্সে আরো তিন-চারটি ছিল; হায়দ্রাবাদে নিজামী রাজ্যের স্টেটগেস্ট বলে কথা!) , জলের বোতল, সুটকেস, ব্রিফকেস এবং হাপানির ওষুধ সমেত চশমা এবং কাঁধে নবনীতার অননুকরণীয় ভাষায় ফুটানি কা থলে (ভ্যানিটি ব্যাগ) সামলাতে সামলাতে হায়দ্রাবাদ পৌঁছলেন রাতে। রাজকীয় খাতিরদারি এবং তারপর দুদিন সেমিনার। সে এক বিপুল সাফল্যের অধ্যায় বলাই বাহুল্য। এবং তারপরেই হায়দ্রাবাদের উচ্চতম এবং পদস্থতম রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের কাছে আবেদন রাখলেন

হায়দ্রাবাদ থেকে কলকাতার টিকিট হায়দ্রাবাদ থেকে বানারস বা হায়দ্রাবাদ থেকে দিল্লীর করে দেওয়া হোক। কিন্তু , কথাটার সেই একই প্রতিক্রিয়া! প্রগ্রেসিভ বাঙালি আর ট্রাডিশনাল দক্ষিণ ভারতীয় সবারই চোখ কপালে! আগামীকাল কুম্ভস্নান আর নবনীতা আজ যাবেন একা একা? একি সম্ভব? অথচ সেই অসাধ্যই সাধিত হল নবনীতার ঐকান্তিক ইচ্ছে এবং চেষ্টা জোরে। হায়দ্রাবাদ থেকে তিরুপতি দর্শন। প্রথমেই স্পেশাল দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে নাক কুঁচকে যাচ্ছে। সাম্যবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত বাঙালিনীর পক্ষে যা অতিস্বাভাবিক। তারপর হঠাৎ সোনার রূপার ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধানো মন্দিরের ছায়াময় গর্ভগৃহে এক গ্রাম্য বৃদ্ধের গোবিন্দ ডাক শুনে নবনীতার মনের ভেতর টুকু এক লহমায় কান্না ধোওয়া হয়ে পড়ছে। লিখছেন,

আমারো বুকের গভীরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল সেই আহ্বান। ... এ ডাক প্রত্যেকের যার যার নিজের হারিয়ে যাওয়া স্বকীয় সত্তার প্রতি। ফিরে আসার ডাক। জীবনে তীর্থ করতে যাইনি, জানিনা এটাই নিয়ম কিনা। কিন্তু আমি এর আগে কোনও দেবতার প্রতি কখনোও শুনিনি এমন নিবিড়, এমন আকুল, এমন আন্তরিক, বিনা সাজের পারিবারিক সুরের ডাক। [পৃ.৪২,তদেব]

বলা চলে এই বিন্দু থেকে জাগ্রত হল নবনীতার তীর্থচেতনা। এ চেতনা শুধু পুণ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষা নয়, এর মধ্যে মিশে আছে আপামর ভারতবাসীর সৌভ্রাতৃত্ব, আবার একান্ত একাকী বেদনার শুদ্ধতম নির্জন প্রকাশ। এই ভ্রমণকাহিনীর শিরনামেই যেন সংশয়ীর সংশয়াবসানে বিশ্বাসের হাতে নিজেকে সমর্পণ করার আদল আছে। চিদভাগুের প্রদীপটির শিখা যেন উশকে উঠল তাঁর করুণায়।  এর পর কেবলি অমৃতকুম্ভের সন্ধান। সে রাতে দিল্লী পৌঁছে পরদিন কাকভোরে দাদার সঙ্গে এয়ারপোর্ট গিয়ে মাথায় হাত। দিল্লী থেকে কাশীর কোনো প্লেনে কোনোরকম ভাবে কোনও টিকিটই তাঁর নামে বুক করা হয়নি। প্রবল ধৈর্য ধরে কর্তব্যরত অফিসারের প্রায় হাতে পায়ে ধরে জুটে গেল ফকার ফ্রেন্ডশিপ উড়োযান। তাও অন্তত ঘন্টা চারেক স্নায়ুযুদ্ধের পর। অতঃপর কাশী এবং লাল্লনের ট্যাক্সি ধরে পুর্বকথিত শার্দূল সিংহের সঙ্গে ঝুঁসির দিক দিয়ে প্রয়াগ। অতঃপর অভিজ্ঞতা স্রোত তো আছেই তার চেয়েও আছে বাঙালি সমাজের বিপুল বৈচিত্র্যময় চলচিত্তচঞ্চরী! মোটামুটি সন্ধ্যা ছ'টা থেকে পরদিন সকাল দশটা। এই ঘন্টা ষোলো সময়ের মধ্যে রেখাঙ্কিত ভারতবর্ষের মানচিত্র মেলা হল খুকুর দুই চোখের সামনে জাদুকরের ভেলকির মতো, সাধকের গূঢ় সাধনার মতো!

আনন্দময়ী মায়ের তাবুর সামনে খোলা আকাশের নিচে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিলেন তিনঘন্টা হাঁটার পর। সেখান থেকে প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল বাঙালি এক দলের ছেলেরা। এক মিলিজুলি ট্যুর পার্টি। কেউ দোকান চালান, কেউ রেলের ফোরম্যান আবার এই দলেই আছে সহকর্মী অধ্যাপিকার বাবা কিম্বা খ্যাতিমান চোখের ডাক্তার। এঁরা স্থান দিলেন, খাদ্য দিলেন, শুতে দিলেন। তারপর স্নানটাও এই দলের সঙ্গেই হল একমণ জরির কাঞ্চিপুরম পরিধান করে হাতে এক পাটি জুতো নিয়ে! যদিও খুকুর তর্পণ মন্ত্র কন্ঠস্থ! সেবেলা কিন্তু তাবৎ বাঙালির হুঁশ নেই!  তা খুকু মহাযোগে স্নানের আগে ঘুরে বেড়ালেন আরো খানিকক্ষণ ; সাধুবাবার আখড়ায় পিতলের বাটিতে গরম গোলাপী চা পেলেন কিন্তু গাঁজার কল্কে টি পেলেন না। ঐ যে আমাদের দেশে উইমেন্স লিব দূর অস্ত! সাধুরাও তা জানেন। শুধু তাঁরা জানেননা খুকুটি কে। আদর করে জায়গা দেওয়া বাঙালি দলের ব্যবস্থাপনায় যদি বা অন্য এক তাঁবুতে শোওয়ার ঠাঁই মিলল সেখানে দেখা গেল ঠিক উলটো চিত্র। দুই বাঙালি বোন রাণীর মত সজ্জা করে কর্দমাক্ত ভাষায় ভূষিত করছেন স্বামীদের কারণ তাদের এমন খোড়ো তাঁবুতে এনে

তোলা হয়েছে। স্বামীটি মান ভাঙানোর প্রবল আয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, দেবদুর্লভ (কুম্ভমেলায়) কফি ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে স্ত্রীকে অফার করছেন, অথচ একই দলের অন্য এক চনমনে সদস্য কফির দিকে তাকানো মাত্র হিমশীতল ইস্পাত-স্বরে জানাচ্ছেন এ ব্যবস্থাটুকু কেবলি নিজেদের জন্য! এতোখানি অনুদারতা নবনীতাকে বাধ্য করেছে পা চালাতে। তারপর তারপর আবার মিলে গেছে অলখ অরুণোদয়! মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস, উষ্ণ ভালোবাসার করপরশ। বাবা এবং শ্বশুরমশাইয়ের তর্পণ কালে বুকের মধ্যে বেজে চলা হাহাকার নবনীতাকে ঋদ্ধ করেছে। সারা ভারতের মেয়েদের হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ শুনে ভিড়ের মধ্যে একাকী খুকু তাঁদের সব্বার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছে, লিখেছেন নবনীতা,

> তোমাদের সকলের সঙ্গেই আমিও রইলুম , আমিও আছি। জীবনে এমন ভাগ্য আমার আর কখনো হয়নি। বিগত হাজার বছর ধরে যাঁরা এসেছেন, আগামী হাজার বছরে যাঁরা আসবেন, সেই অনন্ত মালায় আমিও রইলুম একটি পুঁতি হয়ে গাঁথা। [পৃ. ১০১]

এবার আলোচনা করা যাক "হে পূর্ণ তব চরণের কাছে" [১১] নিয়ে। এই ভ্রমণ কুম্ভস্নানের বছর পাঁচ পর; আটের দশকের প্রথম দিকে। এ সময় নবনীতা অনেকটা স্বস্থ। আগেরবারের চেয়ে আরো অনেকটা পরিণত এবং পাকা হাতে ভ্রমণ সামাল দেওয়া বাঙালি। নিজের ইচ্ছেয় ঠিক করেন ভ্রমণ করবেন কি না এবং কোথায় কিভাবে করবেন। অর্থাৎ চাকুরীরতা মেয়ের আর্থিক এবং সামাজিক স্বাধীনতার যুগে আমরা উপনীত হয়েছি। যদিও এই স্বাধীনতা বহুলাংশে নির্ভর করে পরিবারভুক্ত অন্যান্য মানুষদের সদিচ্ছা এবং সহৃদয়তার উপরেও খানিকটা। নবনীতার বাবা বিখ্যাত কবি শ্রী নরেন্দ্র দেব এবং মা প্রথিতযশা সাহিত্যিক রাধারাণী দেবীর দৃঢ় চরিত্র নবনীতার মেরুদন্ড এবং ভাবনা দৃঢ়তর করতে অনেকটা সহায়তা করেছে।

এবারের ভ্রমণ মূলত চারধাম যাত্রা। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার, বদ্রী। সঙ্গী অষ্টাদশী কন্যা পিকোলো (অন্তরা) এবং এক বইতুতো ভাই রঞ্জন। যমুনোত্রী যাওয়ার মুখে হনুমানচটিতে অবস্থানকালে দেখা মিলল বেশ কিছু বাঙালি মহিলা যাত্রীর, যাঁরা দল বেঁধে বেরিয়েছেন একটি ট্রাভেলিং এজেন্সির সঙ্গে। আর শুধু এই চারধাম যাত্রাই নয়, তাঁরা একসঙ্গে এর আগে অমরনাথ ও গেছেন। আর খচ্চর চরাই হোক কিম্বা ডান্ডি কান্ডি ঘোড়া সবেতেই অকুতোভয়। একজন কলকাতার আর বাকি দুজন মফস্বলনিবাসিনী। এইরকম বহু নারী আছেন এযুগে যাঁরা বেড়িয়ে বেড়ান কিন্তু লেখেন না। সে যুগেও ছিল, সারদাসুন্দরীর পরবর্তীতে বলে যাওয়া জীবন-কথা থেকে স্পষ্ট। সাম্প্রতিক বর্তমানে এই মেয়েদের ভ্রমণ একাকী বা দলবদ্ধ ভাবে আরো অনেক অনেক বেড়েছে। এটা অবশ্যই স্বাধীনতার সুলক্ষণ বহন করে। কিন্তু সমাজ এবং পরিবারের অন্দরের শ্রেণীবিভাজন লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এই বেরিয়ে পড়ার ছাড়পত্র সব শ্রেণীর মেয়ের হাতে এখনো এসে পৌঁছয়নি।

এই মেয়েদের প্রসঙ্গেই এইবারের লেখায় একটা ভয় উঠে এসেছে, যেটা আগের কোনো লেখায় কখনো সেভাবে পাওয়া যায়নি, এতো স্পষ্ট ভাবে। শারীরিক নিগ্রহের ভয়, যৌন নিগ্রহের ভয়। এ ভয় নারীমনে মানুষের কাছে মানুষের পর্যুদস্ত হওয়ার তীব্র গ্লানি। পুরুষতন্ত্রের কাছে অন্যায় ভুলুণ্ঠন। মানবিকতার বিচ্যুতি। এই ভয় কিন্তু ১৯৭৮ এ কুম্ভের সময় নবনীতার মধ্যে ছিলা না। বরং বলেছিলেন আমাদের দেশের মতো মেয়েদের ভ্রমণের জন্য নিরাপদ দেশ আর কিচ্ছু হতে পারে না। এই লেখা থেকে একটু আগেই যেমন বলা গেল মেয়েদের ক্ষমতায়ন বাড়ছে তেমনি বলা সম্ভব মেয়েদের মধ্যে পরোক্ষ ভয় প্রবল হচ্ছে, যা আজকের জ্বলন্ত সমস্যা।

আবার ফিরি চারধামে। যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী হয়ে বদ্রী এবং কেদার দর্শনের পথে কেবলি বাঙালির মেলা। সাধু বাঙালি, ব্রহ্মচারী বাঙালি, কর্তা গিন্নি বাঙালি, দলবেঁধে আসা হিংসুক বাঙালি, হিন্দি বলতে গিয়ে নাকাল হয়েও 'হাম মাথা উঁচু করকে খাড়া হ্যায়' বলা বাঙালি, সপুত্রকন্যা বিখ্যাত কবি বাঙালি এবং সংসার কাঁধে বহন করা পুণ্যলোভী বাঙালি। আর তার মাঝে পর্বোতারোহিনী নবনীতা কেমন ভাবে পুজো দিতে হয় তা না জানা বাঙালি। এর থেকেই আবারো প্রমাণিত হয় তীর্থের সঙ্গে বাঙালি মেয়ের গলাগলি ভাব শুধুই আকিঞ্চনের নয়, পুণ্য সঞ্চয়ের হিসেব কষার নয়, এ টান মনের টান, অস্বাদিত প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার টান। এর মধ্যে দুটি ছবি, একটি মনকে বক্র করে তোলে। আর একটি মিঠে আনন্দে মন ভরিয়ে তোলে। মনে রাখতে হবে এ সময় স্বাধীনতা প্রাপ্তির বেশ পরের সময়, আর শিক্ষাও অনেকখানি ছড়িয়ে পড়েছে জনগণের মধ্যে। তাই এসময় সামাজিক চেতনা ক্রমশ ব্যক্তিগত পারিবারিক চেতনায় পর্যবসিত হওয়ার ছবি দেখা গেল। একদল তীর্থলোভী খুব প্রয়োজন এবং গাড়িতে জায়গা থাকা সত্তেও নবনীতাদের কিছুতেই নিলেন না কিন্তু পরে বদ্রীনাথের পথে তারাই আবার নবনীতাদের গাড়িতে অনেক মানুষ থাকা সত্তেও অনুরোধ জানালেন জায়গা পাওয়ার জন্য। নবনীতা স্পষ্টই লিখেছেন এই দলের সঙ্গে কিছুতেই আর মন খোলা গেল না।

তবে মন খুলল! গঙ্গোত্রী এসে হঠাৎ পথের বাঁকে ডাক শোনা গেল 'নবনীতা মাসিইই!' খুলে গেল প্রাণের ঝর্ণা! বিখ্যাত কবি এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও আধিকারিক কবিতা সিংহ এসেছেন পুত্র-কন্যা নিয়ে ছুটিতে। যাত্রাপথের কত আনন্দগান ভাগ করে নেওয়া হল হৈচৈ আহ্লাদে ! তারপর বদ্রীবিশালের পথ-- হিমালয়ের পথ--- যেন পথেই ঘর নবনীতার; অন্তত নবনীতার মনের! বদ্রীনারায়ণে এক দুরন্ত প্রাণকাড়া বঙ্গমহিলাচিত্র ! এক বাঙালিনীর বিপুল জমজমাট হোটেল এবং ট্রাভেলিং ব্যবসা। তিনি আবার পারিবারিক সূত্রে বিখ্যাত সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এর ভাই কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (অবনীন্দ্রনাথের নাতি) আত্মীয়া। যেন এই তীর্থপ্রান্তে একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হল! বাঙালি মেয়েকে শুধুমাত্র মেয়ে হওয়ার কারণে ঘরের বাইরে বেরোতে গিয়ে কী যন্ত্রণাটাই না সহ্য করতে হয়েছে। আর এখানে দেখা গেল স্বাধীন ভারতের বেশ দুর্গম অঞ্চলে আটের দশকে এক বাঙালিনী ব্যবসায়ী দিব্য কর্তৃত্বের এবং সাফল্যের সঙ্গে অর্থোপার্জন এবং পুণ্যোপার্জন দুইই করছেন! সমস্ত কাজ করেন তিনি নিজের হাতে নিজের তত্ত্বাবধানে। কোনো ভুল চুক হওয়ার উপায় নেই। স্বকর্মের ক্ষেত্র তৈরি করা এই উদ্যোগী বাঙালি নারীকে কুর্নিশ না জানালেই নয়! নবনীতাও জানিয়েছেন তাঁর লেখায় বিপুল পাঠকের দরবারে এই নারীকে উপস্থিত করে। ইতিহাস এভাবেই ফেলে আসা সময়ের সুতো ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়।

এবারে একটা পুরোনো প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসব আমরা। নবনীতার তীর্থযাত্রার নেপথ্যে-ভাবনায়। এবার একটু তাঁর কথা শুনে নিই তাঁরই কলমে; যখন ব্রহ্মকপালী শিলায় আবারো বাবা এবং শ্বশুরমশাই সহ সমস্ত পিতৃপুরুষের জন্য তর্পণ করতে গিয়ে তাঁকে যেন ছেয়ে ফেলে শোকার্ত হাহাকার। তখন,

সব সুন্দর জায়গাতেই আগে আমরা ঈশ্বরের পীঠস্থান রচনা করি, আর ঈশ্বরের সামনে এসে দাঁড়াতে গেলে আমরা একবার শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করে নিই আমাদের জন্মের কারণকে। জন্মদানের জন্য। এই যে এতোদূরে আজ এসে পৌঁছেছি, এই যাত্রা শুরু করে দেওয়ার জন্য পিতৃপুরুষকে ধন্যবাদ দিয়ে তবে আমাদের পুণ্য অর্জন হয়। হিন্দুধর্মের মধ্যে চট করে নেমকহারামির সুযোগ নেই। পিন্ডদান, পূর্বপুরুষকে

তৃষ্ণায় জলদান, এই যে অচ্ছেদ্য যুগযুগান্তরের মধ্যে যোগাযোগ সংরক্ষণ, এই ব্যাপারটার মধ্যে একটা আত্মিক সৌন্দর্য আছে। নম্রতার কৃতজ্ঞতার একটা শোভা আছে। মস্তকমুণ্ডনে যে বিনয়, আত্ম-সুখ বিসর্জনের যে বিমল প্রভা আছে, আশৌচ পালনের মধ্যে যে হাহাকার আর অভাববোধের প্রকট অনুভব--- সেগুলো আধুনিকতার নাম করে চিন্তাহীন কুলোর বাতাসে অযথা উড়িয়ে দিচ্ছি আমরা। পরে আর ডেকেও আনতে পারব না ফিরিয়ে। ... পুজোআচ্চায় বিশ্বাস করিনা। আমার ধারণা ভগবান খুবই চালু ব্যক্তি, দ্রুততম ইলেকট্রনিক ডিভাইসের চেয়েও দ্রুত তিনি মনের কথা পড়ে নেন। পুজোপাঠের কোনো দরকার হয়না। প্রাণে ভক্তি থাকলেই হল। সেতা ওঁর কম্পিউটারে নোট করা হয়ে যায়, এড়ায় না কখনো। ... আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যুক্তিবিবর্ণ একচক্ষু জীবন যাপন করবে। আমার সমবয়স্ক বন্ধুরাই তো আর তর্পণ করে না... অশৌচ পালে না। একটা পুরো মানুষ জন্মের মতো চলে যায়, অথচ জীবন বাইরে থেকে এমন ভাবে চলতে থাকে যেন কিছুই ঘটেনি। ... যেন জন্মদাতা কি জন্মদাত্রীকে আর দেখতে-না-পাওয়ার মতো চিরজীবনের ঘটনাটা কোনো ঘটনাই নয়! [পৃ. ১৮৬, 'হে পূর্ণ তব চরণের কাছে]

সমে ফিরে এল কুম্ভ থেকে শুরু হওয়া নবনীতার অন্তর্যাত্রা। তাই এই ভ্রমণ আধুনিকতম হয়েও তীর্থভ্রমণ। পাঁচ বছরের ব্যবধানে নবনীতার এই প্রজ্ঞার উৎসারণ তাঁর নিজেকেই নিজের দেওয়া তীর্থমনস্কতার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।।

সেকাল ও একালের তীর্থচিত্রের সামান্য তুলনা করলে দেখা যাবে, তীর্থের পুণ্যলাভ ছাড়াও যাত্রাপথের আরাম বিলাসিতা অনেকটা জায়গা ক্রমেই জুড়ে বসেছে। সাধারণ মেটে পাথুরে ধর্মশালার থেকে সংখ্যায় বেশি হয়ে যাওয়া আরামদায়ক দামি, রিসর্ট, হোটেল, টুরিস্ট লজ ক্রমশ জায়গা দখল করছে। রাণী চন্দ কেদার বদ্রী যাত্রায় পথের মুখে নির্গত পাইপে গাছের তলায় অন্যান্য অচেনা যাত্রিণীদের সঙ্গে স্নান করেছেন, কাপড় ধুয়েছেন, তাঁর সঙ্গীনীরা রান্না করেছেন, প্রতিদিনের খাওয়ারের চিন্তা করতে হয়েছে। তিরিশ বছর পর নবনীতা কিন্তু হোটেলের খাওয়ার খেয়েছেন, পি ডাব্লু ডি বাংলো আদায় করেছেন থাকার জন্য। বিলিতি স্নানঘর ব্যবহার করেছেন| দরকারে কবিতা সিংহের পরিচয় ব্যবহার করে বিড়লা গেস্টহাউসে জায়গা সিকিওর করছেন। এই ছবিটা জাগতিক উন্নতির ইঙ্গিত দেয় তীর্থস্থানে। তীর্থযাত্রার যে সামাজিক ছবিটা আগে মনে আসত এখন পুণ্যার্জনের ব্যক্তিগত ঈপ্সা তাকে কিছুটা নির্মেদ করেছে। তেমনি ভ্রমণের মধ্যে ফুটে বেরোনো বাঙালি সমাজের ছবিও ক্রমেই যাত্রাপথে কমে এসেছে আট দশকের পর। তারপর থেকে বর্তমান সময়ের মধ্যে তীর্থস্থানগুলি প্রকাশ্যেই বিভিন্ন ব্যবসায়িক হটস্পট ও হয়ে উঠেছে, মাধুর্য হারিয়েছে। তাই এখানেই তীর্থচিত্রের অধ্যায়ে আমরা রাশ টানলাম।।

তথ্যসূত্রঃ

১. রমাসুন্দরী ঘোষ, কাশী-দর্শন, বামাবোধিনী পত্রিকা, সম্পাঃ উমেশ চন্দ্র দত্ত, ফাল্গুন ১২৭০, কলকাতা

২. শ্রী লক্ষ্মীমণি দেবী (বসু), বিদেশ ভ্রমণ, বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ- আষাঢ়, ১২৭৭, কলকাতা

৩. সারদাসুন্দরী দেবীর লেখাটি কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণবিহারী সেনের কন্যা সরলাসুন্দরীর জামাতা যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীরকে মুখে মুখে বলা। যোগেন্দ্রলাল ১৮৯২তে এটি লিপিবদ্ধ করেন। সরলাসুন্দরী এটিকে 'মহিলা' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পরে ১৯১৩ সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে,

সারদাসুন্দরী দেবী, ফিরে দেখা -২, প্রথম সংস্করণ ২০১০, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

৪. সৌদামিনী দেবী, পিতৃস্মৃতি ও অন্যান্য রচনা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১১, কলকাতা, স্কুল অব উইমেন্স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সহযোগিতায় প্রকাশিত।

৫. বিসর্জন—নাটক, ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭, ( ইং. ১৮৯০), 'শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণাধিকেষু', 'রাজর্ষি (১৮৮৭) উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে নাট্যাকারে রচিত।

৬.  রাজলক্ষ্মী দেব্যা, কেদার-বদ্‌রী ভ্রমণকাহিনী ও অন্যান্য তীর্থচিত্র, সংকলন, অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৪১২, সেপ্টেম্বর ২০০৫,  দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেন্স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

৭.  শ্রী রানী চন্দ, পূর্ণকুম্ভ, প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৫৯, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা

৮. প্রসন্নময়ী দেবীর রচনা 'আর্য্যাবর্ত্ত' নিয়ে আমরা পরবর্তী 'শহুরে ভ্রমণ' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। প্রসন্নময়ী যা অপছন্দ করেছেন সরাসরি তীব্র বাক্যে বলেছেন। মনের উদারতার চেয়ে সমালোচকের দৃষ্টিকোণ তাঁর সমস্ত লেখায় প্রকাশিত।

৯.  শ্রী রানী চন্দ, হিমাদ্রি, প্রকাশ পৌষ ১৩৬৩, সংস্করণ আষাঢ় ১৩৭১, পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৪১৪ , বিশ্বভারতী, কলকাতা

১০.  নবনীতা দেবসেন, করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে, নব-নীতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৩, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১১. নবনীতা দেবসেন,  হে পূর্ণ তব চরণের কাছে, ভ্রমণ সমগ্র, প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৯, মাঘ ১৪১৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

## [ ২ ]

## বাঙালি মেয়ের শহুরে ভ্রমণ পর্ব

তীর্থ ভ্রমণের পরেই বাঙালিনীর যে ভ্রমণকথায় তার নিজের ঘর অঙ্গনের ছবি সবচেয়ে বেশি করে এসেছে সেগুলি সবই মূলত ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরকেন্দ্রিক ভ্রমণ। এর মধ্যে বোম্বে, শোলাপুর যেমন আছে তেমনি আছে উত্তরের দিল্লী, প্রয়াগ, বারাণসী আবার পূর্বের পাহাড়ি শহর দার্জিলিং। দক্ষিণের মাদ্রাজ বা মহীশূর কিম্বা উত্তরপূর্বের কামরূপও লেখিকাদের প্রসাদবঞ্চিত হয়নি। এছাড়া অনেকেই জব্বলপুর মুসোরি গাজিপুর পান্ধারপুর শ্রীনগর ইত্যাদিও গিয়েছেন। কিন্তু সেগুলিতে মূলত দর্শনীয় দ্রষ্টব্যের কথাই আলোচিত। আমরা আমাদের কাজের ক্ষেত্রে বেছে নিতে চাইছি কয়েকজন এমন ভ্রামণিককে যাঁদের লেখায় দ্রষ্টব্য দর্শন এবং সমাজচিত্রের বর্ণনা প্রায় সমান ভাবে ফুটে উঠেছে। কখনো তা তৎকালীন ঠাকুর পরিবারের অন্দরমহলের বর্ণনা, কখনো ঠাকুর পরিবারের হাত ধরে শুরু হওয়া সামাজিক রিফর্মেশনের বর্ণনা আবার কখনো বা বাঙালির সঙ্গে অন্য জাতির তুলনা, অন্য সমাজের আর নিজেদের সমাজের প্রতিতুলনা কিম্বা বাঙালি মেয়ের আর অন্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে তফাতের বিন্দু গুলিকে চিহ্নিত করা। স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে আসে সমাজের প্রতি মেয়েদের মনোভাবের ছবি এবং আবার কখনো বিভিন্ন সামাজিক প্যারামিটারে ভিন্ন সমাজের মেয়েদের মানচিত্র। কোথাও আবার দেখতে পাই অন্য এক দিকপাল বাঙালি পরিবারের ছুটি কাটানোর অমল আনন্দ-ছবি।

শুরু করব জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১)কে দিয়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৪২-১৯২৩) স্ত্রী। স্বামীর ঐকান্তিক ইচ্ছায়, ঠাকুরবাড়ির আবহে এবং অন্যান্য সদস্যদের সহায়তায় এবং সর্বোপরি নিজের চেষ্টায় ইংরেজি, ফরাসী সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা এবং বিভিন্ন বিদ্যাবিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। কিন্তু তা পরের কথা। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহ হয় জ্ঞানদানন্দিনীর ১৮৫৯-এ আর সত্যেন্দ্রনাথ সিভিলসার্ভিস পাশ করে বিলেত থেকে ফেরেন ১৮৬৪ তে। সত্যেন্দ্রনাথ শুধু প্রথম ভারতীয় আই.সি.এস.ই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নতুন যুগের নারীদের শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক করে তুলতে কট্টর সংশোধনপন্থী। জ্ঞানদানন্দিনী জানিয়েছেনঃ স্বামী বিলেতে থাকাকালীন গ্রাম থেকে কলকাতায় ভাড়াবাড়িতে এসে বাবা মা উঠে মেয়েকে আনতে গাড়ি পাঠালেও শাশুড়িমা পুত্রবধূকে বাবামায়ের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেননি; পরে যদিও মহর্ষির হস্তক্ষেপে যেতে পেরেছিলেন কিন্তু এই পারিবারিক বিধিনিষেধের অবস্থা থেকে জ্ঞানদানন্দিনীকে প্রথমে কলকাতার বাইরে বোম্বে এবং পরবর্তীতে বিলেত নিয়ে যান সত্যেন্দ্রনাথ সেও আবার সেই মহর্ষির অনুমতি নিয়েই; এই পর্যায়ে পৌঁছনো খুব সহজ কথা ছিল না। ঠাকুর পরিবারের সন্তান হলেও ঘরের মধ্যেই অমসৃণতার স্বাদ পেতে হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথকে। চিরকালই মেয়েমহল মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়ার প্রথম অবরোধ তৈরি করেছে। পুরুষরা অবরোধের রাশ বাইরে থেকে ধরে থাকলেও সময়, শিক্ষা এবং প্রয়োজন বিশেষে তা আলগাও করে দিয়েছেন। বলা ভালো নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন বহুক্ষেত্রে। পুরুষের সহায়তা না পেলে নারী একলা এই কাজ করতে পারত না বললে ঠিক হবে না, বলা যেতে পারে আরো অনেক যুগ সময় লেগে যেত। সেমিজহীন, ভিতরের জামাবিহীন শাড়ি সেসময় বাঙালি মেয়েরা ঘরে পরে থাকতেন, তা পরে কোনোমতেই বাইরে যাওয়া চলেনা। এমনকি ঠাকুর পরিবারেই সাংঘাতিক পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল মেয়েদের জন্য, যা ক্রমশ মহর্ষির অনুমতিক্রমে এবং সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল ইচ্ছেয়

একদিন নিজেকে মিলিয়ে দিল হাওয়ায় বাতাসে। এ কোনো জাদুকাঠি ফুসমন্তর নয়। এর জন্য চাপা বিক্ষোভ-বিরোধিতা সবই জ্ঞানদানন্দিনীকে বিশেষ করে সহ্য করতে হয়েছে। স্বর্ণকুমারীদেবী "আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার" [২] প্রবন্ধে লিখেছেন,

তখন অন্তঃপুরের অবরোধ প্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখনো মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী যাইতে হইলে ঘেরাটোপ মোড়া পাল্‌কীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনো নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পাল্‌কী শুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে। [প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৬]

স্বর্ণকুমারী এ লেখা লিখছেন প্রায় বিংশ শতাব্দীর মুখে এসে। তাতে কিন্তু মহর্ষির খুব উদারচিত্র পাওয়া গেল না। অন্তত নিজের ক্ষমতার অন্তর্গত যেটুকু পরিসর ছিল স্ত্রী সারদা দেবীর ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োগে, সেখানেও অনুমতি প্রার্থনার ঘনঘটাই লক্ষ্য করা গেল যতখানি অনুমতি দেওয়ার উদারতাটুকু ঠিক ততখানি ধরা পড়ল না।

স্বর্ণকুমারীর এই লেখার প্রায় সাড়ে তিন দশক আগে ১৮৬৪তে জ্ঞানদানন্দিনীর প্রথম যাত্রা স্বামীর কর্মস্থলে। বোম্বাই শহর। এই সময়কার সমস্তকথা স্মৃতি থেকে শেষ বয়সে কন্যা ইন্দিরা দেবীর আগ্রহে বলে গিয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী; লিপিবদ্ধ করেছিলেন ইন্দিরা। তাতে প্রথম এলো পোষাকের বর্ণনা। এক ফরাসি দোকানকে দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রীর জন্য বাইরে বেরোনোর উপযোগী পোষাক বানিয়েছিলেন যার পোষাকী নাম ছিল 'ওরিয়েন্টাল ড্রেস', যা জ্ঞানদানন্দিনীর মতে খানিকটা পেশোয়াজের মত হলেও ঠিক তা নয়, আরো অন্যরকম। তিনি নিজে সেই পোষাক পরতে পারতেন না, স্বামীর সহায়তা দরকার হত। তার আগে থেকেই বন্ধু ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষকে নিজের ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে বাড়িতে এনে নিজেদের শোওয়ার ঘরে মশারির তলায় অপেক্ষারত স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে আলাপ করান সত্যেন্দ্রনাথ। এসবই তিনি জ্ঞানদানন্দিনীর জন্য প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। কারণ ক্রমশ তাঁকে বোম্বে যেতে হবে, অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে স্বাভাবিক সামাজিক মেলামেশা রপ্ত করতে হবে এবং তারপর একাকী বিলেত পাড়ি দিতে হবে। তাই সাধারণ্যে প্রচলিত পরপুরুষের ঋণাত্মক ধারণাবৃত্তের বাইরে পা রাখতেই হত জ্ঞানদানন্দিনীকে। তিনি স্বামীর সহায়তা পেয়েছেন পূর্ণমাত্রায়। আর এই আয়োজনের যে কতটা প্রয়োজন ছিল বম্বে গিয়ে বুঝেছিলেন উচ্চপদস্থ সিভিলিয়নের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে তাঁর বাল্যকথায় [৩] নারীশিক্ষা এবং স্বাধীনতা বিষয়ে নিজের ভাবনা সম্পর্কে জানিয়েছেন,

আমার সামনে যে পর্ব্বত সমান বিঘ্নবাধা রয়েছে তা অতিক্রম করা কী কঠিন! যে প্রচণ্ড গড়ের মধ্যে আমাদের মেয়েরা আবদ্ধ, সে দুর্গ ভেদ করা কি দুরূহ ব্যাপার! অথচ আমার তা না করলেই নয়।[পৃ. ১৮]

সত্যেন্দ্রনাথ চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম করেছিলেন। এবার প্রস্তুতির পর ঘরের বৌকে পথে বার করার চ্যালেঞ্জ! বাঙালি সমাজ তখনো পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থির রোমান্টিকতার স্বাদ জানেনা। তাই চ্যালেঞ্জ বই কি! স্বর্ণকুমারী পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন,

স্ত্রীকে মেজ দাদা লইয়া যাইতেছেন বোম্বাই সমুদ্রপার, কিন্তু তখনো অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহির্বাটীর প্রাঙ্গণ পর্যন্ত হাঁটাইয়া গাড়ী চড়াইতে পারিলেন না। কুলবধূর পক্ষে ইহা এতই নূতন, এতই লজ্জাজনক যে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই ইহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। অগত্যা পাল্‌কী করিয়া তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে হইল। [প্রদীপ, ভাদ্র, ১৩০৬]

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রগতিশীল ঠাকুর পরিবারের এই চিত্র হলে সমস্ত বাংলাদেশে, গ্রাম বাংলায় এবং কলকাতায় অন্যান্য সাধারণ বা অর্থোডক্স পরিবারের কী ভয়ানক চিত্র হতে পারে তা অনুমান করতে কোনো বিশেষ পুরস্কার দাবী করে না।

আর জ্ঞানদানন্দিনীর ক্ষেত্রে এ তো গেল কেবলমাত্র বাইরে স্বামীর কর্মস্থলে যাওয়ার আগে সলতে পাকানোর পর্ব। এবার বোম্বাই প্রবাস। প্রবাসের সবচেয়ে বড় সুবিধা বাংলাদেশের মতো পর্দা নিয়মের কড়াকড়ি নেই সেখান। দেশীয় সমাজে থাকলেও সিভিলিয়নের স্ত্রীর উচ্চতম সমাজ অনেকটাই স্বাধীন এবং সাহেবি প্রথানুবর্তী। জ্ঞানদানন্দিনীর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে মনের সামান্য বাধা থাকলেও পরিবেশ পরিস্থিতি প্রবল প্রগতির অনুকূল। তাছাড়া সত্যন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বঙ্গরমণীর এই যে অবরোধ প্রথা তা তুর্কী আক্রমণের পর থেকে ইসলামিক ঐতিহ্যে গড়ে উঠেছে। হিন্দুদের এই পর্দা একেবারে ইতিহাস অসঙ্গত এবং অস্বাভাবিক। ফলে এই সর্বনেশে প্রথাকে মান্যতা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এর ফলে অকারণে মানুষের মানবিক অধিকার গুলি খর্ব হয় এবং বিধিনিষেধের বেড়ায় মেয়েরা সমাজের চোখে জবড়জং মাটির পুতুলের মতো নৈরাশ্যময় ভবিষ্যৎ বিহীন সামগ্রীতে পরিণত ও পরিগণিত হয়। বম্বে গিয়ে মানেকজী করসেদজীর বাড়িতে উঠেছিলেন তাঁরা। সেখানে বম্বের তৎকালীন লাটসাহেব নিমন্ত্রণে এসে জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে কথা বল্লেও জ্ঞানদানন্দিনী কোনো উত্তর দিতে পারেননি ইংরেজি বুঝতে এবং বলতে না পারার দরুণ। তাতে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন বিরক্ত হয়েছিলেন স্ত্রীর উপর (যেহেতু সেজভাই হেমেন্দ্রনাথের উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন ইংরেজি শেখাবার, কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল কিছুই শেখা হয়নি) জ্ঞানদানন্দিনীও সমধিক ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন নিজের উপর এবং তারপর থেকে জোরদার অনুশীলন শুরু করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে পরবর্তীতে কথায় কাজে তিনি অদ্বিতীয়া হয়ে উঠেছিলেন। বম্বে থেকে অনেক, অনেক কিছু শিখেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। টেবিল সাজানো এবং লাঞ্চ বা ডিনার পার্টির এটিকেট, সিভিলিয়নের স্ত্রীর আচার আচরণ, জামা জুতো পরা এবং বিশেষ করে শাড়ি পরা। এই শাড়ি পড়ার সামাজিক ইতিহাস তো অতিসুবিদিত, যা নাকি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ঘরের বাইরে পা না রাখলে আপামর বাঙালি মেয়ের জীবনে হয়তো এভাবে দেখা দিত না। হ্যাঁ পার্শিদের অনুকরণে ঠিক নয় তাঁদের অনুসরণে জ্ঞানদানন্দিনী দেশীয় বঙ্গীয় ছাঁদ বজায় রেখে শাড়ি পরা প্রচলন করলেন। নিজে তো পরে পরে চোস্ত হয়ে উঠলেনই তারপর পরবর্তীতে কলকাতায় ফিরে ঠাকুরবাড়ির সমস্ত মেয়েদের বেশবাসের আমূল পরিবর্তন ঘটালেন। সে কথায় আসা যাবে খানিক পরেই। বম্বেতে প্রথম যখন সত্যেন্দ্রনাথ ডিনার পার্টি দেন জ্ঞানদানন্দিনী সদ্যলব্ধ বিদ্যার বশে টেবিল অসামান্য সাজিয়ে নিজে লুকিয়ে পড়েছিলেন অন্দরে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বদ্ধপরিকর। তিনি স্ত্রীকে সবার সামনে তো নিয়ে এলেনই, তারপর ক্রমাগত তালিম এবং ইংরেজ শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে রেখে জ্ঞানদানন্দিনীকে শাণিত ছুরিকাটি করে তুললেন! তারপর সেই ছুরিকা আবারো বঙ্গীয় গৃহবধুর ছাঁচে পা রাখলেন। ১৮৬৬ তে ফিরলেন কলকাতা। গাড়িতে নামলেন শাড়ি সেমিজ জুতো মোজা পরে অসংকোচে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন মাথা উঁচু করে। স্বর্ণকুমারী আবারো লিখছেন সেই একই প্রবন্ধে,

ঘরের বৌকে মেমের মতো গাড়ী হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া সেদিন বাড়িতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। অপরূপ বেশ এবং আচার নূতনতর লইয়া বাড়িতেও এসময় ইঁহারা একরূপ একঘরে হইয়া রহিলেন । বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা বধূঠাকুরাণীর সহিত অসঙ্কোচে খাওয়াদাওয়া করিতে বা মিশিতে ভয় পাইতেন। [প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৬]

তবে ঠাকুরবাড়ির কন্যারা বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাড়াতাড়িই সোশ্যাল ডিস্টান্সিং কমিয়ে ফেলে নতুন যুগের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন| স্বর্ণকুমারি দেবীর লেখা উদ্ধৃত করে আবারো জানা যায়,

আমাদের বাড়িতে মেজদাদাই সমস্ত উলটাইয়া দিলেন। আমরা যখন শেমিজ জামা জুতা মোজা পরিয়া গাড়ি চড়িয়া বাহির হইতে লাগিলাম, তখন চারিদিক হইতে যে কীরূপ ধিক্কার উঠিয়াছিল তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নহে।।[তদেব]

বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা প্রফুল্লময়ী দেবী তাঁর মেজজা জ্ঞানদানন্দিনী সম্পর্কে জানিয়েছেন স্মৃতিকথায় [৪] কলকাতা ফিরে জ্ঞানদানন্দিনী শুধু নিজে নন, বাড়ির সমস্ত নারীর জন্য শাড়ি পরা সায়া পরা জামা জুতো মোজা পরার চল শুরু করছেন| অন্দরের অবরোধ ভেঙে ছায়াচিত্রকর বা ফোটোগ্রাফারকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসেন এবং পারিবারিক ছবিও তোলানো হয় অনেক। এই বোধ করি বাঙালি মেয়েদের অন্দরের ছবি তোলার ইতিহাসেরও সূচনা।

অবাক লাগে একটি সংবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু প্রথমে বেশ বিরোধী ছিলেন এহেন আধুনিকতার। কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং নিজের বিবাহপরবর্তী জীবনে স্ত্রী কাদম্বরি দেবীকে ঘোড়ায় চড়া শেখানো পর্যন্ত অনুশীলন করেন বাঙালির চোখের উপর দিয়ে নিত্য গড়ের মাঠে। এই মানসিক চলিষ্ণুতাই ঠাকুরবাড়িকে সব্বার থেকে আলাদা করে দিয়েছিল।

এইবারের (১৮৬৬) কলকাতায় আসার পর গভর্নরের বাড়ির পার্টিতে দাসীর সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনীকে পাঠিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, নিজে অনুপস্থিত ছিলেন অসুস্থতার কারণে। এই ঘটনায় কলকাতায় আলোড়ণ পড়ে যায়। একই পার্টিতে উপস্থিত প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৮৬) লজ্জায় রক্তবর্ণ হয়ে পার্টি ত্যাগ করে যান ঠাকুর পরিবারের বধূর এতোবড় স্পর্ধা দেখে। এমনিতেই পাথুরিয়া ঠাকুরপরিবারের ধ্বজাধারী প্রসন্নকুমার ছিলেন সমস্ত রকম সংস্কারের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালি দলের চূড়ামণি, তাই তাঁর এহেন আচরণ বিস্ময় না জাগালেও আমরা বিস্মিত হয়ে দেখি বহির্জগৎ অনভিজ্ঞা বাঙালি নারীটি কীভাবে আরো বড় পটভূমিকায় বাঙালিনীর বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠছেন ক্রমশ। তার সার্বিক পরিচয় পাওয়া যাবে 'বাঙালি মেয়ের বিলেত ও ইয়ুরোপ' ভ্রমণ শীর্ষক অধ্যায়ে।

জ্ঞানদানন্দিনী প্রথম বার বম্বে যাওয়ার পর থেকেই স্বামীর কর্মস্থলে বেশির ভাগ সময় একসঙ্গে থাকতেন। কখনো কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে থাকতেন। সত্যেন্দ্রনাথের কার্যোপলক্ষে আহমেদাবাদ, কারোয়ার, সিন্ধুপ্রদেশ বা কর্নাটকে অনেক দিন ছিলেন। এসময় সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারক মিস মারী কার্পেন্টার তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।[৫] ক্রমশ তাঁদের কাছে বেড়াতে যেতে আরম্ভ করলেন পরিবারের অন্যান্য কন্যারা। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। এভাবে

শুরু হল অনেকের যাতায়াত, অনেকের ভ্রমণকথা লেখার সূত্রপাত। তবে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রসঙ্গে আসার আগে অন্য একটি ভ্রমণকথা নিয়ে আলোচনা করতে চাইব যার লেখিকা অজ্ঞাতনামা।

১৮৭২ নাগাত দুই বাঙালিনী, দুই বোন কোন এক পুরুষ আত্মীয়ের সঙ্গে বোম্বে ঘুরে আসেন এবং বামাবোধিনী পত্রিকায় তাঁদের লেখা 'আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত'[৬] প্রকাশিত হয়। বোঝা যাচ্ছে এ সময় ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের স্ফুটনাঙ্ক বেশ উঁচুই ছিল নারীস্বাধীনতা বিষয়ে, কারণ এই দুই বোন অজ্ঞাত থেকে নিজেদের ভ্রমণের ফিল্ড রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। ফিল্ড রিপোর্ট বলছি কারণ ভ্রমণ জুড়ে পশ্চিমী রাজ্যে মেয়েদের স্বাধীনতা পোশাক আচার ব্যবহারের সঙ্গে বঙ্গললনাদের তুলনাই মূল কথা। তার সঙ্গে এসেছে নারীশিক্ষার কথাও। ফলে ভ্রমণ করতে গিয়ে পায়ের বেড়ি দূর করার চিন্তাও এই সময়ের মেয়েরা প্রবল ভাবে করতেন তা সহজেই অনুভব করা যায়।

এই দুই অনামিকা বোন যে যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন, ভ্রমণের একদম প্রথম যুগে, সে সময়ের সাপেক্ষে তা বেশ চমকপ্রদ। পরে ক্রমশ এই তথ্যগুলো আরো আরো উঠে এসেছে অন্যদের কলমেও। বাংলার মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে মারাঠি মেয়েদের ছবি উঠে এসেছে। বাল্যবিবাহ এবং প্রবল জাতিভেদ প্রথার প্রচলনের কথা এসেছে। আর এসেছে পোষাকের কথা। কুড়ি বা একুশ হাত শাড়ি কাছা কোঁচা দিয়ে পরার প্রথা বাঙালিনীর চোখে একেবারেই চমকপ্রদ ভাবে নতুন। মাথায় কাপড় না দেওয়ার রীতির কথাও এসেছে। অর্থাৎ সামাজিক লজ্জাবোধের দিক থেকে এই মেয়েরা অনেকটাই মুক্ত ছিলেন এবং অসংকোচে পুরুষদের সঙ্গে বাড়ির বাইরেও কোনো হরিসভা বা জমায়েতে ওঠা বসা করতে পারতেন। কিন্তু ঘরের ভেতর স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বলতে পারতেন না। এঁদের গয়নার বিবরণও আছে। তবে পার্শি রমণীদের দূর থেকে দেখেই এঁদের ভালো লেগেছিল সহজাত আভিজাত্যবোধের জন্য, সুন্দর পোশাকের জন্য। এমনকি এঁদের অনেককে ইংরেজ মেমদের সঙ্গেও তুলনা করেছেন লেখকদ্বয়। তারপর এসেছে বাঙালি নারী-পুরুষ এবং সামাজিক সম্পর্ক প্রসঙ্গ। তাঁরা লিখছেন নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব প্রসঙ্গে,

> অল্প বয়স্ক পারসী কুলবধূগণ একাকী রেলের গাড়িতে অতি দূর-দূরান্তরে গমনাগমন করেন। তাঁহাদিগের জাতীয় কোনো অপরিচিত পুরুষ এ প্রকার অসহায় কূলবধুকে পথিমধ্যে কোনো বিপদগ্রস্ত হইতে দেখিলে অতি সম্মান ও যত্নের সহিত সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ... বঙ্গদেশীয় হতভাগ্য পুরুষদিগের এরূপ ভদ্রতা কবে জন্মাইবে? যতদিন না হইতেছে স্ত্রী স্বাধীনতা অস্বাভাবিক ও বিপদজনক থাকিবে। [আমাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত]

এবং আরো বলেছেন ঐতিহাসিক বোম্বাই প্রেসিডেন্সী সম্পর্কে,

> বোম্বাইয়ে বয়স্থা নারীগণের শিক্ষার উপযোগী স্কুল আছে, সেই স্কুলে পূর্ণবয়স্ক বামাগণ অধ্যয়ন করেন। ... ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই স্ত্রীশিক্ষার যে একটি প্রধান স্থান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখানে স্ত্রীলোকদিগের প্রমুক্ত ভাব থাকাতেই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে অবস্থা এত অনুকূল হইয়াছে, যাহা বাঙ্গালায় প্রচলনের প্রয়োজন বলিয়া আমাদের বিবেচনায় অনুভূত হয়। [তদেব]

মনে রাখতে হবে ১৮৪৯ থেকেই বেথুন স্কুল পুরোদমে কাজ শুরু করেছে বাংলায়। কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতার ততোধিক উন্নতি তখনো সর্বব্যাপী হয়ে ওঠেনি। আর শিক্ষা এবং স্বাধীনতার বোধ যে হাতধরাধরি করে চলে তা কি অজানা? সে সময়ের বাঙালি পুরুষের এত উন্নতির কারণ এই দুই সামাজিক উপাদানের যথার্থ মেলবন্ধন যা নারীর জীবনে প্রায় বলপ্রয়োগ করেই

অনুপস্থিত রাখা হয়েছিল। এই বিন্দু থেকেই উঠে আসে পশ্চিমের হেজিমনি তত্ত্ব [৭], যা যুগে যুগে পুরুষের অঙ্গুলীহেলনে নারীসমাজ নারীর প্রতিই প্রয়োগ করে এসেছে নিতান্ত অজ্ঞানে।

আবার ফিরব ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়। এবারের লেখক স্বর্ণকুমারী দেবী। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সপরিবার বম্বে, আহমেদাবাদ, কারোয়ার ইত্যাদি জায়গায় অবস্থান করার ফলে ঠাকুরবাড়ির বহু সদস্যই তাঁদের কাছে বহুবার গিয়ে থেকেছেন, বেড়াতে গিয়েছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীও তার ব্যতিক্রম নন। জ্ঞানদানন্দিনীর তথ্য থেকে জানা যায় স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয় সন্তান জ্যোৎস্নানাথের জন্ম পুণায় জ্ঞানদানন্দিনীদের আবাসস্থলে। খুব মজার বর্ণনা (খানিকটা চমৎকৃত ভয়েরও)। পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বাঙালি মেয়ের ভ্রমণ আজো খুব সুপ্রচলিত নয়। যদিও জ্ঞানদানন্দিনী এই বেড়া ডিঙিয়েছিলেন, সে কথা যথাস্থানে বলা যাবে। তবে তাঁর অনুপ্রেরণায় স্বর্ণকুমারীও সেই একই পথে হেঁটেছিলেন সেটা বেশ একটা ট্রেন্ড ফলো করার মতোই কাজ। জ্ঞানদানন্দিনী ‘পুরাতনী’ গ্রন্থে জানাচ্ছেন ,

স্বর্ণকুমারী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাঁর বড় মেয়ে হিরণ্ময়ীকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে পুণায় যান। যে বাড়িতে আমরা ছিলুম সেটা উঁচু একতলা, জাঁকালোরকমে সাজানো ধনী পার্সীর বাড়ি, নদীর ধারে। আমি তখন ছেলেপিলে হওয়ার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝতুম না, আমার স্বামীও ধাত্রী প্রভৃতির কোন ব্যবস্থা করেননি, তিনি সংসারনভিজ্ঞ ছিলেন। একদিন আমরা দু’জনে নদীতে স্নান করে ঘরে ফেরবার পর স্বর্ণ বললেন তাঁর অস্বস্তি করছে। আমি পেটে তেল মালিশ করতে লাগলুম,-- তারপর হঠাৎ একটা কালো মাথা দেখে ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠে পড়ি-কি-মরি একেবারে চাকরদের ঘরে ছুটে গিয়ে তাদের একজনের বুড়ি মা কে ধরে নিয়ে এলুম। সে যা দরকার সব করলে, তারপর অবশ্য দাই প্রভৃতি এসে পড়ল। [পৃ.৩০, পুরাতনী]

স্বর্ণকুমারীদেবীর তিনটি ভ্রমণকথা আমরা আমাদের কাজের জন্য নির্বাচন করেছি। ‘প্রয়াগ যাত্রা’ [৮]- বৈশাখ-শ্রাবণ ১২৯৩ এ ভারতী পত্রিকায় চিঠির আকারে প্রকাশিত; ‘দারজিলিং’ [৯]- ভারতী পত্রিকায় পত্রাকারে প্রকাশিত ১২৯৫ বৈশাখ-কার্তিক এবং ‘পত্র’[১০] (সোলাপুর ভ্রমণ) ভারতী পত্রিকায় আশ্বিন-কার্তিক ১২৯৮- অগ্রহায়ণ ১২৯৯ এই সময়কালে প্রকাশ পায়|

প্রয়াগযাত্রাতে মূলত যাত্রার বিবরণ। বাঙালি মেয়ের উত্তর ভারতের শহর পরিক্রমার আগে যাত্রার সাংঘাতিক ঘনঘটার ছবি। তাতে যেমন বারে বারে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মেয়েদের যাত্রাপথে সামগ্রিক বাধার চিত্র তেমনি আলোকরেখায় ফুটে উঠেছেন আরেক আলোকিত পুরুষ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম সন্তান, স্বর্ণকুমারীর বড়দাদা শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)| মেধাবী সরল এবং খামখেয়ালী দ্বিজেন্দ্রনাথ কেমন বিপদে মধুসূদন হয়ে উঠেছিলেন দুটি ছোট ছেলেমেয়ের একাকী অভিভাবক স্বর্ণকুমারীর যাত্রাপথে তার অবিস্মরণীয় ছবি ধরা আছে এই ভ্রমণকথায়। এক তো স্টেশনে এসে আগে থেকে টিকিট কাটা এবং একটি কামরায় যাতে একাকী ঠাকুরবাড়ি ভ্রমণ করতে পারেন স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে সেসব ঠিক করে ফেলা আবার তারপর প্রায় প্রতি স্টেশনেই ইংরেজ দেখে জেনানা সহ বাঙালি বাবু সাজা আর দেশীয় লোক দেখে হ্যাট-কোটধারী ইংরেজ সাজার অফুরাণ প্রয়াস তাঁদের এই যাত্রাপথের আনন্দ অফুরন্ত করে তুলেছে! তাছাড়া খাওয়ার অর্ডার করে তার হাঁড়িকুঁড়ি সাজিয়ে কামরার দরোজার সামনে গ্রাম্য বধূ স্টাইল খাড়া করাও তাঁর এক আইডিয়া মানুষের অহেতুক ভিড় এড়াবার জন্য! এ কি সহজ কথা?! এসব এখন শুনতে যতটা হাসির আর সহজ মনে

হয় ১৮৮৬ সালে ঠিক ততখানি সহজ ছিল না। এবং এখনো অনেক পুরুষের ক্ষেত্রেই এমন ভাবনা ভাবা এক্কেবারে অসম্ভব তা আমরা হলফ করে বলতে পারি। স্বর্ণকুমারীর ভাষাতেই একবার শুনে নিতে চাইব,

এবার পূজার ভিড়ের সময় যাইতেছি— আমরা চারজন হইলেও এসময় এবার অন্যলোকে গাড়ীতে উঠিতে পারে—এবার কি রিজার্ভ করিতে হইবে? –তিনি তো শুনিয়া খড়্গহস্ত, --বলিয়া বসিলেন—"আমি থাকিতে গাড়ীতে অন্য লোক উঠিবে—বল না কেন আমি বাঁদর।"... কিন্তু ষ্টেসনে আসিয়া দেখিলাম কথাটা ওজন না করিয়া তিনি বলেন নাই। আমরা আসিবার আগেই তিনি তো ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন,--এখানে আসিয়া ষ্টেসন মাস্টারের সঙ্গে আপ্যায়িত করিয়া লইয়া আগে হইতেই কাজ অনেকটা গোছাইয়া রাখিয়াছিলেন,--আমরা আসিবামাত্র তাড়াতাড়ি গাড়ীর একটা কামরায় জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া আমাদের সঙ্গে –আমাদের যাঁহারা পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন—তাহাদের শুদ্ধ গাড়ীতে উঠাইয়া—এমন একটা হুজুক করিয়া তুলিলেন যে অন্য কেহ আর সে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল না! ষ্টেসন মাস্টার পর্যন্ত সেই আড়ম্বরে এমন কানা হইয়া গেলেন যে অন্য কাহাকেও তিনি আমাদের গাড়ীর দিকে কটাক্ষপাত পর্য্যন্ত করিতে দিলেন না।। [পৃ.৪, প্রয়াগ যাত্রা, পথের কথা]

তারপর,

গাড়ী একটা বড় ষ্টেসনে আসিয়া লাগিল, এতক্ষণ আমরা একটা কামরায় নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতেছিলাম, এইখানে দুইজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীকে গাড়ির অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা গেল ... আমরা তিনজনে মহা জড়সড় হইয়া পড়িলাম—কিন্তু সক্রেটিস দাদার সে ভাব দেখিলাম না। ... নিষ্পরোয়াভাবে মুখ টিপিয়া একবার হাসিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ইংরাজি কোট ও হ্যাটটা পরিয়া লইলেন—অমনি সে সোনার কাটির স্পর্শে তাঁহার বাঙ্গালীত্ব যেন ঘুচিয়া গেল, তিনি দশ হাত শরীর আরো দশ হাত ফুলাইয়া দু একটা গম্ভীর হুঙ্কার ছাড়িয়া গাড়ির দরজায় মুখ বাহির করিয়া দাঁড়াইলেন। ... ভদ্রলোক দুইটি কামরার মধ্যে একবার চাহিয়া না দেখিয়া মেমসাব মেমসাব করিয়া নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন---সাহেবের আড়ম্বর দেখিয়াই আর কি তাহাদের চক্ষুস্থির। দু একটা ষ্টেসনের পর আবার তাঁহার সাজসজ্জা করিতে হইল। চাপকান টুপী পরিয়া বাঙ্গালী বাবু সাজিয়া লইলেন—কেননা এবার দুইজন ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ এদিকে আসিতেছিল...সে ইংরাজেরা আমাদের গাড়িতে উঠিল না বটে—জেনানা জেনানা করিয়া অন্য কামরা দেখিতে চলিয়া গেল! [পৃ.৬, তদেব]

পথ চলতে চলতেই নারীজাতি সম্পর্কে নারীকৃত সামাজিক শাসনের একটি ছোট্ট ছবি উঠে এসেছে। এবং দুঃখের সঙ্গে অনুভব করতে হয় আজ এই একুশ শতকেও সমাজের প্রায় সর্বত্রই এই ছবি এখনো নানারূপে বিরাজমান। মেয়েদের কাউকে পরোয়া না করা হাসি কিম্বা হাঁটা চলা আজো সমাজের চোখে জ্বালা ধরায়। কিমাশ্চর্যম দেড়শো বছর আগেও চিত্রটা একই ছিল! এমনকি উচ্চকোটির সমাজেও। প্রখ্যাত লেখিকা স্বর্ণকুমারী যখন একজন মা তখন তাঁর মেয়ের হা হা হাসি শুনে সমাজের ভ্রূকুটি, ঘরের মহিলাদেরই ভ্রূকুটি সহ্য করতে হয়েছে।

বাস্তবিক মেয়েটির এই অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসটা কমাইতে পারিলে আমিও পীরের কাছে সিন্নি দিয়া আসি। মেয়ের জন্য দিদিমাদের কাছে তিরস্কার খাইতে খাইতে মায়ের পর্য্যন্ত প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। কেননা তিনি ... এখন আর ঠিক খাঁটি দুই চারি বৎসরের মেয়েটি নাই; তবু এখনো তাহার বয়সোচিত দেশোচিত বিজ্ঞতা হইল না! (আমি বলিতেছি 'হইল না', কিন্তু দিদিমারা বলেন—মায়ের শিক্ষার দোষে হইল না।) [পৃ.৯, তদেব]

রেলগাড়িতে প্রকৃতির লীলা দেখে মেয়ে হিরন্ময়ীর হাসিতে মায়ের এই যে সনিঃশ্বাস অনুভব তার প্রতিস্ব ভারতবর্ষীয় তথা বাঙালি সমাজেই লুকিয়ে আছে। ঠিক যেমন পরে দেখা যাবে দার্জিলিং ভ্রমণের সময় স্বর্ণকুমারী জানতে পারছেন এক পাহাড়ি পুরুষের থেকে, যে, "উন্নত-নাসিকা"(সর্বার্থে) স্ত্রী পাহাড়িরা একেবারে পছন্দ করে না। আসলে পুরুষের তির্যক সমালোচনার লক্ষ্য চিরকালই 'উন্নত' মেয়ের দল, তা মেধায়, চরিত্রে, শিক্ষায়, বুদ্ধিবৃত্তিতে, চিদবৃত্তিতে কিম্বা

আর্থসামাজিক অবস্থানের দিক থেকে যেভাবেই হোক না কেন। সততাকে , জীবনের সৎ প্রয়াসকে ঠোকর মারার চেষ্টা পুরুষের তরফে আবহমানের।

এবার এলাহাবাদ। মনে রাখতে হবে এ সময় বাঙালির স্বর্ণযুগের সূচনা। কি সাহিত্যে, কি রাজনৈতিক চেতনায় এবং ভারতবর্ষীয় রাজনীতিতে। শিক্ষা সাহিত্য ইংরেজি শিক্ষা এবং সঙ্গীতের স্ফুরণ তো আছেই! স্বর্ণকুমারীর লেখায় কলকাতা বা বাংলা ছাড়িয়ে বাংলার বাইরের প্রবাসী বাঙালির মেধাগৌরবও সযত্নে চিত্রায়িত। সেখানে প্রবাসী বাঙালিদের নির্ভীক চরিত্রের কথা উঠে আসে। তিনি জানান অবাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অনেক বেশি ইংরেজের সহায়ক। কিন্তু এলাহাবাদের বাঙালিরা সকলে মিলে অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেছেন এবং ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন। অবাঙালি ধনীরা বাঙালিদের বেনামে তার লভ্যাংশের ভাগীদার। এই সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে ইংরেজের ভেদ নীতির পরিচয়। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বাবু সম্প্রদায়কে প্রথম দিকে ইংরেজরা নিজেদের বন্ধু মনে করত। তাই তাদের বেলা জুতো খুলে ইংরেজের ঘরে ঢোকার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮২০-১৮৬৭)[১১] সেইকারণে একবার এক কমিশনারের সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে এসেছিলেন। পরে এই প্রথা আইন করে রদ করা হয়। রাজনীতিতে আমাদের দেশের মানুষের অবস্থান বোঝানোর জন্য স্বর্ণকুমারী লিখছেন,

সম্প্রতি দু এক বৎসর হইল—নূতন আইনের একজন দেশীয় সিভিলিয়ন এক ইংরাজ সিভিলিয়ানের কাছে জুতা খুলিয়া যাইতেছিলেন—ইংরাজ তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিলেন—“তুমি এখন আমাদের দলের লোক, তুমি জুতা খুলিবে কেন, তোমার বাপ যখন আসিবেন, জুতা খুলিয়া আসিবেন।” যা হক, প্রতিদিন রাজনৈতিক সম্বন্ধেও এ দেশ অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে। [পৃ. তদেব]

স্মর্তব্য পরবর্তীতে এই পিতা পুত্রের ভেদের আদলেই ইংরেজ শাসককৃত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভেদ হিন্দু-মুসলমানের বুক চিরে দিয়ে চলে গেছে চিরতরে।

সমস্ত ভ্রমণকাহিনী জুড়ে স্বর্ণকুমারীর দার্শনিকতা, ব্যক্তিত্ব আর মেধার দ্যুতি খেলা করে বেড়ায়। এলাহাবাদ শহরের দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখে নিজের মত করে জ্ঞানের মানদণ্ডে তুল্যমুল্য বিচার করেন। তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টি বড় দিদি সৌদামিনীর মতোই ব্রাহ্ম এবং হিন্দুত্বের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে বিভাজিত। যেকারণে বার বার বলিদান প্রথার বিরুদ্ধস্বর শোনা যায় বা গছের তলায় সিঁদুর রঞ্জিত হিন্দু দেবদেবী মূর্তী দেখে তাঁর একান্তই পুতুলখেলা বলে মনে হয়। তবে দু একটি ধর্মীয় স্থান দেখলেও তীর্থের ইচ্ছে বা মহিমা কোনোটাই তাঁকে স্পর্শ করেনি, যতখানি করেছিল পরাধীন ভারতবর্ষের পরিচিতের চেয়ে অন্যরকম নাগরিক সমাজ, যাদের ভাষা, জীবন-যাপন, কাজ সবই আলাদা। যদিও উত্তর ভারতে সেসময় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের চেয়ে তার নিয়ম অনেক বেশি যুক্তিসম্পন্ন মনে হয়েছিল স্বর্ণকুমারীর। বাংলাদেশে যেমন বয়সের কোনো বাঁধা নিয়ম না মেনেই বিবাহের পরদিন মেয়েটিকে ত্যাগ করা হত শ্বশুরঘরে পাঠিয়ে, উত্তরভারতে কিন্তু তার চল তেমন ছিল না। বিবাহের পর কন্যা স্বামীর বাড়ি থেকে ঘুরে এসে পিতৃগৃহেই অবস্থান করতেন যতদিন না ঋতুমতী হচ্ছেন। ততদিনে মেয়েটির মানসিক বিকাশও অনেকটাই সম্পন্ন হয়ে যেত। এই প্রথা তুলনামূলক ভাবে স্বর্ণকুমারী ভালো মনে করেছিলেন, কারণ আপামর বাংলাদেশের মেয়েরা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মতো স্বামীকে পিতৃগৃহে রাখার বদান্যতা লাভে একেবারেই

বঞ্চিত ছিল। আবার কোনো অ-বিলেতফেরত, অব্রাহ্ম গৃহকর্তা তাঁর কন্যাদের শিক্ষার আলোয় পূর্ণ করে তুলেছেন এবং সেই পরিবারের শিক্ষিত মেয়েদের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর সাক্ষাৎ হয়েছে, ভাবের এবং কথাবার্তার আদানপ্রদান হয়েছে এই ঘটনাটি স্বর্ণকুমারীকে মনে মনে আলোড়িত করে তোলে। কারণ উনিশ শতকের শেষের দিকে যখন স্বর্ণকুমারী বেড়াতে যাচ্ছেন সেই সময়ে বা তার আগে এবং পরেও বহুকাল ধরে নারীশিক্ষার বিরোধী ভাবনা সমাজের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্বর্ণকুমারীও উল্লেখ করেছেন শিক্ষিত নারীর যে কোনো সামান্য সামাজিক বা সাংসারিক বিচ্যুতিকে মেয়েদের শিক্ষা লাভের কুফল বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। তাকে কখনোই স্বাভাবিক মানবিক ত্রুটি হিসেবে দেখা হয়না। অথচ শিক্ষিত মেয়ের সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি গ্রহণ করা পুরুষের চেয়ে কত কম। স্বর্ণকুমারী একটি চমৎকার প্রশ্নে ঘায়েল করেছেন এই সমাজ-পোষিত মগজধোলাইয়ের মনোভাবকে। তাঁর মতে শিক্ষিত পুরুষ যাঁদের বি.এ. এম.এ. অভিধার ছড়াছড়ি, তাঁরা কি সকলে দেবতা? তাহলে তো আপামর ভারতবর্ষের নারীদের যে দুর্দমনীয় দুর্দশা তা হওয়ার কথা ছিল না !

এরপর যে ভ্রমণের ইতিহাসে বাঙালি সমাজের টুকরো ছবি উঠে আসে তা হল "দারজিলিং"।

দার্জিলিং বললেই যেমন পাহাড়ি পথের বাঁকে বাঁকে ঝরণা আর নানা রঙের ফুল মনে আসে যেমন লঘুভার মেঘ কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর ভেসে যাওয়া মনে আসে তেমনি রসময় লঘুভার কিন্তু ভাবনাজারিত স্বর্ণকুমারীর দার্জিলিং থেকে লেখা পত্র গুলি। স্বর্ণকুমারীর লেখায় প্রথমেই বাঙালি মেয়ের পরাধীনতার বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। প্রতিবার। প্রয়াগের সময়েও লিখেছিলেন আবার 'দারজিলিং' পত্রেও বারে বারে ফিরে এসেছে খাঁচার পাখির উপমা। সোনার দাঁড়ের মোহে নিজেকে ভোলানোর কথা। যা নাকি নারীরা করে এসেছেন, করতে বাধ্য হয়েছেন বহুযুগের ওপার থেকে। বার বার বলছেন,

আমরা যে খাঁচার পাখি, খাঁচায় মরতে আমাদের তো দুঃখ নেই, কিন্তু কষ্টে সৃষ্টে শিকলি কেটে আকাশে ওঠা যদি কেবল সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে ধূলায় লুটিয়ে পড়ার জন্যই হয় তো সে কি সামান্য কষ্ট? [পৃ. ৯০, স্বর্ণকুমারী দেবীর ভ্রমণকথা]

বা, বেড়াতে যাওয়ার কল্পনা করতে থাকা বাঙালি মেয়ের সামনে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ এসে উপস্থিত হলে ,

আমরা যে ডানাকাটা পাখী, যুক্তির দৌড় যতই হউক—পায়ের দৌড় যে কিছুই নাই-দুই এক পা গেলেই বেশ অনুভব করা যায়।। [পৃ. ৯৩, তদেব]

দার্জিলিং এসে থেকে নানারকম মজা। যদিও প্রথম দিকে একটু শরীর খারাপ থাকায় কটাদিন বিছানার আশ্রয়েই কেটেছে। তারপর একটু শরীর সেরে উঠে ঠাণ্ডা সইয়ে নেওয়ার পর কেবলি আমোদ। কখনো একা কখনো দলবেঁধে মেয়েদের ভ্রমণ, পাহাড়ের মেঘ কুয়াশা মাখা তিস্তা রঙ্গিতের প্রবহমানতা, কাঞ্চনজংঘার রহস্যময়তা। আবার তারি সঙ্গে সবাই মিলে হলঘরে বসে রবীন্দ্রনাথের গলায় নানা বইয়ের পাঠ শোনা, কখনো পাঠ করা বা কোনো দার্শনিক তত্ত্বের তর্ক ব্যাখ্যা এবং জীবনে তার প্রয়োগ বিষয়ে উঁচু গলায় হইচই। আর যেটা সেটা হল নিজের এবং সঙ্গিনীদের সম্পর্কে বর্ণনা,

এখন আমরা ঢের বেশি বেড়াইয়া বেড়াই, লোকে বলে আমাদের পা হইয়াছে। তবু কিন্তু বেড়াইয়া সাধ মেটে না, মনে হয় সারাদিনই বাহিরে থাকি। [পৃ. ৯৯]

লক্ষণীয় এই মনোভাব। এই কি যুগে যুগে বেড়িবদ্ধ বাঙালি মেয়ের মনে একান্তে গুঞ্জরিত হয়নি? কিন্তু সকলেই সমান সুযোগ পেতে পারেন না, বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের মরে সৃষ্টির আদিযুগ থেকে প্রাণীজগতের রীতিই এই।[১২]

এখানে জলাপাহাড়, সিঞ্চুল, টাইগার হিল বেড়াতে বেড়াতে মন অনুভব করে অনন্য প্রসারণ। যে প্রসারতা কলকাতার গৃহবন্দী জীবনে একেবারে অমিল। উদার মহান হিমালয় যে শুভ্র সুবাসে স্পর্শ করে মন তার অস্তিত্ব অনুভব করছেন স্বর্ণকুমারী। তবে শুধু মন তাঁর আকাশে আর পাহাড়েই নয়, পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো নিতান্ত নিরীহ মাটির মানুষ নব্য বাঙালি তথা বলা ভালো বাঙালিনীদের কাজ এবং পোশাকের দিকেও বিচরণ করেছে সূক্ষ্ম রসবোধ আর শাণিত দূরদৃষ্টি নিয়ে।

এই পত্র লেখারও এক দশক আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী কাদম্বরী দেবীকে ঘোড়ায় চড়ানো অভ্যাস করতেন আগেই বলা হয়েছে। যদিও ১৮৮৮তে যখন এই পত্রগুলি প্রকাশিত হচ্ছে তখন কাদম্বরী দেবী মৃত। বাঙালি মেয়েদের ঘোড়ায় চড়া বিষয়টি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটা অবসেশন ছিল বলা যায়। এটা তিনি মনে করতেন মেয়েদের স্বাধীনতার সহায়ক। দার্জিলিং-এ এসে পারিবারিক আত্মীয়ের এক কন্যা কেবলি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিণী হতেন। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিছু বাঙালিনীও তেমনটা অভ্যাস করছিলেন। তারপর স্বর্ণকুমারীর লেখায় পাওয়া যায় ইন্দ্রসভাতুল্য দার্জিলিং-এ বাঙালির প্রতি শাসকের ঘৃণার চিত্র,

... অনেকে এখানে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ান, এমনকি বাঙ্গালী মেয়েদেরও ঘোড়ায় চড়তে দেখা যায়। একদিন পাঁচ-ছয় জন বাঙ্গালী একদিককার রাস্তা জুড়ে স্ত্রী-পুরুষে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন, দুইজন ইংরাজের সেটা বড়ই অসহ্যবোধ হয়েছিল—তারা আস্তে আস্তে বলে গেল— Damnation take them; ওদের মতো উঁচুতে মাথা রাখতে দেখলে ওদের ভালো না লাগবারই কথা। [পৃ. ৯৪]

ইতিহাস বলে ১৮৮৫তে অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের পরামর্শ অনুসারে (আসলে ইংরেজেরই সুবিধার্থে সেফটি ভালভ গড়ে তোলার লক্ষ্যে) ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের অনুমতি দিতে বাধ্য হয় উপনিবেশ ভারতবর্ষের বিদেশী শাসক। যার থেকে জন্ম হয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের।[১৩] এই ঘটনা সাধারণ ইংরেজের মনে ভারতবাসী সম্পর্কে বিদ্বেষ প্রবলতর করে তুলেছিল।

এই অশ্বারোহণ বিষয়েই মেয়েদের পোষাক ভাবনায় স্বর্ণকুমারীর মন্তব্য অতি সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের যুগে। যদিও বাড়িতেই ভ্রাতৃবধূকে ঘোড়ায় চড়তে দেখেছেন, তবু তাঁর মনে হতে থাকে শাড়ি পরা মেয়েরা ঘোড়ায় চড়লে কেমন ভয় ভয় লাগে, মনে হয় এখুনি পরে যাবেন! তাঁর প্রশ্ন যদিও ভারতবর্ষীয় মেয়েরা বহুযুগ ধরে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে তাহলে কি মারাঠি মেয়েদের মতো কাছা দিয়ে শাড়ি পরাই বাঙালি মেয়েদেরও ভবিতব্য? নাকি বরং পুরুষদের কাজ যেমন মেয়েরা করতে পারেন অনায়াসে (কিন্তু করতে দেওয়া হয়না) ক্রমশ মেয়েরা কি তেমন পুরুষদের পোষাকই পরিধান করবেন ? এযুগে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য আর এমন চিন্তাশক্তিকে কুর্ণিশ করা ছাড়া কোনো পথ নেই।

স্বর্ণকুমারীর সময়কার প্রত্যেকজনের লেখার মধ্যেই কম বেশি ইতিহাসের টুকরো ছবি ঢুকে আছে। আর এই ইতিহাসে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সমাজ। সেদিন সত্যিই বাঙালির বিপুল গৌরবের দিন ছিল। কিন্তু এত গৌরব সত্ত্বেও বাঙালি মেয়েদের জীবন খুব সহজে মসৃণতার স্বাদ পায়নি। শিক্ষা সংস্কৃতির আলো বাঙালি পুরুষই একচেটিয়া ভাবে শুষে নিচ্ছিলেন। তবে ব্যতিক্রমও অবশ্যই ছিল।

এ সময় বাঙালি মেয়েরা যেখানেই যেতেন সেইখানের সমাজ সাপেক্ষে নিজেদের সমাজের তুলনা করতেন এবং নিজেদের সমাজে মেয়েদের অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনা অবশ্যই লিপিবদ্ধ করতেন। স্বর্ণকুমারী ও প্রয়াগে বা দার্জিলিং এ এই তথ্যের অনুসন্ধান করেছেন। এছাড়া পাহাড়ি সমাজে বিবাহের ব্যবস্থা মেয়েদের পক্ষে অনুকূল এবং যথেষ্ট সহজ। এমনি মেয়েদের কথা জানবার আগ্রহ তাঁর সোলাপুর, পুণা এবং বম্বে গিয়েও হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। সোলাপুর থেকে লেখা 'পত্র' শীর্ষক ভ্রমণবিবরণে সমাজের উচ্চতম সিভিলিয়ন সোসাইটির মেয়েদের বর্ণনা যেমন আছে (তা বহুক্ষেত্রেই দেশের নাড়ির সঙ্গে শিকড়-সম্পর্ক রহিত) তেমনি আছে দেশীয় মারাঠি মেয়েদের বর্ণনা, তাদের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পণ্ডিতা রমাবাইয়ের(১৮৫৮-১৯২২)[১৪] সঙ্গে সাক্ষাতের অসামান্য অভিজ্ঞতা। সময় টা ১৮৯১-৯২।

সোলাপুর থেকে স্বর্ণকুমারীরা পুণা এবং বম্বেও গিয়েছিলেন। ফলে ১৮৮৯ এ প্রতিষ্ঠিত রমাবাইয়ের শারদা-সদন [১৫] (নানা রকম মেয়েদের আশ্রয়স্থলটি)দেখার সুযোগ হয়েছিল। নিজের জীবনের সাংঘাতিক দুর্গতি সত্ত্বেও পণ্ডিতা যেভাবে দেশীয় নারীসমাজের জন্য কাজ করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রমে তার অবদান আজো আমরা মনে রাখতে বাধ্য হই। তিনি নিজে বহু দুর্গতির পর পড়াশোনা করেন এবং বিলেত থেকে ফিরে এসে মেয়েদের স্কুল, মেয়েদের জন্য মিশন ইত্যাদির প্রচলন করেন মহারাষ্ট্রে। অখিল ভারতীয় মহিলা আর্যসমাজের প্রচলন ও তিনিই করেন। রমাবাই এবং স্বর্ণকুমারী কাছাকাছি বয়সী ছিলেন। ১৮৯২ এ রমাবাইয়ের কর্মকাণ্ড শিখরচুম্বী। তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী পর্যন্ত রাখতে রাজী ছিলেন। বেশ কিছু বাঙালি বিধবাও শারদা সদনে আদরের ঠাঁই পেয়েছিলেন। পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী তাঁদের জন্যও বাঙালি শিক্ষিকার বন্দোবস্তের প্রয়াস করেছিলেন। এই উদার স্নেহ স্বর্ণকুমারীকে মথিত করেছিল। সমাজ সংসার স্বামী কিম্বা পিতার ঘরে আশ্রয় না পাওয়া মেয়েদের মধ্যে স্বাবলম্বনের বীজ বপন করে দিচ্ছিলেন পণ্ডিতা। এই প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী জানিয়েছেন, পুণায় মেয়েদের শিক্ষিত করার এই মহান সাধনা রমাবাই করছেন ফলে পুণার মেয়েরা ক্রমশ এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু সোলাপুরে এবং সামগ্রিক ভাবে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মেয়েদের শিক্ষার হার কলকাতার চেয়ে অনেক কম ছিল। সেসময় কলকাতা ছিল বাঙালি সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র। রমাবাইয়ের শিক্ষা কেন্দ্রে সারাদিন কাটিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারীরা। সেখানে নানাভাবে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে বঙ্গীয় এবং মারাঠি মেয়েদের তুলনা। স্বর্ণকুমারী নিজে লিখেছেন,

> হায়! বঙ্গে মহাত্মা পুরুষ উদয় হইয়াছেন সত্য, কিন্তু বঙ্গের মহাত্মা রমণী, বঙ্গের রমাবাই কবে উদয় হইবেন? যিনি বঙ্গের নিরাশ্রিতদিগের দুঃখে হৃদয়শোণিত পাত করিতে সমর্থ হইয়া তাহাদিগের দুঃখ ক্ষালন করিতে পারিবেন! যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন হতভাগিনীগণ, তোমরা বুকফাটা কান্না কাঁদো, তোমাদের অশ্রু কেহ মুছাইবে না। ধন্য তুমি রমাবাই! [পৃ. ১৬৫]

শারদা সদনে রমাবাই স্বর্ণকুমারীদের সামনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতায় রাজা রামমোহন রায়ের উল্লেখ ছিল, তা স্বর্ণকুমারীকে অভিভূত করেছিল। আবার সদনের মেয়েদের অভিনীত শাশুড়ি বৌমার ছোট ছোট চিত্র দেখে স্বর্ণকুমারীর মনে হয়েছিল, বঙ্গে শাশুড়ি কর্তৃক অপদস্থ হওয়া বৌমার সংখ্যা কম! এক্ষেত্রে ভ্রাতৃবধূ জ্ঞানদানন্দিনীর নিজেরই অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। তাই স্বর্ণকুমারীর এহেন সামাজিক বিচারকে খানিকটা অসম্পূর্ণ এবং একপেশে মনে হয়। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালি মেয়েরা যে ক্রমশ এগিয়ে আসছেন সে কথাও জানা যায় স্বর্ণকুমারীর লেখায়। কোমল বঙ্গদেশের নারী পুরুষের গৌরব আসলে বুদ্ধির দীপ্তিতে সেকথাও বলতে ভোলেননি তিনি বার বার।

স্বর্ণকুমারীর লেখায় এবং ভাবনায় বাঙালির এবং বাংলা ভাষার ইতিহাসভাবনাও উঠে এসেছে। মারাঠি সাহিত্যের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্যের তুলনা করে স্বর্ণকুমারী বিদ্যাপতি চন্ডীদাস পর্যন্ত সাহিত্যের এবং ইতিহাসের সীমা টেনেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই তাঁর চমৎকার আবিষ্কার নিয়ে আসবেন আরো এক দশক পরে।[১৬] ফলে সেসময় বাঙালির ইতিহাসের পরিসর যে অনেকটাই সঙ্কীর্ণ ছিল সেটা এই একুশ শতকে বসে ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়! তবে বাঙালির ইতিহাসচেতনা এবং সংরক্ষণ বোধ আজো প্রশ্নের মুখেই দাঁড়িয়ে।

... বাঙ্গালী নূতন জাতি, বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখিবার কিছু ছিল না, তাই ইতিহাস নাই। কীর্তি থাকিলেই তবে তো তাহা কীর্তিত হইবে? তাই ভারতের অন্যান্য সকল জাতির নাম ও মান তাহাদের পুরাতন গৌরবে—বাঙ্গালীর নাম বর্তমানে ও মানের আশা ভবিষ্যতে।[পৃ. ১৫৭]

স্বর্ণকুমারীর এই মন্তব্য ইতিহাস বিষয়ে একেবারেই সুপ্রযোজ্য নয়, কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি যে আশার আস্থা তিনি রেখেছিলেন, দেড়শো বছর পরে বর্তমান সময়ের বাঙালি সমাজ তা অনবধানে চুরমার করে দিতে কিছুমাত্র কসুর করেনি।

সোলাপুর সমাজে স্ত্রীলোকের পর্দা প্রথা অদ্ভুত। তারা এমনিতে খুব ঘোমটার ঘনঘটায় থাকে না কিন্তু লেখাপড়া বা সামাজিকতায় একদম অজ্ঞ। একটা কথা বললে এবং অনেকবার করে বললে তবে আধো আধো উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু রাজপরিবারভুক্ত নারীরা ভীষণ রকম পর্দাপ্রথা মেনে চলেন। বরোদার রাজা নীলগিরি যাবার পথে সোলাপুরে অবস্থানকালে স্বর্ণকুমারীদের সঙ্গে পরিচিতি এবং ভাবের আদানপ্রদান হয়। রাজার সম্পর্কে এবং তাঁর ভাবনা নীতি ও তৎপরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি উচ্চবংশীয়দের সাধারণ মানুষের প্রতি আচার ব্যবহারের একটা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন স্বর্ণকুমারী। সোলাপুরে মুহূর্মুহূ অভিনন্দন সভার বন্যায় বরোদারাজ ক্লান্ত হয়েও মধুর হাসি হেসে দেশীয় মানুষদের সঙ্গে মোলাকাত করছেন দেখে স্বর্ণকুমারী লেখেন,

রাজার কথাবার্তা লোকের সহিত আচার ব্যবহারও অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। তিনি দুইবার বিলাতগমন করেন, সুতরাং তাঁহাতে ইংরেজি ভদ্রতা ও হিন্দু বিনয় একত্র মিশ্রিত। আমাদের সহিত তাঁহার প্রধানত বঙ্গদেশের আধুনিক অবস্থা লইয়াই কথাবার্তা হইল। কথায় কথায় আমি বলিলাম ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষিত না হইলেও শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই এখন প্রকৃত অর্থে ব্রাহ্ম, কেননা তাঁহারা মনে মনে সকলেই প্রায় এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। রাজা বলিলেন, ‘‘কিন্তু মনের বিশ্বাস বাহিরের কার্যের সঙ্গে এক হওয়া চাই, তবেই তো তাহার সুদৃষ্টান্তে সুফল হইবে।’’ তাঁহারই উপযুক্ত কথা! ...রাজ্যশাসনে তাঁহার উদার মত প্রকাশিত হয়। বরোদা রাজ্য অতি সুশাসিত; প্রজাগণের সুখ স্বচ্ছন্দতা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের দিকে রাজার বিশেষ লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে ইনি আদর্শ রাজা বলিলেও হয়।[পৃ. ১৫৯]

এবং উচ্চবংশের বাঙালিদের সম্পর্কে (এর মধ্যে বিলাতি চালে চলা রাজপরিবারও আছেন হয়তো) লিখছেন,

আজকাল ভারতবর্ষের অনেক রাজা ইংরেজি শিক্ষার গুণে ইংরেজের প্রকৃত রাজগুণ লাভ না করিয়া কেবল ক্রীড়া, কৌতুক, শিকারেই কালাতিবাহিত করেন। কিন্তু বরোদারাজ আমোদে উন্মত্ত হইয়া আপনার কর্তব্য ভোলেন নাই; ইংরেজ সম্মিলনে ইঁহার দেশানুরাগ প্রজাপ্রিয়তা হ্রাস হয় নাই। আমি তো মনে করিতে পারিনা বঙ্গদেশের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্ররাজা দেশের সামান্য লোকের আহ্বানে এরূপ প্রফুল্ল-ভাবে এরূপ বিনয় সহকারে তাহাদের মধ্যে আসিয়া তাহাদের সম্মানিত করিয়া নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান করিবেন। তাঁহার দেশের লোকের সহিত কতটুকু সম্বন্ধ। ইংরাজের সহিতই তাঁহার আচার ব্যবহার, ইংরাজ লইয়াই তাঁহার কাজ কারবার, ইংরাজকে আমোদ দান করাই যেন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। বিলাত যাইয়া আর ইংরাজের সহিত মিশিয়া তাঁহার এই হইয়াছে, যে তিনি দেশীয় লোককে অবজ্ঞা করেন আর সর্বতোভাবে ইংরেজ হইতে চাহেন; আর বরোদারাজ বিলাত যাইয়া দেশীয় লোককে বিশেষ আপনার বলিয়া মনে করেন।[পৃ. ১৫৯]

এই লেখার দেড়শ' বছর পরে অধুনা দক্ষিণভারতপ্রবাসী এই গবেষক এটুকুই বলতে পারেন এই তীব্র চপেটাঘাত সাহেবী ভাবাপন্ন বাঙালির জন্য যথার্থ। এর প্রয়োজন ছিল এবং এ যুগে প্রয়োজন আরো বেশি হয়ে পড়েছে। নিজের জাতি নিজের সমাজ নিজের ভাষার জন্য লজ্জিত কুণ্ঠিত বাঙালির মেরুদন্ডের জোর চিন্তার জোর সমস্তই হারিয়েছে। তবে এই দুর্লক্ষণ আজকের নয়, স্বর্ণকুমারীর সময়েও বহুল প্রচারিত ছিল। স্বর্ণকুমারী লিখছেন,

সে-দিন রাজসভায় গিয়া যে কী আনন্দলাভ করিয়াছিলাম বলিতে পারিনা, চারিদিকে আনন্দপ্রফুল্ল মুখ, তাহাদের সেই আনন্দে রাজা পরিতৃপ্ত চরিতার্থ; রাজভক্তি ও দেশীয় বৎসলতার আদান-প্রদানে চারিদিক উথলিত। রাজদর্শনের যে সুখ সেইদিন যথার্থ অনুভব করিলাম।... রাজাকে দেখিয়া মহারাষ্ট্রী জাতির উপর শতগুণ শ্রদ্ধা বাড়িল। বাঙ্গালী উন্নতিশীল সত্য; কিন্তু তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তার নিজের ভার অতি অল্প; কিন্তু মহারাষ্ট্রী আপন ভারে তরঙ্গ পরিচালনা করিতে পারে।। [পৃ. ১৫৮]

এবারে প্রসন্নময়ী দেবীর (১৮৫৭-১৯৩৯) লেখা 'আর্য্যাবর্ত্ত' [১৭] । ১৮৮৮ সালের ভ্রমণকাহিনী। স্বর্ণকুমারী দেবীর সমসাময়িক এই সাহিত্যিকের বোঝার মন, দেখার চোখ এবং শোনার কান বেশ সজাগ ছিল। বলার কথাগুলিও বেশ তেজস্বী এবং সূক্ষ্ম শ্লেষাক্ত। ইনিও উত্তরভারতের কানপুর, প্রয়াগ, আগ্রা, মথুরা বৃন্দাবন ইত্যাদি দর্শন করেছেন; বিহারের ভাগলপুর, মুঙ্গের, আরা ঘুরেছেন। মূলত শরীর সারানোর উদ্দেশ্যে। তখন অসুস্থ বাঙালি এসব জায়গায় চেঞ্জে যেতেন। এটা একটা বহু পুরনো ট্রাডিশন বাঙালি সমাজের যা বিশ শতকে এবং স্বাধীনতার পর ক্রমশ নিয়মে পরিণত হয়েছিল।

ভ্রমণের প্রথমেই প্রসন্নময়ী দেবী বেশ ক'টি জরুরি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। মেয়েদের ভ্রমণ এবং তার বিশিষ্টতা ও সমস্যা নিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছেন। সেটা আমাদের কাজের জন্য খুব জরুরি। তাই ভ্রমণের আগে উনিশ শতকের এক চিন্তক নারীর ভাবনা দেখে নিতে চাইব। প্রসন্নময়ী লিখছেন,

অন্তঃপুররুদ্ধা বঙ্গনারী তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কখন কখন দেশভ্রমণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশ ভ্রমণকালে যে সকল দৃশ্য তাঁহাদের নয়নগোচর হয় ... মনে যে চিন্তা প্রবাহ বহিতে থাকে ... পথিমধ্যে নারীকে যে সকল অপ্রত্যাশিত ঘটনার হস্তে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়, তাহার বর্ণনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ... সংসারে বর্ণনা করিবার কিম্বা দেখিবার শক্তি সকলের সমান নহে। একজন সমুদায় পৃথিবী ঘুরিয়াও কেবল মৃত্তিকা ও ইষ্টক ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইল না, আর একজন একটী মাত্র নগরে দেশে বা গ্রামে,মানবজাতির আচার ব্যবহার, সমাজের গূঢ়তত্ত্ব, রোগের উৎপত্তি, সভ্যতার বিকাশ, বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে কত কী দেখিতে পাইলেন। যাহার যে পরিমাণ জ্ঞান আছে তাহার সেই পরিমাণে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ... কিন্তু

পুরুষের পক্ষে যাহা যেরূপ দেখায় নারীর নেত্রে তাহা ঠিক সেইরূপ না দেখিতে পারে। সেইজন্য বঙ্গনারীর চক্ষে ও হৃদয়ে এই ইতিহাসময় আর্য্যাবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থান কি রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহা কেহ কেহ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। [পৃ.৫৩, পথের কথা]

মেল গেজ তত্ত্বের ধারণা সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য থেকে লাভ করলেও দেখি তার অনেককাল আগেই আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের ভাবনার নিজস্বতা দিয়ে নারীদৃষ্টি বা ফিমেল গেজ এর ধারণা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। অথচ তাঁদের লেখা বা ভাবনা থেকে তত্ত্বচিন্তা গড়ে তোলার কথা আমরা কখনোই ভেবে দেখিনি।

প্রসন্নময়ী তাঁর ভ্রমণকে ইতিহাসের বিন্দুতে বিন্দুতে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু এই ঐতিহাসিক স্থানগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান থাকলেও তিনি তীর্থদর্শনের বদলে ইতিহাস এবং জনজীবন দর্শন করেছেন। যেমন মথুরা বৃন্দাবনে। বাঙালি পাণ্ডার ঠিকুজি কুলুজি জেনে এবং বাঙালি বৈষ্ণব বিধবাদের দেখে নিজের মনের ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। মেয়েরা চিরকাল শাস্ত্রমতে পিতা, স্বামী এবং পুত্রের অধীন থাকবেন, এই ভাবনা ত্যাগ করেছেন প্রসন্নময়ী। এই মানসিক প্রাগ্রসরতা তাঁকে অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির আধার করে তুলেছে। তাঁর লেখায় প্রবাসী বাঙালি প্রসঙ্গে বাঙালি পুরুষের স্বভাব ও নারীর কথাও এসেছে। কিন্তু তীর্থরজের ভাবনা তাঁকে একেবারেই স্পর্শ করেনি। তাই তাঁর এই ভ্রমণকে আমরা তীর্থদর্শন পর্বের অন্তর্ভুক্ত করতে পারছি না। তীর্থিকাদের বিষয়ে এই লেখার অবতারণিকায় লিখছেন,

অবরোধবাসিনী হিন্দু মহিলা দিগের পক্ষে দেশভ্রমণ কত যে অসম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। হিন্দু-ধর্ম্মে অচল বিশ্বাসে, পূর্ব্বেও শত শত মহিলা তীর্থ দর্শনে যাইতেন এবং এখনোও গিয়া থাকেন; তথাপি ইহা হিন্দু রমণীর পক্ষে যে তত সহজসাধ্য নহে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? [পৃ. ৫৩, পথের কথা]

তবে আমরা অন্যান্য লেখা থেকে দেখছি হিন্দু ব্রাহ্ম বা মুসলমান সব বঙ্গরমণী এভাবেই ভাবতেন। ব্রাহ্মিকারা অবশ্য সামান্য বেশি সুযোগ পেয়েছেন, গোঁড়া হিন্দুরমণীরা অনেক কম সুযোগ এবং অনেক বেশি যন্ত্রণা সয়েছেন। আর মুসলিম মেয়েদের উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ কথা আমরা খুব কম পেয়েছি এই কাজ করার সময়। বিশ শতকের নারী সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন (১৯০৯-১৯৮১)-এর স্মৃতিকথায় বাড়ি থেকে কোনোভাবেই না বেরোতে পারার যন্ত্রনাক্লিষ্ট ছবি পাই। এক ও একমাত্র বেগম রোকেয়া বিশ শতকের প্রথম দশকেই কার্সিয়াং দার্জিলিং ভ্রমণে যেতে পেরেছিলেন হিমালয়-প্রমাণ বাধা পায়ে ঠেলে মাত্র

কয়েকদিনের জন্য তবে তা নিয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রসন্নময়ী মূলত উত্তরভারতের প্রবাসী বাঙালিদের কথা বলেছেন। হিন্দু-মুসলিম ভেদ তাঁর আছে (যদিও অসূয়া আছে কিনা ততটা বোঝা যায় না যতটা অসূয়া বোঝা যায় পুরুষ জাতির প্রতি) এটোয়াতে ট্রেন থামলে বাঙালির দেখা পাননি, কিন্তু স্থানীয় মানুষের মুখে বুদ্ধির দীপ্তির অভাব দেখে স্বজাতির বুদ্ধিবৃত্তির কথা মনে করেছেন। আবার ‘হিন্দুস্তানী’ রমণীদের অলঙ্কার দেখে বঙ্গরমণীর অলংকারের সুক্ষ্ম রুচির প্রশংসা করেছেন । স্বর্ণকুমারীর মতো ইনিও মেয়েদের অবরোধ প্রথা এবং স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। প্রসন্নময়ী দেখছেন এবং লিখছেন উত্তরভারতে অবরোধ প্রথা খুব ভয়ানক। তবে একটা নতুন জিনিস দেখলেন, কোনো বিয়েবাড়ি যেতে যেতে মেয়ের দল বলদ-গাড়ির ত্রিস্তরীয় নিশ্বাস বন্ধ করা ঘেরাটোপ থেকে যেন সারা পথে গান ছড়িয়ে দিয়ে গেল। যেন নিজেদের অস্তিত্বের কুচি কুচি কণা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল চকিতে। মনে

রাখতে হবে তওয়াইফ বা বাইজি প্রথার সূচনা মূলত উত্তর ভারতেই। সাধারণ পরিবারে গান গাওয়া খুব অন্যায় কাজ ছিল। তবে বিয়ের গান মেয়েরা গাইত। সেটা সব সমাজেই প্রচলিত ছিল। তা পার্বণ এবং ধর্মীয়তার সঙ্গে জড়িত ছিল বলেই সমাজ তাতে ছাড় দিয়েছিল। বিনোদনমূলক গান বাজনার রীতিই তখনো গড়ে ওঠেনি।

প্রসন্নময়ী আবার দেখেছেন নিচজাতিয়া স্ত্রীদের স্বাধীনতার অনুপাতটা বেশি। সামান্য পরিবারের স্ত্রী কন্যারা ঘোড়া চড়ে যাতায়াত করেন। যদিও প্রসন্নময়ীর তাতে হাসি পেয়েছে, মেয়েদের পোশাক ঠিক ঘোড়া চড়বার উপযুক্ত মনে হয়নি আর তাছাড়াও একগলা ঘোমটা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রাজপথে চলা অবরোধের অর্থও তিনি বোঝেননি। তাই বাঙালি মেয়েদের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন, "চারুহাসিনী ভগিনী পাঠিকে, সহিসরূপী পতিসঙ্গে এইরূপে অশ্বপৃষ্ঠে রাজপথে বিচরণ করিতে সখ যায় কি?" [পৃ.৫৭, তদেব]

মেয়েদের শিক্ষার আলো সেসময় কলকাতা ছেয়ে ফেলতে শুরু করলেও মেয়েরাই বুঝছিলেন এই আলো সমস্ত বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়া আশু প্রয়োজন। প্রসন্নময়ী পণ্ডিতা রমাবাইয়ের নাম সসম্ভ্রমে উল্লেখ করে জানিয়েছেন উত্তর এবং পূর্ব ভারত কতখানি পিছিয়ে আছে। গৃহে বা বিদ্যায়তনে মেয়েদের কোনোরকম শিক্ষার সুযোগই নেই উত্তরভারতের এই রীতি প্রসন্নময়ী প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। এমনকি বাঙালি পুরুষদের প্রতিও বলেছেন,

> হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে শিক্ষার চেষ্টাও প্রায় কোনখানে দেখি নাই। তাহাদিগের অন্তপুরবাসিনীগণ অজ্ঞানে ঘোর তমসাচ্ছন্ন। কি এই দেশে কি বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ ও চেষ্টা আবশ্যক। আমাদিগের দেশের পুরুষগণ নিজের অন্তঃপুরের মূর্খতা, কুসংস্কার এবং অন্ধকার দূর করিবার কোনো চেষ্টা না করিয়া বাহিরে "দেশীয় উন্নতি" "দেশীয় উন্নতি" বলিয়া যে চীৎকার করেন, তাহার জন্য অনেক সাহেব তাঁহাদিগকে ধিক্কার দেন, অনেকসময় দেশীয়গণকে এই ধিক্কারের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বোধ হয়। [পৃ. ৫৭, তদেব]

সমগ্র ভারতবর্ষের আরো একটি জ্বলন্ত সমস্যা বাল্যবিবাহ। এই বিষয়েও প্রসন্নময়ী লক্ষ্য করেছেন খুব খারাপ পরিস্থিতি। হাত পা বেঁধে ইচ্ছে করে শিশু দুটিকে বা কখনো একটিকে সাঁতার না জানা অবস্থায় জলে ফেলে দেওয়ার মতো। একটি অন্যায় সামাজিক চাপে ব্যক্তির নিষ্পেষণ। আমাদের দেশে কখনোই তার ফল শুভ হয়নি।

বাঙালি ব্রাহ্মণদের কোনো সম্মান সেইসময়েই অবশিষ্ট ছিল না দেখে প্রসন্নময়ী অবাক হয়েছিলেন। যুক্তি দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন। তার সঙ্গে পশ্চিমের বাঙালিদের পরিণতি তাঁকে বিরক্ত করে তুলেছিল। তবে এ সাধারণ বাঙালির কথা। প্রয়াগের বাবু নীলকমল মিত্রের মতো দেশহিত-ব্রতী বিশেষ বাঙালিকে স্বর্ণকুমারীর মতো প্রসন্নময়ীও প্রশংসায় কার্পণ্য করেননি। সাধারণ বাঙালি সমাজ সম্পর্কে প্রসন্নময়ী এটোয়া, মথুরা বৃন্দাবন ঘুরে দেখেছেন বিবিধ ভালোমন্দের আভাস। বাঙালি মানেই খ্রিষ্টান বা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা জাতিচ্যুত (এই ধারণা এখনো আছে)। আবার মথুরায় মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার সময় 'সাধু সাধু সাড়ে পাঁচ ভাই' বাঙালি পাণ্ডা পাচ্ছেন, যে পড়াশোনা ইত্যাদির ধারে পাশেও না গিয়ে পুরি তরকারী মণ্ডা মিঠাই আর যজমান নিয়েই দিন কাটায়। দেখছেন মথুরার বিধবা বাঙালি ভিখারিনীদের। তারা কাক-চিল বসতে দেয়না, মন্দির-গামী যাত্রীর শকটের কাছে পালে পালে শকুনের মতো ছেয়ে আসে (কি ভয়ানক উপমা; মহাস্থবীর জাতকেও এঁদের

অবিস্মরণীয় চরিত্র-চিত্রণ আছে) আর বৃন্দাবনে দেখা পেলেন প্রচুর নবদ্বীপিয় বৈষ্ণব নারী-পুরুষের। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যুগ-লাঞ্ছিত, ক্লেদ-কলুষিত বেহাল দশা তাঁকে বীতশ্রদ্ধ করেছে,

এইসকল তীর্থস্থানে অসংখ্য পতিত পাতকী আসিয়া বাস করিতেছে। তীর্থের পবিত্রতা তাঁহাদের সহবাসে যেন কমিয়া যায়। অধঃপতিত জাতিকে পরিত্রাণ করিতে মহাত্মা চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু সময়ে তাহাতে অশেষ অমঙ্গল আনিয়াছে। পুণ্যস্থানে মুক্তিলাভের ছলনায় কতপ্রকার ঘৃণিত কার্য্যে যে তাহারা জীবন কলঙ্কিত করিতেছে তাহা ভাবিলে হৃদয় ব্যথিত হইয়া যায়। [পৃ. ৭৪, তদেব]

অবৈষ্ণব সাধারণ প্রবাসী বাঙালির পড়াশোনা সবক্ষেত্রে বেশি না থাকলেও তাঁরা ব্যবসা করেন এবং তাতে উন্নতি করেন এবং কূপমণ্ডূকের মতো অর্জিত জ্ঞানকেই প্রজ্ঞার সীমা বলে মনে করেন একথা জানাচ্ছেন প্রসন্নময়ী। প্রবাসী সাধারণ চাকুরে বাঙালি বেশ দান ধ্যান করেন, সরলা দেবী যেমন মেজমামীমা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পর্কে জীবনের ঝরাপাতায় বলেছিলেন তাঁর কেবল নিজসন্তানদুটিগত প্রাণ, পশ্চিমে (আসলে উত্তরভারতে) বাঙালি মায়েদের তেমন চিত্র প্রসন্নময়ী দেখেননি সেভাবে। তবে নব্য-বঙ্গরমণীর নিন্দাবাদ তিনি কিছু শুনলেন বটে মথুরায়, তাঁরা ধারাপাত, চারুপাঠ পড়ে অলসবেলায় তাস খেলে বিনা ধর্মকর্মে দিন গুজরান করেন প্রবাসের সামান্য বাঙালি মানুষের এই ধারণা বটে!!

পশ্চিমের জমিদাররা আসলে ধনাঢ্য কেউ নন, যে কোনো পরিমাণে জমির মালিকই জমিদার এবং তাঁরা স্বহস্তে কৃষিকর্মে যোগ দেন এই দেখে প্রসন্নময়ীর ইংরেজ সমীপে চাকুরীরত বাঙালি পুরুষ এবং তার পরিবারের প্রতি বক্তব্য বেশ চাঁচাছোলা,

বাঙ্গালী পুরুষগণের কৃষিকার্য হল লেখনী এবং বিস্তৃত ক্ষেত্র শাদা কাগজ, এবং প্রতি বৎসরের ফসল প্রচুর অপমান। ভগিনী পাঠিকে, আমাদিগের স্বামী, পিতা বা ভাই যখন চাকুরী (দাসত্ব) করিয়া টাকা আনিয়া দেন, সে টাকা দিয়া আমরা গহনা ও শাড়ী কিনি আমরা কি মনে করি তাহা কত অপমানের টাকা? শ্বেতাঙ্গের কত পদাঘাত নিত্য সহ্য করিয়া সেই টাকা আনীত হইয়াছে? [পৃ.৫৮ তদেব]

এরপরের আরো কয়েকটি ছোট কিন্তু প্রয়োজনীয় এবং শক্তিশালী লেখায় এই মনোভাব দেখতে পাবো।

দুটি দক্ষিণ ভারতীয় ভ্রমণ। প্রথমটি ১৮৯৩ এ প্রকাশিত খুব ছোট্ট 'মহীশূরের পত্র'[১৮] কুমুদিনী খাস্তগীরের( জন্ম ১৮৬৫ ) লেখা। এর দ্বিতীয় ভাগ লিখবেন এমত কথা দিলেও সেই লেখাটির সন্ধান কোথাও পাওয়া যায়নি। মহীশূর ভ্রমণে যে বিষয় টি লেখকের খুব মনে দাগ কেটেছে তা হল তীব্র জাতিভেদ প্রথা এবং আহারের বৈষম্য। বাঙালিদের 'চিকেন' খাওয়ার অনেক আগে থেকে দক্ষিণভারতীয় জল-অচল জাত মুরগি ভক্ষণ করে থাকে। দেশভাগেরও কিছু পর পর্যন্ত বাঙালি এই বিষয়ে অনড় মনোভাবাপন্ন ছিল। তারপর ধীরে ধীরে মদ্য-মাংস সবই সর্বসাধারণ্যে জায়গা করে নিয়েছে। জ্ঞানদানন্দিনীর লেখায় খানার সঙ্গে পিনাও এসেছে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী এবং প্রসন্নময়ীর উত্তরভারত ভ্রমণে জানা গিয়েছে মদ্যপানের খুব চলন ছিল না ব্রাহ্মণ সমাজে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে। কুমুদিনী খাস্তগীরও লিখছেন দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে মাছ মাংস একেবারেই অপ্রচল এবং সুরারও চল ততখানি নেই। কিন্তু দার্জিলিং-এর হিন্দুরা ছোট ছোট পশুপাখী বলি দেন এবং প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে পুর্বদেশের মানুষ এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি দক্ষিণভারতীয়দের সন্দেহ আছে যথেষ্ট। এদেশেও বাল্যবিবাহ প্রচলিত। কিন্তু যথারীতি বঙ্গদেশের মতো নিয়মে নয়, বরং উত্তরের নিয়মেই দক্ষিণও চলে। অর্থাৎ শৈশবে বিবাহ হলেও কন্যা যৌবনে পদার্পণ না করা পর্যন্ত শ্বশুরঘরে যায়না। দক্ষিণ ভারতে জাতিভেদ প্রথা প্রবল ছিল (আজও আছে)।

এমনকি এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অন্য শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে বসে আহার গ্রহণ পর্যন্ত করেননা। বাংলাদেশে জাতিভেদ থাকলেও এতটা বাড়াবাড়ি ব্রাহ্মিকা কুমুদিনী লক্ষ্য করেননি।

১৮৯৫-এ মাদ্রাজ যাচ্ছেন শ্রী অবলা বসু (১৮৬৫-১৯৫১) জাহাজে। তাঁর লেখাটি, 'মান্দ্রাজ ভ্রমণ' [১৯] ('মুকুল', চৈত্র ১৩০২; ইং ১৮৯৬) শিশুদের উপযোগী করে লেখা হলেও মূল কথাগুলি আজও সকলের জন্যই প্রয়োজনীয়। কুমুদিনী খাস্তগীরও মাদ্রাজ গামী জাহাজে মাদ্রাজ নেমে সেখান থেকে মাইসোর গিয়েছিলেন রেলে। কুমুদিনী ও অবলা দুজনেই মাদ্রাজের বট্যানিকাল গার্ডেনকে শিবপুরের কোম্পানীর বাগানের সমতুল্য একেবারেই মনে করেননি। উপরন্তু অবলা লক্ষ্য করেছেন মাদ্রাজে বেশ কিছু ভালো মানের স্কুল কলেজ থাকলেও মূলত কলকাতায় তার সংখ্যা অনেক বেশি। আর যথারীতি লক্ষ্য করেছেন মেয়েদের জেনানাপ্রথা বিষয়ে,

বঙ্গদেশের ন্যায় স্ত্রীলোকদের অবরোধ প্রথা নাই; সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোকেরা বাহিরে যান না বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রীলোকদের আবশ্যক মতো বাহিরে যাইতে দেখিয়াছি। [পৃ. ৫১, অবলা বসুর ভ্রমণকথা]

এছাড়া মাদ্রাজের ভাষা প্রসঙ্গে কলকাতার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন, মাদ্রাজে সব শ্রেণির সব রকম মানুষই কিছু না কিছু ইংরেজি জানেন বোঝেন, কলকাতায় চূড়ান্ত শিক্ষিত না হলে সাধারণ বাঙালি সমাজে যার একান্ত অভাব। ফলে সাহেব বা অন্য বিদেশী মানুষদের কথা বার্তা চালানো মাদ্রাজে অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু কলকাতায় কঠিন। এর থেকে জনসাধারণের শিক্ষার একটা আলতো ছবি পাওয়া যায়।

এবার  আসব শ্রী শতদলবাসিনী বিশ্বাসের ( ১৮৮৩- ১৯১১) 'কামরূপের কথা' [২০] নিয়ে। এই লেখা প্রকাশিত হয় 'ভারত-মহিলা' পত্রিকায়, পৌষ ১৩১৪ অর্থাৎ ১৯০৭ এ। বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করলাম আমরা। এই লেখাটি ছোট এবং মূলত কামরূপের বর্ণনাই মুখ্য। সেই বর্ণনায় যুক্ত হয়েছে পুরাণ এবং প্রাচীণ প্রবাদের উল্লেখ। সামান্য এসেছে সমাজের কথা যেখানে অবধারিত ভাবে এসেছে বাঙালি সমাজের তুলনা। সাহেবিয়ানায় ক্রমাগতই এগিয়ে চলেছে বাঙালি সমাজ। পরেও এ নিয়ে বিশ্বকবির আক্ষেপ শোনা যাবে। স্বর্ণকুমারীর গলাতেও একই আক্ষেপ আরো গভীর ভাবে শুনেছি আমরা। শতদলবাসিনী কামরূপে মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণের যুক্তবেনীতে যেভাবে তিনি কামরূপের পরিচয় দিয়েছেন তাতে মনে করা যেতে পারে তিনি ব্রাহ্মিকা ছিলেন না। হিন্দু ছিলেন। পোষাক বিষয়ে উত্তরপূর্বের এই অঞ্চলের যে বিশেষত্ব ছিল লেখিকার কথায় তা অনেকটা নষ্ট করেছে বেহিসেবী পরানুকরণ। এ বিষয়ে বাঙালিদেরও অহমিয়ারা ক্রমে ছাড়িয়ে উঠছেন! মেয়েরা মূলত মেখলা চাদর পরলেও বাঙালি মেয়েদের মতো শাড়ি পরাও প্রবলভাবে শুরু করেছেন, যা এক বিড়ম্বনাবিশেষ মনে হয়েছে শতদলবাসিনীর। আসামের বয়নশিল্প বিখ্যাত। কিন্তু বিদেশী রকম পোষাকের মোহে নিজেদের বয়নশিল্প নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এখানেও শতদলবাসিনী লক্ষ্য করেছেন মেয়েদের শৈশবেই বাগদান হয়ে থাকে, কিন্তু বিবাহ দিতে ১৭-১৮ বছর পর্যন্ত অভিভাবকেরা অপেক্ষা করেন। বাংলাদেশেও এমন ধারা প্রচলনের কথা ভেবেছেন শতদলবাসিনী। জাতিভেদ প্রবল এবং এখানে গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হতেই

হয় মেয়েদের এমন একটা বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে তাঁর লেখায়। তবে সবচেয়ে যেটা প্রয়োজনীয় মনে হয় তা হল আসামে নারীশিক্ষার প্রসার শুরু হয়েছে, একজন শিক্ষয়িত্রীর কলমে এই ছবি বেশ স্বস্তিদায়ক।

এই শহুরে ভ্রমণের লম্বা ইতিকথা এইবার শেষ করব এক ছোট্ট মেয়ের চোখে দেখা দার্জিলিং দিয়ে। সেখানে যত না দার্জিলিং তার চেয়ে ঢের বেশি বাবা মা দাদা দিদি মাসিকে নিয়ে গড়ে ওঠা এক খাসবুনোট পরিবারের ছবি। এ ছবি ১৯০৮ এর। কিন্তু লেখা হয়েছে অনেক পরে স্মৃতিকথার পাতায় ১৯৫৮ সালে। পুণ্যলতা চক্রবর্তীর (১৮৯০-১৯৭৪) 'ছেলেবেলার দিনগুলি'[২১] ( প্রথম প্রকাশ ১৮৮০ শকাব্দ, নিউস্ক্রিপ্ট, কলকাতা থেকে ) বই থেকে আমরা বেছে নিয়েছি দার্জিলিং ভ্রমণের অমলিন মণিময় অংশটি।

এই পরিবার বাংলার বিখ্যাত পরিবার। বিভিন্ন দিকে দিকপাল নারী পুরুষ এই পরিবারের সদস্য। ঠাকুর বাড়ির পরেই আসে এই রায়চৌধুরী (ক্রমশ রায়বাড়ির কথা)পুণ্যলতার বাবা শ্রী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মা বিধুমুখী দেবী এবং দাদা সুকুমার রায় দিদি সুখলতা রাও । এই পরিবারের সাংস্কৃতিক অবদান বাঙালি জীবনে প্রাতঃস্মরণীয়। এহেন উজ্জ্বল প্রগতিশীল পরিবারে কিন্তু অনর্থক সাহেবিয়ানা একেবারে অপছন্দ ছিল বাড়ির কর্তাদের। যদিও সাহেবদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে অনেক বিষয়ে জয় অর্জন করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর নিজে, তাঁর দাদারা এবং সন্তান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সুকুমার রায়। এই ধারা পৌত্র সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল।

আবার ফিরি অতীতে। দার্জিলিং এ উপেন্দ্রকিশোরের শরীর সারানো উপলক্ষে ছুটি কাটাতে এসে ধরা পড়েছে এক পারিবারিক অমল আনন্দের ছবি। একটি ছোট মেয়ের অনুভূতি। সেখানে দার্জিলিং এর পাহাড়, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, কুয়াশা মোড়া সকালের দেশী-বিলিতি প্রাতরাশ, কাঞ্চঞ্জঙ্ঘা, ছোট্ট রেলগাড়ির লুপে লুপে চলার আনন্দ, ব্লুমফিল্ডের মাঠে বুড়ি ছুঁয়ে বাঙালি হইচই –এইসবের মধ্যেই ধরা পড়েছে দার্জিলিংয়ে এক আসল বেঁটে মোটা সায়েবের কুকুরের সঙ্গে এক বাঙালি সায়েবের কুকুরের ধুমধাম লড়াইয়ের ছবি| বুলডগের সঙ্গে বিপুলাকৃতি হাউণ্ডের প্রচন্ড লড়াই। এই আসল এবং নকল দুই সাহেবের মনোগত লড়াইয়ের ছবিও বেশ পাঠকের চোখে ধরা দেয়। দুঃখের বিষয় বাঙালি সাহেবের কুকুর লড়াইয়ের পর উত্থানশক্তি রহিত হওয়ায় বাঙালি সাহেবই হার স্বীকার করে নিলেন ইংরেজের কাছে! সামান্য হলেও দুঃখ ছুঁয়ে গেল পুণ্যলতাদের মনে। স্বর্ণকুমারীরা যে সময় দার্জিলিং এসেছিলেন তার পরের বছরেই। যে ঘুমবুড়িকে স্বর্ণকুমারী ডাইনির মতো ভেবেছিলেন, ভয় পেয়েছিলেন, যার নামই উইচ্ অব ঘুম দিয়েছিল ব্রিটিশরা, সেই ঘুমবুড়ির ফোকলা মুখের একগাল হাসি পুণ্যলতার মন কেড়ে নিয়েছিল। তার সঙ্গে সরু গলায় ডাক, "বা-বুউউ---পোইসা!"

পুণ্যলতার লেখা থেকে জানা যায় প্রায় সমবয়সী মাসি কেবলি চেষ্টা করেন তাঁদের সাহেবী এটিকেট শেখাতে। আর দাদা সুকুমার কেমন ক্যাবলামো করে ইচ্ছে করে তাঁর সব শিক্ষায় জল ঢেলে দেন। শেষে যেদিন খাওয়ার টেবিলে শুরু হল সাহেবী খানার পাঠ সেইদিন সুকুমার সমস্ত কাঁটা ছুরি চামচ নিড়বিড়ে হয়ে হাত থেকে ফেলে বিষম খেয়ে বড় বড় চোখ মেলে মুখব্যদান করে বোকার মত চেয়ে রইলেন ফ্যালফ্যালিয়ে সব্বার দিকে! মাসিটি তো রাগে ভয়ে বিরক্তিতে একশা। আর কক্ষনো এমন বিজাতীয় শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। বোঝা সম্ভব ক্রমশ বাঙালি মানসে বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণা

তীব্র হচ্ছে এ সময়। ক্রমশ পরিবারগুলি সাহেবিয়ানা বজায় রেখেও অন্যায় শোষণ আর শাসন সম্পর্কে এমনকি শিশুদেরও অবহিত করে তুলছে।

তারপর বিধুমুখী দেবীর হল হিল ডায়েরিয়া। উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধু বাঙালি ডাক্তার একমাসের জন্য পথ্য দিলেন 'কাঁচকলা-ভাতে-ভাত'। তারপর বাঙালি গৃহিনী সুস্থ হয়ে উঠে ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন অসামান্য স্বাদের শুক্তো ভাজা ঝাল চড়চড়ি কালিয়া কোপ্তা পোলাও কোর্মা পায়েস চাটনি ঘরে তৈরি মিষ্টি -- সবই কাঁচকলার! হারিয়ে গিয়েছেন এই অচাকুরিজীবী বাঙালি গিন্নিরা যাঁরা সুচীশিল্পে, শিক্ষায়, উপাসনায়, রন্ধনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অদ্বীতিয়া।

এমন মধুর প্রতিশোধের উজ্জ্বল ছবি দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েত হল এই শহর ভ্রমণ পর্বের।।

তথ্যসূত্রঃ

১. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, আমার জীবনকথা, পুরাতনী, অনুলিখন ও সম্পাঃ ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০০৯

২. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার' প্রবন্ধ, 'প্রদীপ' সচিত্র মাসিক পত্রিকা, সম্পাঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় , ভাদ্র ১৩০৬ , পৃ. ৩১৪-৩১৬

৩. শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র), ১৯১৫, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, [পৃ.৬৮]

৪. প্রফুল্লময়ী দেবী, 'আমাদের কথা', ''স্মৃতিকথা'', ৪র্থ সংস্করণ, বৈতানিক প্রকাশনী, কলকাতা , পৃ. ২০-৪২

৫. মিস মারি কার্পেন্টার (১৮০৭-১৮৭৭) বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, এদেশের মেয়েদের স্কুলের জন্য বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বহুতর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশেষ স্নেহ করতেন। ধর্মযাজক লেন্ট কার্পেন্টারের কন্যা। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে বিলেতে মিলিত হন এবং ভারতবর্ষের প্রতি অনুরাগ বহন করে ভারতে আসেন। দুই খন্ডে তাঁর ভারতভ্রমণ অভিজ্ঞতা, 'Six months in India' ফেলে আসা সময়ের জরুরি দলিল।

৬. অনামা ভগিনীদ্বয়, 'আমাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত', ভাদ্র-ফাল্গুন ১২৭৯, ইং. ১৮৭২, বামাবোধিনী পত্রিকা, সম্পাঃ উমেশ চন্দ্র দত্ত , কলকাতা

৭. হেজিমনি, ইতালিয়ান মার্ক্সিস্ট চিন্তাবিদ এবং রাজনীতিবিদ আন্তোনিও গ্রামশি কর্তৃক সংজ্ঞায়িত তত্ত্ব। এক পক্ষের উপর অন্য পক্ষের সার্বিক কর্তৃত্বের প্রকাশ। যা অপর পক্ষের মানসিক ক্ষমতা এবং বুদ্ধিকে পঙ্গু করে দেয়। এবং অপর পক্ষ ও

ক্রমশ অত্যাচারে সামিল হয়। যেমন বাংলার ক্ষেত্রে নারীরাই প্রবল পুরুষতন্ত্রের চাপ সহ্য করে নারীদেরই সেই চাপ যুগে যুগে সহ্য করাবার পদ্ধতিগত যন্ত্রে পরিণত হয়ে উঠেছেন। হেজিমনি শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দ 'হেজিমনিয়া' থেকে।

৮. স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রয়াগযাত্রা, 'ভারতী ও বালক', বৈশাখ-শ্রাবণ ১২৯৩, ''পথের কথা'' শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ, অভিজিৎ সেন , উজ্জ্বল রায় (সম্পা), প্রথম প্রকাশ- অগাস্ট ১৯৯৯, স্ত্রী, কলকাতা-২৬

৯. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'দারজিলিং পত্র', ভারতী পত্রিকায় বৈশাখ-ভাদ্র, এবং কার্তিক ১২৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত, ''স্বর্ণকুমারী দেবীর ভ্রমণকথা'', সম্পাঃ প্রত্যুষকুমার রীত, প্রথম প্রকাশ –জানুয়ারি ২০১২, পুনশ্চ, কলকাতা

১০. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'পত্র', ভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১৫, আশ্বিন-মাঘ ১২৯৮ এবং জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, অগ্রহায়ণ ১২৯৯ এ প্রকাশিত, তদেব

১১. শম্ভুনাথ পন্ডিত ছিলেন কাশ্মীর থেকে আগত কিন্তু শিক্ষিত হয়েছিলেন কলকাতায়। ১৮৬৩-১৮৬৭ এই ৪ বছর তিনি প্রধান বিচারপতির কর্তব্য পালন করেন। তিনিই প্রথম দেশীয় বিচারপতি। হরিশ্চন্দ্র মুখপাধ্যায় সম্পাদিত হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজের আইনগত নিবন্ধাবলীর তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন।

১২. চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) অভিযোজন তত্ত্বে (Derwinian Evolution Theory) তে বলা হয় যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কথা ( Survival of the fittest ) , On the Origin of Species বইয়ে (১৮৫৯)। ঠিক একই সময়ে বাংলার নারীমুক্তির ডাক এসেছে, এবং বাঙালিনীরা যে জীবনযুদ্ধে জয়ী এবং যোগ্যতমা তার পরিচয় বেশ তাড়াতাড়িই দিয়েছেন তাঁরা।

১৩. অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯১২) একজন ব্রিটিশ রাজপুরুষ, যিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বটে। তিনি মনে করেছিলেন লর্ড লিটনের শাসনকালের পরে ভারতীয় জনজীবনে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল, তা ভারতবাসী এবং ব্রিটিশ রাজ দুপক্ষের জন্যই ক্ষতিকারক। সেই ভাবনা থেকেই ১৮৮৫তে ভারতবাসীদের প্রতিনিধি স্বরূপ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস দলের সূচনা করেন তিনি। তাছাড়াও তিনি একজন প্রাণীবিদ ও পক্ষীবিশারদ। ১৮৯৪ সালে তিনি ইংলন্ডে ফিরে যান।

১৪. পন্ডিতা রমাবাই মহারাষ্ট্রের এক আলোকশিখার নাম। তিনি নিজে স্বচেষ্টায় উচ্চশিক্ষিত হয়েছিলেন, আমেরিকা গিয়েছিলেন । দেশে ফিরে এসে তিনি দেশের মেয়েদের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ শুরু করেন। নিন্দিত এবং প্রশংসিত দুইই হয়েছিলেন সমকালের কাছে, কিন্তু হাল ছাড়েননি। তিনি প্রথম নারী যাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিষয়ক জ্ঞানের পরীক্ষার পর পন্ডিতা এবং সরস্বতী উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

১৫। ১৮৮৯ সালের ১১ মার্চ পন্ডিতা রমাবাই অধুনা মুম্বইয়ের চৌপট্টি এলাকায় একটি নারী উদ্ধারাশ্রম এবং শিক্ষাকেন্দ্র শুরু করেন। সেটিই শারদা সদন। নানা ভাবে এখানে মেয়েদের জীবনে উন্নত শিক্ষার বীজ বুনে দেওয়া হত।

১৬. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতির আবিষ্কর্তা (১৯০৭)। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালি সমাজের ইতিহাসের সুচনাবিন্দু টি প্রায় হাজার বছর আগে বলে স্থিরীকৃত হয়। যা স্বর্ণকুমারীর লেখার সময় সকলেরই অজ্ঞাত ছিল। তাই স্বর্ণকুমারী বাংলা ও বাঙালিকে নেহাতই অর্বাচীন জাতি বলে উল্লেখ করেছিলেন তাঁর প্রবন্ধে।

১৭. প্রসন্নময়ী দেবী, আর্য্যাবর্ত্ত (জনৈক বঙ্গ-মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত) , পথের কথা শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ , সম্পাদনা. অভিজিৎ সেন, উজ্জ্বল রায়, প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ১৯৯৯, স্ত্রী, কলকাতা-২৬

১৮. কুমুদিনী খাস্তগীর, বি.এ., মহীশূরের পত্র, সাথী, আশ্বিন ১৩০০, নিউজলেটার, স্কুল অব উইমেন স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড ২৬, নভেম্বর ২০১০, কলকাতা

১৯. অবলা বসুর ভ্রমণকথা , সংকলন ও সম্পাদনা দময়ন্তী দাশগুপ্ত, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, পৌষ ১৪২১, পরশপাথর, কলকাতা-৭৩

২০. শ্রী শতদলবাসিনী বিশ্বাস, কামরূপের কথা, ভারত-মহিলা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১৪ (ইং. ১৯০৭) ,নিউজলেটার, খন্ড ২৬, নভেম্বর ২০১০, স্কুল অব উইমেন স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

২১. পুণ্যলতা চক্রবর্তী, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

[ ৩ ]

## মুসলিম মেয়ের ভ্রমণ

'অবরোধবাসিনী' -- এই শব্দটিই জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয় নারীর কলঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল একসময়। হিন্দু মেয়েরা পুরুষের সহায়তায় এবং প্রচন্ড ব্যক্তিগত সংগ্রামে সেই রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছেন। পথ অমসৃণ হলেও ব্রাহ্মিকাদের সংগ্রাম কিছু কম করতে হয়েছে। যদিও সাধারণ হিন্দু সমাজেই শাড়ির সঙ্গে জামা-জুতো পরা মেয়ে দেখলে ভ্রূ আপনিই কুঁচকে উঠত এক সময়। তবে মুসলিম মেয়েরা যেন স্রোতের উল্টোদিকে চলেছেন যুগে যুগে। তাঁদের জন্য কোনো উদারমনা শিক্ষিত পুরুষ প্রায় এগিয়েই আসেননি বলা চলে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর শাসন ক্ষমতা হারিয়ে সাধারণ ভাবে মুসলিম সমাজের অবস্থান ক্রমশই যথেষ্ট প্রান্তিক হয়ে পড়ে। তাঁদের মানসিকতাও অন্ধকারের পর্দায় ঢাকা পড়ে যায়। সদর্থক শিক্ষা মুসলিম সমাজের পুরুষের মধ্যেই খুব কম প্রচলিত ছিল; তাই সেই সমাজের নারীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাঁরা আরও বেশি করে পর্দাপ্রথার অন্ধকারে নিমগ্ন হয়েছেন কালের অতল বিস্মৃতির মতো। তাঁদের স্থান ছিল পর্দা ঘেরা সংসারের এক কোণায়, আর শুধু পুরুষকেই নয় নারীর সামনেও পর্দা করার নির্দেশ তাঁদের মানতে হত। এমনকি এই একুশ শতকেও পথে ঘাটে সর্বত্র তাঁদের দেখা মেলে দমবন্ধ করা পর্দা নিয়ে। যেন মূর্তিমতী পর্দার ঘেরাটোপ হেঁটে চলেছে। আগে তাঁরা বাড়ির বাইরে যেতে পারতেন না বা পারতেন খুব কম। কিন্তু এখন ক্রমশ তাঁরা বেরোচ্ছেন এবং দুঃখের বিষয় পর্দা মেনে নিয়েই সাধারণ মেয়েরা বাইরে সব রকম কাজে অংশগ্রহণ করছেন। ধর্মীয় ভাবাবেগের আতিশয্যে পর্দা ত্যাগ করার কথা তাঁরা ভাবতেও পারেন না। যাঁরা পারেন তাঁদের বেশিরভাগই প্রবল সমালোচিত হন এবং ধর্মপতি এবং সমাজপতির যৌথ ষড়যন্ত্রে রাষ্ট্রীয় নির্বাসন পর্যন্ত তাঁদের উপর নেমে আসে, মাথার দাম ধার্য করা হয়, আশ্রয়ের জন্য দেশ থেকে দেশে ছুটে বেড়াতে হয় ---এসব আমরা আমাদের জীবৎকালেই দেখেছি।

মুসলিম মেয়েদের পড়াশোনার ইতিহাস বহু যুগ ধরে স্বাভাবিকভাবেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। পড়ার অধিকার তাঁদের ছিল না। তার মধ্যেও কেউ কেউ প্রবল আয়াস সহ্য করে নিজেকে শিক্ষিত করে আলো ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। হিন্দু বাঙালি সমাজে রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগরের ভূমিকা যেমন ছিল, মুসলমান সমাজে এক ও একমাত্র বেগম রোকেয়ার ভূমিকা তেমন ছিল মেয়েদের স্বার্থে। কিন্তু তাঁর এই একাকিনী পথ চলাও কন্টকাকীর্ণ ছিল স্বাভাবিকভাবেই। ভ্রমণকাহিনী বিষয়ে আলোচনার জন্য বহু চেষ্টা করেও মাত্র একটি ভ্রমণকাহিনী আমরা নিতে পেরেছি আমাদের কাজের লক্ষ্যে। আবারো সেই বেগম রোকেয়াই আমাদের উদ্ধারকারিণী। আসলেই ভাবলে বোঝা সম্ভব উনিশ শতকে অন্তত মুসলিম মেয়ের ভ্রমণকথা একটি অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়; যাঁরা বাড়ির বাইরে বেরোতে পারতেন না তাঁদের পক্ষে ভ্রমণ এক কল্পনার মাধ্যম ছাড়া আর কিছু ছিল না। ক্রমশ বিশ শতকের পরার্ধে, বিশেষত স্বাধীনতার পর যুগ বদলে গেলেও খুব বেশি মুসলিম মেয়ের লেখা ভ্রমণ কাহিনী এখনো পাওয়া সম্ভব হয়না।

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)। এক কিংবদন্তী মহীয়সী। বাংলাদেশের পায়রাবন্দের জমিদার কন্যা। ভূস্বামীর বিত্তবান ঘরে জন্ম হলেও তাঁর জন্যও শিক্ষার আলো বরাদ্দ ছিল না। অথচ তাঁর দাদারা কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করেছেন পিতার পৃষ্ঠপোষকতায়। তাঁদের বাড়িতে বাংলায় নয় খাঁটি উর্দূতে কথা বার্তা বলার চল ছিল। বেগম রোকেয়ার দিদি কবি করিমুন্নেসা রোকেয়াকে বাংলা শিখিয়েছিলেন বহু বিঘ্ন অতিক্রম করে। ছোড়দা ইব্রাহিম সাবের নিজের পড়াশোনা বোন রোকেয়াকে শেখাতেন বাবার চোখের আড়ালে রাত জেগে কুপির আলোয়। ব্যক্তিজীবনে বহু বাধা সহ্য করে পড়াশোনার জগতে স্থান করে নিয়েছেন রোকেয়া। তাঁর পড়াশোনার সাধ অদ্ভুতভাবে পূর্ণ করেছিলেন

ভাগলপুরের নবাব সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন (১৮৬০-১৯০৯), রোকেয়ার স্বামী। রোকেয়ার ষোল বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় তাঁর চেয়ে কুড়ি বছরের বড় সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। সাখাওয়াত হোসেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতোই স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সাখাওয়াত হোসেনের জীবৎকাল আর বেগম রোকেয়ার দাম্পত্য দুইই ছিল অত্যন্ত স্বল্পায়ু। ফলে রোকেয়াকে একা একা পাড়ি দিতে হয়েছে দুস্তর পথ। কখনও পথ তরবারি হয়েছে কখনও বা পারাবার।

বেগম রোকেয়া বহু সাধনায় মেয়েদের জন্য বিখ্যাততম স্কুল গড়েছেন সাখাওয়াত স্মৃতি বা সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়**।** তিনি চেয়েছিলেন মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের মাঠের একপ্রান্তে, পায়ে এবং মস্তিষ্কে বেড়িহীন, সর্বার্থেই আলোকপ্রাপ্ত, শিক্ষিত মেয়েদের আনন্দময় কোলাহলের পাশে শুয়ে থাকতে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছের কোনো মর্যাদাই দেওয়া হয়নি তাঁর মৃত্যুর পর। ঠিক যেমন বেঁচে থাকতেই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল অযোগ্যের অন্যায় আস্ফালন, প্রতি পদক্ষেপে। স্বাভাবিভাবেই অনুমান করা যায় মুসলিম সমাজে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ কত কম এবং কত বেশি কিছুই সমাজ নিষিদ্ধ করে মেয়েদের জন্য। এই হারানোর খতিয়ান বেশ গভীর; ক্ষতও প্রগাঢ়।

এহেন লড়াকু মানুষটি একবার বেড়াতে গিয়ে ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। হিমালয়ের কোলে দার্জিলিং-কার্শিয়ং। ছোট্ট ভ্রমণ। এর আগে তিনি সমুদ্র দেখেছেন কিন্তু কোনো ভ্রমণকাহিনী লেখেননি। রবীন্দ্রনাথের ‘স্ত্রীর পত্র’[১] ছোটগল্পের ধনী গৃহের অবরোধবাসিনী স্ত্রী মৃণালের বড় সাধ ছিল সমুদ্র দর্শনের। তেমনি রোকেয়ারও সমুদ্র আর পাহাড় দুইই দর্শনের সাধ ছিল**।** তাঁর স্বামী নবাব সাখাওয়াত হুসেন কিন্তু বেগম রোকেয়ার অনন্ত ইচ্ছাপূর্ণ চোখে স্বপ্ন দেখার সাহস আর আশার আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীহীনা বিধবার জীবনে সব সমাজের সমাজপতিরাই ছড়ি ঘুরিয়েছেন অনায়াসে। বেগম রোকেয়াও তা অতিক্রম করতে পারেননি।

রোকেয়ার এক ও একমাত্র ভ্রমণকাহিনীর নাম ‘কূপমন্ডূকের হিমালয় দর্শন’[২]**।** নাম থেকেই বোঝা যায় কূপের ভিতর মন্ডূককে আটকে রাখার কিরকম জবরদস্ত প্রয়াসে জয়ী হয়ে থাকে সমাজ অহরহ। এই ভ্রমণকথায় আসার আগে স্বর্ণকুমারীর লেখায় যেমন অবরোধের বর্ণনা হিন্দু পরিবারে পেয়েছি, তেমনি বেগম রোকেয়ার লেখায় মুসলিম সমাজের মেয়েদের অবরোধ এবং তার কিছু দুর্ভাগ্যময় ফলশ্রুতি দেখে নেব। বেগম রোকেয়া বলছেন,

আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি; উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি। [ভূমিকা, অবরোধবাসিনী, রোকেয়া রচনাবলী] [৩]

অবরোধবাসিনীতে রোকেয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের প্রথমদিককার সমস্যার জ্বলন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। স্কুল শুরুর পর মেয়েদের যাতায়াতের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। একেই তো টিমটিম করা তিন চারটি ছাত্রী, তাও পথে পর্দার ব্যবস্থা না থাকলে তারা ক্লাস করতে আসবে না জানিয়ে দেওয়া হয় বাড়ি থেকে। তারপর রোকেয়া গাড়ির ব্যবস্থা করেন অতিকষ্টে মাথা খাটিয়ে যাতে পর্দাও বজায় থাকে আবার মেয়েদের কষ্ট ও না হয়। কিন্তু গাড়িওয়ালা সমস্ত গাড়িকে আলমারির মতো ছিদ্রবিহীন করে নিয়ে আসে যাতে মেয়েদের জীবন গেলেও পর্দা বজায় থাকতে পারে! আবার এক শ্বেতাঙ্গিনী শিক্ষয়িত্রীর সহায়তায় তাতে সামান্য হাওয়া খেলবার ব্যবস্থা করা হলেও মেয়েরা প্রায় দিনই অজ্ঞান হয়ে যেতে লাগল। তার ফলে তাদের পরিবার থেকে কড়া ভাষায় চিঠি পাঠানো হল বেগম রোকেয়াকে মেয়েদের স্কুলে না পাঠাবার কারণ দেখিয়ে আবার গাড়িতে যে সামান্য পর্দার ফাঁক রাখা হয়েছিল শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য তা দেখে রেগে আগুন হয়ে চিঠি পাঠালো মুসলিম নীতি- নির্ধারক কমিটি। তাদের বক্তব্য এমন ‘বেগয়রৎ’ হাল হলে নারীশিক্ষার কোনো দরকার নেই। প্রয়োজনে তারা স্কুলে এবং প্রতিষ্ঠাত্রীর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেবে।

একা নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পুরুষ এবং পুরুষ-পোষিত নারী সব সমাজেই সমান উদ্যোগী। আজো এই ছবির খুব যে পরিবর্তন হয়েছে বলতে পারিনা। আর মুসলিম সমাজে তো একেবারেই না।

বেগম রোকেয়া কিন্তু ভেঙে পড়েননি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্ণমেন্ট গার্লস হাই স্কুল (এখন সরকারী) আজো সমান আলো ছড়াচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে। পুরুষের এই একচেটিয়া কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ১৯০৫ এ লেখা সুলতানা'জ ড্রিমেও রোকেয়া লিখেছিলেন,

"As a matter of fact, in your country this very thing is done! Men, who do or at least are capable of doing no end of mischief, are let loose and the innocent women shut up in the zenana! How can you trust those untrained men out of doors?"

" We have no hand or voice in the management of our social affairs. In India man is lord and master. He has taken to himself all powers and privileges and shut up the women in the zenana." [8] [পৃ.৫১১ রোকেয়া রচনাবলী]

১৯০৪ এ দার্জিলিং ভ্রমণে গিয়েছিলেন স্বামীর সঙ্গে বিনা অবরোধে| প্রথমেই জানিয়েছেন পাঠকের কাছে হিমালয় গন্তব্য এবং দ্রষ্টব্য হিসেবে নতুন না হলেও এক মুসলমান রমণীর কাছে তা সত্যই নতুন। এমনকি ইয়ুরোপিয়ানরা হিমালয় দেখে যায় দলে দলে, তবু মুসলিম মেয়ের কপালে নিজের দেশের সেই অতুল বৈভব দেখার সৌভাগ্য নেমে আসেনা। যাওয়ার পথে সাহেব সুবোর মেমেদের নজর করে দেখেছেন, তাদের সাজসজ্জার রীতি দেখছেন, আর তারপর কার্শিয়ং এ দেখেছেন পাহাড়ি ভুটানী মেয়েদের। সব্বাই প্রচণ্ড শ্রমশীলা, কোনোরকম শ্রমদানেই পিছপা নয়। প্রশ্ন তুলেছেন নারীকে যদি 'অবলা' সম্বোধনের গণ্ডীতে আটকে রাখে পুরুষ, তবে এই ভুটিয়ানীদের কি বলা হবে? তাদের তো অবলা বলে অসম্মানের অধিকার কারুর নেই। তাছাড়াও এই পর্দাপ্রথাবিহীন মেয়েদের দেখে স্বতোঃপ্রণোদিত হয়ে লিখছেন,

মুসলমান ধর্ম্মে শাস্ত্রানুমোদিত পর্দ্দা রক্ষা করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করা যায়, এ কথা অনেকেই বুঝে না। তাই তাহারা বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইলে মহাবিপদ ভাবে। শাস্ত্রে পর্দ্দা সম্বন্ধে যতটুকু কঠোর ব্যবস্থা আছে, প্রচলিত পর্দ্দা ততদপেক্ষাও কঠোর। ... আমার বিবেচনায় প্রকৃত পর্দ্দা সে-ই রক্ষা করে, যে সমস্ত মানবজাতিকে সহোদর ও সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করে। [পৃ. ২০৪ কূপমন্ডূকের হিমালয় দর্শন ]

নিজের সমাজের মেয়েদের কথা মনে করে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের অবস্থান চিন্তা করে উঠে আসছে ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার বোধ। লিখছেন,

আমি পাহাড়ে আসিয়া অত্যন্ত সুখী এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছি। কিন্তু সাধ তো মিটে না, যত দেখি ততই দর্শনে পিপাসা শতগুণে বাড়ে। ... আমাদের এমন সুন্দর চক্ষু,কর্ণ,মন লইয়া যদি আমরা স্রষ্টার গুণকীর্ত্তন না করি তবে কি কৃতঘ্নতা হয় না? মন, মস্তিষ্ক, প্রাণ সব লইয়া উপাসনা করিলে তবে তৃপ্তি হয়। কেবল টীয়া পাখির মত কণ্ঠস্থ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে (অন্ততঃ আমার মতে) উপাসনা হয় না। [পৃ. ২০৪]

বেগম রোকেয়া মুসলিম মেয়েদের নিগড় থেকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, অনেকখানি সাফল্যও লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আরেকজন বেগম রোকেয়াকে শুধু মুসলিমরাই নয় সমস্ত নারীসমাজ আকুল আকাঙ্ক্ষা করেও পায়নি এ মেয়েদেরই দুর্ভাগ্য। রাঙা রাজকন্যাদের পৃথিবী একবারই পায়, পায় নাকো আর।।

তথ্যসূত্রঃ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্ত্রীর পত্র, ছোটগল্প, শ্রাবণ ১৩২১ (ইং. ১৯১৪)

২. বেগম রোকেয়া, কূপমন্ডূকের হিমালয় দর্শন, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ, রোকেয়া রচনাবলী, সম্পাঃ অনিল ঘোষ, ২০১৪ সংস্করণ, কথা প্রকাশনা, কলকাতা ৬৭

৩. বেগম রোকেয়া , অবরোধ বাসিনী, তদেব , পৃ. ৪০৩

৪. বেগম রোকেয়া, Sultana’s Dream , তদেব

**[ 8 ]**

## গ্রামবাংলায় ভ্রমণের স্মৃতি

প্রথমেই বলব এই অধ্যায়টি একটি পিরিয়ড পিস। এক নির্দিষ্ট সময়ের ইতিবৃত্ত। রানী চন্দের ( ১৯১২-১৯৯৭) এই ভ্রমণ-স্মৃতি 'আমার মা'র বাপের বাড়ি' বইয়ে ধরা পড়েছে যে সমাজ-মানুষ-সামাজিক ভাবনার প্রতিফলন, যে সময়ের প্রলেপ এই ভ্রমণস্মৃতির সর্বাঙ্গে, তার পুরোটা আজ মুছে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আজকের পৃথিবীর দিনযাপনের খাতার পাতা থেকে। শুধু মানুষ বা তার সমসময়ই হারিয়ে যায়নি, হারানোর টানে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে দেশীয় সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলিও। যে আর্থ-সামাজিক অবস্থানের সুখছবিটুকু এখানে ধরা আছে তার বাইরেও বিপুল একটা ছবি চিরকালই থেকে যায়, আজো আছে। কিন্তু যুগযন্ত্রণার বিকৃতি তাকে বিবর্তিত করতে পারলেও ধ্বংস করতে পারেনি, তা হল গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সমাজের নঞর্থক (নেগেটিভ) অংশের ছবি। এই ভ্রমণস্মৃতিতে সেটা একেবারেই নেই প্রায়। সবটুকুর মধ্যে মন শুধু সুন্দরের উপাসনা করে গিয়েছে। এই ভ্রমণস্মৃতিতে ধরা পড়ে সময়ের একটা উলটো চলন, কারণ মূল ভ্রমণের (১৯১৭ নাগাত) অনেক বছর পর এই লেখা লিখেছিলেন (প্রথম প্রকাশঃ ১ বৈশাখ ১৩৮৪, ইং ১৯৭৭) রানী চন্দ। তাই এটি ভ্রমণকথার চেয়েও ভ্রমণ-স্মৃতি হিসেবেই গৃহীত হচ্ছে। রানীর এই লেখা জল-মাটি-কাদা-শ্যাওলা-মানুষের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞান। পাললিক অভিজ্ঞতা জীবনের। এই সময়কার মানুষ, তাদের প্রতিদিনের কথাবার্তা, ভাবনা, কাজ ,প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ, আচার ব্যবহার এই সব কিছু নিয়েই আমাদের জীবনে আজ সুদূর অতীত। এমনকি ভৌগোলিক সীমারেখাও দুটি দেশের বুক চিরে দিয়ে চলে গিয়েছে সমস্ত ক্ষত উপেক্ষা করে আজ থেকে সত্তর বছরেরও বেশি আগে। ফলে এই স্মৃতির কোনো অংশই বর্জনীয় নয়।

হারানো স্মৃতির ঢেউয়ে পা ডুবিয়ে আনমনে বসে রানী বলেন হারানো স্বাদের বেড়াতে যাওয়ার গল্প। রানীর গল্পে নারী আছে, আছে খুকি··· আর আছে খুকির চোখের অনাবিল দৃষ্টি, নিরন্তর মেখে নেওয়া ভালোবাসার স্নিগ্ধ আশ্রয়। সে লেখায় তত্ত্ব নেই, জিজ্ঞাসা নেই,প্রতিবাদ নেই, বিশ শতক নেই, বিশ্বযুদ্ধের হাহাকার নেই; আছে শান্তি, আছে বেড়ানোর ছলাৎ-ছল্ আনন্দময় মধুস্মৃতি। রবীন্দ্র এবং অবনীন্দ্র-স্নেহধন্যা রানী তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর কলম ধরেছেন মায়ের কথা বলতে, মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া ছোট্ট গ্রাম

গঙ্গাধরখোলার (যা পরে গঙ্গাধরপুর হয়ে ওঠে) অকিঞ্চিৎকর জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রবহমানতার কথা বলতে।

রানী অনেক বেড়িয়েছেন, পূর্বকালে-উত্তরকালে তাঁর ভ্রমণ রত্নখচিত পেটিকার অব্যর্থ সন্ধান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, শান্তিনিকেতনের নাচের দলের সঙ্গে, স্বামী শ্রী অনিল চন্দের সঙ্গে, স্বামীর অনুমতির পরোয়া না করে জেল ভ্রমণের ঘন রোমাঞ্চ কাহিনী, স্বামীর মৃত্যুর আগে এবং পরে একা, অথচ কোন না কোন দলের সঙ্গী হয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোর সর্ষে তাঁকে অনবরত চালিত করেছে ভারতবর্ষের পথে-ঘাটে, আর পাঠক পেয়েছেন পরম রসের আস্বাদ, এ কেবলমাত্র বাঙালি পাঠকের কপালগুণ। রানীর ভ্রমণের সেই সব স্তরভেদ শুরু হওয়ার আগের এই সর্বপ্রথম ভ্রমণ স্মৃতি নিয়েই এই পর্বের ভ্রমণ-আলোচনা। সদ্য–বিধবা অল্পবয়সী মায়ের সঙ্গে, মামাদের সঙ্গে নৌকোয় চড়ে যাওয়া 'আমার মা'র বাপের বাড়ি'। ছোট্ট রানীর ছোট্ট ছোট্ট দেখা প্রায় ষাট বছর পর বই লেখার সময় নীল আকাশের মত বড় হয়ে উঠেছে।

রানীর জন্ম ১৯১২-য়। বাবা পুলিশকর্মী কুলচন্দ্র দে-র মৃত্যু ১৯১৬-য়, অর্থাৎ রানীর চার বছর বয়সে; তারপর মা নাবালক সন্তানদের নিয়ে উঠে এলেন ঢাকা শহরের একপ্রান্তে গেণ্ডারিয়ায় 'আমগাছওয়ালাবাড়ি' তে। রানীর সবচেয়ে বড়দাদা, পরবর্তীকালের বিখ্যাত শিল্পী মুকুল দে (১৮৯৫-১৯৮৯) তখন বিলেতে। ঢাকার 'ইডেন হাই স্কুল'-এর ছাত্রী পাঁচ বছর বয়সী রানী স্কুলের লম্বা গরমের আর পুজোর ছুটিতে মা, দিদি, শিশু-ভাই আর দুই বড়দাদার সঙ্গে যান মামারবাড়িতে, আনন্দে আর উত্তেজনায় অস্থির ছোট্ট মন কেবলি আঙুলের কর গুনতে মগ্ন, ঠিক তারপরেই,

মামাদের একজন আসেন আমাদের নিয়ে যেতে। বুড়িগঙ্গার ঘাটে সারি সারি নৌকো বাঁধা—একমাল্লাই, দোমাল্লাই, তিনমাল্লাই, চারমাল্লাই---। যত মাল্লাই নৌকো তত জন মাঝি থাকে তাতে। আকারেও বড় হয় সেই অনুপাতে। ...পর দিন ভোর না হতে ঘোড়ার গাড়িতে করে সবাই বুড়িগঙ্গার ঘাটে এসে উপস্থিত হই। মালপত্র ওঠাবার আগেই আমরা ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিই নৌকোয় উঠতে। [পৃঃ ২, আমার মা'র বাপের বাড়ি]

এরপর পথ। বাংলাদেশের কোমল জলপথ বালিকার সমস্ত মনোযোগ টেনে রাখে| উত্তাল ধলেশ্বরী নদীতে নৌকো ঢুকলে সবার মনের উচাটন ভয় রানীর উৎসুক মনকে নিবিষ্ট করে তার মায়ের কার্যকলাপ দেখতে “ মা চোখ বুজে শুয়ে থেকে থেকেই বলে ওঠেন---

ধলেশ্বরী আইলো নাকি ও—ও মাঝিভাই ?” ধলেশ্বরী এসেছে শুনে মা দু চোখ টিপে বালিশের ভিতর মাথাটা আরো গুঁজে দেন; ‘রাম’ নাম নেন। [পৃ.২]

তারও অনেক পরে আসে শান্তধারা, সেখানে নদীর চরে নেমে মায়ের হাতে বানানো লুচি আলুরদম হালুয়ার স্বাদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় অর্ধশতবর্ষ পরে লিখতে বসা মা হারানো রানীর বোবাকান্নার মুক্তবাতাস। এই লেখায় তিনি ‘পূর্ণশশী’ মা কে পান, পান মায়ের মেয়েবেলার গল্প, মায়ের শিল্পীসত্তার সান্নিধ্য। মায়ের সমস্ত বিশিষ্টতার সঙ্গে উঠে আসে বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া গ্রামজীবনের শুধু স্নিগ্ধ নয় স্মৃতিকাজল মাখা ছবি। পথের সঙ্গেই হাত ধরাধরি করে আসে মাঝি-মাল্লাদের কথা। নৌকো চালাতে চালাতে তাদের পিঠের ঘাম জমে ফুটে ওঠা নুনের নকশার কথা। জলের গতির উপর নজর রেখে তিন মাঝির স্বর মিলিয়ে বলে ওঠা, “বলো ভাই—বদর বদর হৈ” শব্দের স্মৃতি।

রবীন্দ্রনাথ রানীকে বলেছিলেন,

গ্রামের ভালোর দিকটা যেমন আছে খারাপ দিকও আছে। খারাপ দিকটা বাদ দিয়ে যা সুন্দর--- সেইটুকুই শুধু ছবির মতো ফুটিয়ে তুলবি। গ্রামের জীবন তো আর পাবি না ফিরে। [ভূমিকা, তদেব] ১

অনেক বছর পরে হলেও রানী কথা রেখেছেন, লিখতে গিয়ে বিষ বাদ দিয়ে সুধাসাগরে মন সঁপেছেন।

লেখার পর বলেছেন, ‘‘মা লিখিয়ে নিলেন’’ |

রানীর মন বরাবরই বিশ্বজগতের গন্ধ-স্পর্শের ভাগ পাবার জন্য উন্মুখ। তাঁর চেতনার রঙ তাঁর প্রতি ভ্রমণের বিবরণে বর্ণময় হয়ে বই-পাঠকের মনে ইশারা জাগিয়ে গিয়েছে। আর অদ্ভুত ভাবে তাঁর বালিকা বয়সের চোখেও লেগে আছে সেই একই বিশিষ্টতা ! এই মা’র বাপের বাড়ি যাওয়ার সময়ে সদ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়েছে ; এসময় বাংলার মেয়েরা কেউ জাপান গিয়েছেন, কেউ মধ্যপ্রাচ্য, আবার এর আগে ও পরে কেউ দলে দলে য়ুরোপ ভ্রমণ করেছেন, বাধার পাহাড় সামলেছেন অথবা উত্তাল দেশীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবদলের ভাবনায় নিয়োজিত হয়েছেন। রানী নিতান্তই শিশু হলেও তাঁর অদ্বিতীয় দৃষ্টি তাঁর মনে যে প্রতিকৃতি তৈরী করেছে এইসময় থেকে, বহু বছর পরে লেখার সময় তাঁর সঙ্গে উঠে

এসেছে জারিত মানবিক (হিউম্যানিটেরিয়ান) ভাব। স্মৃতিচারণামূলক এই ভ্রমণকাহিনীতে সেখানকার নারীর অবস্থান, গ্রাম্য লোকাচার, সমাজজীবনের ছোট-বড়ো আদান-প্রদান, উৎসব, রীতি-রেওয়াজ, আচার-বিচারের লৌকিক সংস্কৃতির ছবির যাথার্থ্য আমাদের চমৎকৃত করে। একালে ক্রমক্ষীয়মাণ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ছবি, সমাজের উঁচু-নীচু জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়ের প্রীতিচিত্র আজও অমলিন।

মার নাম ‘পূর্ণশশী’, তাই ছোটো করে ‘পুণি’ বলেই ডাকেন মাকে বড়োরা। হোসেন মামা ছুটে গিয়ে বাড়িতে ঢুকে এক কাঁদি পাকা কলা এনে নৌকোতে তুলে দেন। হাঁকডাক করে গাছ থেকে এনে দুটো কাঁঠালও পাড়িয়ে দেন। ... খালের বাঁকে বাঁকে জোলা, ভুঁইমালী, শেখ মামাদের বাড়ি। খালে নৌকো ঢুকতে দেখেই তারা এগিয়ে আসে--- কে আইলো ?--- না বোসের বাড়ির পুণি বইনদি আইলো। ... মুখে মুখে বার্তা চলতে থাকে। মা বাপের বাড়িতে পা দেবার আগেই দিদিমার কাছে খবর পৌঁছে যায়। ... সঙ্গে সঙ্গে গোটা গ্রাম ভেঙ্গে পড়ে আমাদের ঘিরে। ঘর-পর সকলের সমান উল্লাস--- যেন সবার ঘরেই কুটুম এল আজ। [পৃ. ৪]

আত্মীয়তার এমন ঔজ্জ্বল্য এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অমিল। এরপর বাপের বাড়ি,

মা’রবাপের বাড়ি--- যেন মা’র সিংহাসনখানি। আট ভায়ের একমাত্র বোন। বড়োমামার পরে মা--- মা’র পরে আর সাত ভাই। মা ছিলেন দাদামশায়ের চোখের মণি। সেই মণিটি দাদামশায় যেন গঙ্গাধরপুরের মাটিকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। গাঁয়ের গর্ব ছিলেন মা। মা এসেছেন, বাড়িতে উৎসব লেগে যায়। [পৃ. ৫]

মা সম্পর্কে রানী বলছেন আরও এক কথা, যার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে দাদা মুকুল দে’র আত্মজীবনী ‘‘আমার কথা’’তেও, রানী লেখেন,

তরকারি কোটায় মা’র বরাবরের শখ। ... মা’র তরকারি কোটার নিপুণতা শেখবার জিনিস--- দেখবার জিনিস। বারকোষ ভরে লাউ কেটে দিয়েছেন মা—থরে থরে এমনভাবে কোটা লাউয়ের গোছা রেখেছেন--- যেন যুঁই ফুলের এক স্তূপ। চোখে ভাসে ছবি--- ঘোমটায় ঢাকা মামীমা কাঁধ বরাবর উঁচু করে বাঁ হাতের তেলোয় লাউভরা বারকোষ নিয়ে চলেছেন উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে যেন পূজারিণী চলেছে মন্দিরের ফুল নিয়ে। [পৃ. ৬]

বালিকার চোখে ধরা দেয় নিত্যদিনের জীবনের উপকথা, যা এখন কেবলি আশ্রয় পেয়েছে ঝরা সময়ের কোলে। স্মৃতির অনুষঙ্গে চোখের উপর ভেসে ওঠে ‘মধুখাম’, বাঁধুনি বেতের নকশা, ঘরের টিনের চালের নীচের তক্তা পাতা কাঠের মই-সিঁড়ি লাগানো ‘কার’, ‘তাক’-‘শিকা’-‘জোতের’ লক্ষ্মীশ্রী সংসার। ঘরে ঘরে কাঠের দরজা। প্রধান ঘরের দরজার পাল্লায় পদ্মলতার নকশা খোদাই। চৌকাঠের মাথায় মুখোমুখি দুই

টিয়ে পাখি--- ঠোঁটে লতা ধরা। সাদা মাটির পৈঠার উপরে কোমর অবধি গাবের কষে রাঙানো বাঁশের বেড়ার ঘর গুলি সুপারি নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছবি হয়ে ফুটে থাকে।

উঠে আসে মধুখামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী লক্ষ্মীর পাঁচালির কথা। অলক্ষ্মী মেয়ে বিদায় নিয়ে সংসারের মঙ্গলসাধনে গৃহলক্ষ্মী বউয়ের কর্তব্য কর্মের বালিকা চোখে দেখা ছবি। এপাড়া ওপাড়া থেকে ইতিউতি ভেসে আসা তিনবার শঙ্খধ্বনি আজ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ইতিহাসের অংশ। রানী নিজেও পরবর্তী জীবনে লক্ষ্মীর চেয়ে সরস্বতীর দিকেই মন দিয়েছিলেন বেশি, কিন্তু জনমভর শ্রীপূর্ণা হয়েছিলেন তাঁর ভাবনায় এবং জীবনে।

গ্রামে থেকে বালিকা রানীর মধ্যে জন্ম নেয় নতুন বোধ:

শশী বইনের মেয়ে সুনীতি--- সবাই ডাকে 'সুনোতি' বলে, তার ডাকনাম 'খাঁদি'। ... হঠাৎই যেন বড়ো হয়ে উঠল সুনোতি, যেমন লম্বায় তেমনি চওড়ায়। এর উপরে গায়ের বর্ণ কালো। পাত্রপক্ষ দেখতে আসে, দেখে চলে যায়, আর আসে না। মা আড়ালে দুঃখ করেন, মামীরা বলেন, 'যা কুৎসিত দেখতে'। শুনে অবাক হই, সুনোতি দিদির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি--- এই তো নাক মুখ চোখ কপাল ঠোঁট থুতি। কুৎসিতটা কোথায় ? [পৃ. ১৫]

অথবা ঝুমকো জবার সাথে গড়ে ওঠে রানীর সখ্য, যেন দুজনেরই দুজনকে কী একটা বলবার আছে অথচ কেউই তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না !

কিম্বা পরিবারের পরিসরে কানাকানি শুনে আবেগ-তাড়িত মনে অনেককাল আগে বিয়ের চারদিন পরেই হারিয়ে যাওয়া রানীর বড়োমামার স্ত্রী বড়োমামীমাকে পাঁচ-বছুরে রানী বলে ফেলেন,

আচ্ছা বড়োমামীমা, সবাই তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে--- জন্মে জন্মে যেন এমন স্বামীই পাই, এই-ই নাকি সতী স্ত্রীর লক্ষণ ? তা তুমিও কি তাই কর ? বড়ো মামীমা আঁতকে উঠলেন, বললেন, 'বাপ্‌রে, এ জন্মে এই স্বামী নিয়ে যা ভুগলাম, আর বলিনা যে এমন স্বামীই চাই।''তা তবে কিরকম স্বামী চাও ?'বড়োমামীমা কী উত্তর দেবেন ? চারদিকে তাকান। আমিও ছাড়িনা। বেড়ার গায়ে আঠা দিয়ে আট্‌কানো আছে অনেকগুলি ছবি ··· গান্ধীজী, তাজমহল, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাথায় বিড়ে পাগড়ি বসানো বঙ্কিমচন্দ্র ··· 'ঐ--- ঐ রকম 'বলে বড়োমামীমা আঙ্গুল দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ছবিখানি দেখিয়ে হেসে ফেলেন। [পৃ. ৩৫-৩৬]

এই বড়োমামীমার সূত্রেই উঠে আসে হারানো ছড়া, স্তবের গান। অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণের শত নাম জপেন তিনি আর রানীর ঘুম ঘোরে রেখে যান মগ্নচেতনার পরম হস্তাবলেপ, মনে পড়া সম্ভব পরবর্তী কালে রানীর আঁকা বিখ্যাত 'কৃষ্ণলীলা সিরিজ'-এর ছবি সম্ভার।

বড়োমামীমা মশারি খোলেন, বিছানা তোলেন--- জোতে সব গুছিয়ে রাখেন, আর মুখে বলতে থাকেন--- 'যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দৈবকী উদরে / মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।'···চলতে থাকে নামের তালিকা, বুঝতে পারি বড়োমামীমা এবারে মাদুর গোটাচ্ছেন;--- বলছেন--- 'দৈত্যারি দ্বারিকানাথ দারিদ্র্যভঞ্জন/ দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ !' মাদুর গুটিয়ে কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। 'গজহস্তী নাম রাখে শ্রীমধুসূদন/ অজামিল নাম রাখে দেবনারায়ণ;'---- বড়োমামীমা এবারে দরজা খুললেন।--- 'কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়োই মধুর/ যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড়ো চতুর।' [ পৃ.১২১ ]

উঠে আসে 'গাজীর পট' দেখার সাংস্কৃতিক বহুস্বর। মুসলমান পটুয়ার হাতে ঘুরতে থাকে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীচিত্র। পট খুলতে খুলতে গানের ধুয়া ধরে পটুয়া, 'বাবু এখনকার দিনে/ শাশুড়ি বউ ঝগড়া করে/ সয়না প্রাণে'; রানীর মনে হয় নিছকই ফালতু কথা। দেশের সঙ্গে, দেশের নাড়ির সঙ্গে এই ধুয়ার যোগ নেই কোন। 'মুশকিল আসান', 'গুড়খার উৎসব', 'আশ্বিনের গার্‌সি সংক্রান্তি', 'ভাইছাতুর দিন', গ্রামের বান্‌নী অর্থাৎ মেলার ইন্দ্রজাল, চিনির 'মোঠ 'এর মতো মিষ্টি লাগে। আসে ঋতুর ঋতুর কোলাহল। ঋতুর ষড়ঙ্গে যেন অজস্র বিচিত্র টানা- পোড়েনের নকশা। বৈশাখের দিনে কালবৈশাখী আর রাতে তুফান আসে, কে জানে কার বুক চিরে চলে যাবে হাওয়া। ছোটরা ভয়ে হরিবোল দেয়, মনে উত্তেজনার উদগ্র চাবিকাঠি। বর্ষায় জল আসার আগমনী। কাঠি পুঁতে দেখা জলের তোড়। নৌকো ভরা শাপলা নিয়ে অনাবিল উন্মাদনার জগৎ। রানীর কথায় তাঁর মায়ের বাপের বাড়িতে প্রতিটি ঋতু আসে, এসে যেন দুহাতে বুকে জাপটে নিয়ে রাখে। এক পলকও ভুলতে দেয়না তাদের উপস্থিতি।

রানীর পরবর্তীকালের অন্যান্য ভ্রমণকথার মতো এখানেও তাঁর অনন্য নারীদৃষ্টিতে ভর করে আসে গ্রাম্য মেয়েমহলের গল্প। কিরণকুমারী, জাফ্‌রানী, সুবাসীবইন, সুশীলাপিসি,মুরলাপিসি, সুন্দরবোঠান, ফুলখুড়িদের মজলিস তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে হয়, কেননা এ স্বাদ আজকের জগতে অতীত।

এর মধ্যে পাটিসাপটার পুরের মতো করে গেঁথে দেওয়া আছে বিয়েবাড়িতে রামসীতার গান, কবিগান আর কীর্তনের রাতভর আসর, মাছ ধরার প্রবল আয়োজনের আনন্দ, আম কুড়নোর মনকাড়া হুটোপুটি, কাঁচা-মিঠে আম ঝিনুক দিয়ে ছাড়িয়ে খাওয়ার লোভী সাধ, আছে 'মাঘমন্ডল', 'পুণ্যিপুকুর', 'তারাব্রত', 'সেঁজুতি'ব্রত, 'লালুব্রত' করার শৈশব ছবি আর ব্রতকারিণীদের মনের প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার মজাদার উশখুসানির কথা।

এই ব্রত উপলক্ষ্যে চলে আসে একটা অদ্ভুত প্রসঙ্গ। সেসময় চলভাষ সুদূর কল্পনা, দূরভাষই ছিল না গ্রাম বাংলায়। টেলিগ্রাম বা চিঠিই ভরসা। 'সুবচনী' ব্রতের খবর আর নিয়ম ভারি অদ্ভুত। সুবচনীরা তিন বোন, তাঁরা সুখবর দেন। সাংসারিক যে কোনো বিষয়ে কেউ মানত করে সুফল পেলে তাড়াতাড়ি গ্রামের পুকুরঘাটে পান-সুপারি-সিঁদুর-তেল-বাতাসা নিয়ে এসে আকলি, সুমতি, ভগবতী (একত্রে সুবচনী)-এই তিন বোনের পুজো করেন, উলুধ্বনি দেন। সারা গ্রাম সেই শব্দে জড়ো হয় সুসংবাদ শুনতে। আর ছোটরা আসে বাতাসার লোভে। কী সুন্দর সম্মেলক সামাজিক মাধ্যম হয়ে ওঠে এই ব্রতকথার আসর। তখন মানুষ অনেক বেশি বেঁধে বেঁধে থাকতেন।

খুব অল্প করে চলে এসেছে চিনিমামার বসরায় যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কয়েক লাইন ছবি। কিন্তু যুদ্ধের সঙ্গে গ্রামজীবনের সরাসরি যোগ সেভাবে উঠে আসেনি। বরং উঠে এসেছে আর একটি অনন্য সামাজিক চিত্র- হিন্দুদের বিয়ের গান। বেশ কিছু বছর ধরে আমরা বিভিন্ন গবেষকের সৌজন্যে মুসলিম বিয়ের গান বিষয়ক বহু তথ্য ও তত্ত্ব জেনেছি।[২] রানীর লেখায় পেলাম অবিভক্ত বাংলাদেশের হিন্দু বিয়ের গানের ছবি। মামাদের বিয়ের কথা ঠিক হলে গ্রামবাসী পাড়া পড়শি সকলের ঘরে ঘরে খবর চলে যায়। আর তার "পরদিন থেকে রোজ দুপুরে রান্নাখাওয়ার পাট সেরে কোলের সন্তানটিকে কাঁখে নিয়ে গ্রামের সধবা গায়িকার দল চলে আসেন।" [পৃ. ৫৩]

আমগাছতলায় শুরু হয় গান। সামনে রাখা থাকে পান-সুপারি-দোক্তা-জাঁতি-আমপাতায় তেল গোলা সিঁদুর(যে কোনো শুভ অনুষ্ঠানেই এভাবে রাখার নিয়ম)। গায়িকারা তেল সিঁদুর কপালে দিয়ে পান মুখে পুরে গান শুরু করেন। রাম সীতাকে নিয়ে হয় গান। পাত্রের মা হন রামের মা আর পাত্রীর মা সীতার মা। একদল গানের একটা কলি গেয়ে দেন, অন্যদল সেটা ফিরে ফিরে গান। এভাবে গানে গানেই ঘোষণা দেওয়া হয় বিবাহের যাবতীয় কর্ম বা অনুষ্ঠানের। তারপর গানে গানেই বিবাহের অনুষ্ঠান এগিয়ে যায়। রামচন্দ্র

অধিবাস শেষে গায়ে হলুদ সেরে নৌকো চরে বৌ আনতে যান, ফিরে এসে সীতার সঙ্গে পাশা খেলেন। আর বিয়েবাড়ি গমগম করে মেয়েদের আকাঙ্ক্ষার গানে, যে গান হিন্দু বাঙালি সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে অবহেলায়, উন্নাসিকতায় আর অনবধানে।

এই ভ্রমণের পাতায় আঁকা আছে শিশুর মনের ছবি। পিয়ার্সন সাহেবের ৩ বাংলায় রানীর মা পূর্ণশশীকে লেখা চিঠিতে 'মাতাঠাকুরানী'র বদলে 'মাথাঠাকুরানী' সম্বোধনের খিলখিল হাসি; সঙ্গে আছে চোরের গল্প, সরলপ্রাণ প্রতিবেশীর গল্পে মোড়া এক মন-কেমন নস্টালজিয়া,

গ্রামের ছেলেরা পিসিকে কয়েকটা ইংরেজি কথা শিখিয়েছে কৌতুক করে। যেমন—গুড্ ম্যান, ব্যাডম্যান, মানি, পজিশন, ভেরিমাচ--- ইত্যাদি। এই কথা গুলি মহা উৎসাহে অতিগর্বভরে পিসি বলেন পাত্রী দেখতে গ্রামে আসা অচেনা পাত্রপক্ষের সামনে। বলেন, 'ব্যাডম্যান' লোক হবেন না, 'গুডম্যান' মানুষ হন। পণের 'মানি' অতবেশি 'ভেরিমাচ' চাইলে কি করে হবে? পজিশন করে রেখে দেখে কথা বলবেন তো ?'... মুরলা পিসির কথায় আর হাতমুখ নাড়ার ভঙ্গিতে পাত্রপক্ষরা মজা পান, হাসেন; পাত্রী পক্ষরাও হাসেন। ... আর গুড়ি গুড়ি দাঁত বের-করা মুরলাপিসির মুখের হাসিখানা হয় তখন একটা দেখবার মতো বস্তু। পিসির ধারণাই যে, তিনি না এসে পড়লে পাত্রপক্ষের সঙ্গে আলাপ চালাবার কেউ-ই নেই এই গ্রামে। [পৃ.৩৯]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন এই বাঙালি সমাজ আরো অনেক বছর জিইয়ে রেখেছিল নিজের অস্তিত্ব। তারপর ধীরে ধীরে গল্পকথার মতো মিলিয়ে গিয়েছে বইয়ের পাতার ফাঁকে।।

তথ্যসূত্রঃ

১. রানী চন্দ, আমার মা'র বাপের বাড়ি, 'ভূমিকা' অংশ, ৬ আষাঢ় ১৩৭৯, প্রকাশঃ ১ বৈশাখ ১৩৮৪, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৩৯৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

২. বাংলাদেশ থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত মহম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠানের ' নরসিংদী গাজীপুরের লোক ঐতিহ্য বিবাহ ও মেয়েলী ছড়া গীত' ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের রত্না রশীদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুসলিম বিয়ের গীত' (চার খন্ড) গ্রন্থ, যা পরে এক মলাটের মধ্যে 'বিয়ের গান' নামে সংকলিত হয়েছে, গাংচিল, সেপ্টেম্বর ২০১৪, কলকাতা থেকে।

[ ৫ ]

## কবির সঙ্গে ভ্রমণ- বাঙালি মেয়ের ভ্রমণের রাবীন্দ্রিক অধ্যায়

কবির সঙ্গে না বলে বিশ্বকবির সঙ্গে বললে বোধহয় বোঝাতে আরো সহজ হয়| রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঙালি মেয়ের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত কিন্তু মধুর হাস্যরসোজ্জ্বল অধ্যায় আলোচনা করব এ পর্বে। এখানে যে ছবি পাওয়া যায় তাতে কবিগুরুই আসল। চলমান বাঙালি সমাজের তিনি এক বিপুল বৈশিষ্ট্য| বাঙালি সমাজ এবং বাংলা ভাষার তাঁর মত সম্পদ আর কেই বা আছে, কীই বা আছে?! আর সেই বিশিষ্টতা বজায় রেখেই বাঙালি মেয়ের এই ভ্রমণ এক পূর্বাপরহীন রবীন্দ্র-অভিজ্ঞান।

ভ্রমণের সময় প্রতি মুহূর্তে অনেক বেশি নজর রাখতে হত কবির প্রতি, তাঁর প্রয়োজন এবং সুখ সুবিধার প্রতি। তাঁর মেজাজটি যেন নিটোল থাকে সেই প্রয়াসের প্রতি| ফলে ভ্রমণে গিয়ে দ্রষ্টব্য দর্শনের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের একোমেবাদ্বিতীয়ম প্রবল ব্যক্তিত্বের মানসিক শান্তির দিকটি খেয়াল রেখে তাঁর সান্নিধ্যলাভ| কবি বিষয়ক প্রতিটি ভ্রমণঅভিজ্ঞতাই তাঁর স্মৃতিময় আনন্দবর্ণন। দ্রষ্টব্য দর্শনও অবশ্যই হত। কিন্তু কবির মতো দ্যুতিময় রত্নভাণ্ডারের সন্ধান কোথায়ই বা মিলবে সহচর-সহচরীদের? সর্বোপরি যে একান্ত গভীরতম বোধ, মনন এবং সুচির জীবনদর্শনের মূর্ত প্রতীক কবি; সেই চৈতন্যের আলো জ্বলা মনুষ্যত্বের অবিরল প্রকাশ তাঁর সংস্পর্শে| যা এতোকাল পরেও ছেয়ে থাকে এই ভ্রমণলেখগুলির পাতায় পাতায়| যে কারণে প্রত্যেকটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতাই মণ্ডিত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র-স্মৃতিতে, স্পর্শধন্য হয়েছে কবির স্নেহসিঞ্চিত হয়ে।

দুই রানী, কবির ভাষায় একজন হয়রানী আর একজন নয়রানী! [১] এই দুই রানীর ভ্রমণস্মৃতি আমরা নির্বাচন করেছি আমাদের কাজের জন্য।

শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ বা রানী মহলানবিশ (১৯০০-১৯৮১) এবং শ্রী রানী চন্দ (১৯১২-১৯৯৭), এই দুজনের যথাক্রমে ‘কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে’ এবং ‘সব হতে আপন’ এই দুটি বইয়ে কবির সঙ্গে ভ্রমণের অসামান্য স্মৃতি অঙ্কিত আছে। এর মধ্যে ‘‘কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে’’ একটি নির্ভেজাল ভ্রমণকথা। কিন্তু ‘সব হতে আপন’ স্মৃতিকথা যার মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণী চন্দের ভ্রমণের অংশটুকু ফ্রেমবন্দী করে তুলে নিয়েছি আমরা।

সময়ানুসারী হয়ে প্রথমে বলব শ্রী নির্মলকুমারী মহলানবীশের 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে' [২] বিষয়ে| বিখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ এবং রবীন্দ্র-অনুচর প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের স্ত্রী নির্মলকুমারী। এই দম্পতি বহুবারই কবির সহযাত্রী হয়েছেন কবির অনুরোধে। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও। ফলে কবির সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলে কেমন সব আয়োজন প্রয়োজন হয়ে পড়ে তা ছিল নির্মলকুমারীর কণ্ঠস্থ। এই ভ্রমণকথায় পথের কথা আর ঘরের কথা সমান ভাবে এসেছে। আর এই দুই মিলিয়ে কবির বিভিন্ন ইচ্ছে-অনিচ্ছে, ছেলেমানুষী স্বভাব-মর্জি, কবি-সাধকের গূঢ় আত্মদর্শন ধরা পড়েছে ক্ষণে ক্ষণে পাঠকের মনের মধ্যে। তাছাড়াও এই ভ্রমণকথায় ধরা আছে 'যোগাযোগ'[৩] এবং 'শেষের কবিতা'[৪] রচনার ইতিহাস।

১৯২৮-এ কবি অক্সফোর্ডে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন প্রথম হিবার্ট বক্তৃতামালা দেওয়ার জন্য। কিন্তু শরীর খারাপ থাকায় একেবারেই যেতে পারেননি। রথী ঠাকুর, প্রতিমা দেবী এবং পালিতা কন্যা নন্দিনী কে নিয়ে এই সময় বিলেত ভ্রমণে যান। আর রবীন্দ্রনাথ বিলেত যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েও শারীরিক কারণে দক্ষিণভারত এবং শ্রীলঙ্কা ঘুরে শান্তিনিকেতনে

ফেরেন। এবারের যাত্রাপথ ছিল, মাদ্রাজ-কুনুর-পণ্ডিচেরি হয়ে শ্রীলঙ্কা এবং মাদুরাই থেকে মাদ্রাজ হয়ে ব্যাঙ্গালোর| ব্যাঙ্গালোরেই ভ্রমণকথা শেষ। সমস্ত ভ্রমণ জুড়ে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই নয়, এন্ড্রুজ সাহেবেরও উজ্জ্বল উপস্থিতি।

খোদ রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রমণ বলে কথা, শুরু থেকেই সাজো সাজো রব। জাহাজের কেবিন ঠিক করার দায়িত্ব দীনবন্ধু এন্ড্রুজের। যাত্রার আগের দিন রাতে যখন কবির সমস্ত মালপত্র জাহাজে রওনা করার কথা সেসময় প্রখ্যাত শিল্পী সুরেন কর জাহাজ সরেজমিনে দেখে এসে জানালেন, এ জাহাজে কবির যাওয়া অসম্ভব, কারণ ঘরের সঙ্গে বিশ্রামকক্ষ (রেস্টরুম) অপ্রতুল, তার জন্য নীচের তলায় প্রতিদিন সকালে ভিড় ঠেলে লাইন দিয়ে কবিকে অপেক্ষা করতে হবে। অথচ সে সময় কবির শারীরিক সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে, নির্মলকুমারীর ভাষায় 'শেষ বয়সের সমস্যা'।

শেষপর্যন্ত কবি আর মহলানবীশ দম্পতি গেলেন ট্রেনে । দীনবন্ধু এন্ড্রুজ আর আর্যনায়কম বা আরিয়াম গেলেন জাহাজে। প্রথম গন্তব্য মাদ্রাজের আডিয়ারে অ্যানি বেসান্তের আমন্ত্রণে 'ব্লাভাতস্কি হাউস'। মাদ্রাজে প্রাণ ওষ্ঠাগত করা গরম ক্রমে

অসহ্য বোধ হল। আর এই সময়েই কুনুর থেকে পিঠাপুরমের মহারাজের আমন্ত্রণ এল| কবি যাওয়া সাব্যস্ত করলেন। তবে আডিয়ারে থাকাকালীন দুটি ঘটনা ঘটে। কবির সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে মিসেস বেসান্ত কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ কবিকে এতো মুগ্ধ করে যে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপনে যে ভাষণ দেন তা আশ্রমিকদের মন জয় করে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। তিনটি কিশোরী এসেছিলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে, যাঁদের একজন ছিলেন সাবিত্রী কৃষ্ণাণ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশ্রুত গায়িকা। তাঁর গান শুনে সাথে সাথেই তাঁকে বৃত্তি দিয়ে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন কবি। মাদ্রাজী মেয়ের মুখে এমন বাংলাগানের অকৃপণ আশীর্বাদ শাশ্বতবাণীর অহংকার। বাঙালির পক্ষে এ ইতিহাস লঙ্ঘন করে চলে যাওয়া অসম্ভব।

এবার পিঠাপুরমের ডাকে কুনুর। কুনুর তামিলনাড়ুর বিখ্যাত হিলস্টেশন।মহারাজের আতিথ্যের কোনো তুলনা নেই কিন্তু এখানে অন্ধ্রদেশীয় রীতিতে আমের সরবতে দেওয়া থাকে লঙ্কাগুড়ো গোলা আর বিছানায় নারকেল ছোবড়ার গদি বই আর কিচ্ছুটি নেই, একখানা চাদর ও না। এদিকে এন্ড্রুজ সাহেবের তীব্র আপত্তিতে কোনো বিছানার ব্যবস্থাই রানী (নির্মলকুমারী)

আনতে পারেননি সঙ্গে, কিন্তু অধ্যাপক মহলানবীশ তাঁর সমস্ত সংখ্যাতত্ত্বের বই ও বিশাল বপু বায়োমেট্রিকা নিয়ে এসেছেন হোল্ডঅলে পুরে। এইবার সকলের মাথায় হাত, কারণ কবির পক্ষে ঘুমোনো অসম্ভব এ ব্যবস্থায়। রানী সরাসরি লেখেননি কিন্তু পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক এই যে প্রচলিত ভাবনা মেয়েরা পথে বোঝা বাড়ান বেশি... ইংরেজ সাহেব ও কিন্তু তার বাইরে নন! এ শুধুই ভারতবর্ষীয় পথি নারী বিবর্জিতার বীজরূপ নয়! অথচ পুরুষের জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি যতই দুরূহ বা ক্লেশদায়ক হোক না কেন তার ছাড় আছে সর্বত্র! আশা করা যায় এ যুগে এই ছবিটা কিছুটা হলেও বদলে গিয়েছে। এ সময় কবি লিখছিলেন ‘যোগাযোগ’ উপন্যাস। আর বার বার বিলাপ করছিলেন, কুনুরের এই যে আরামদায়ক থাকার ব্যবস্থা এখানে অতিরিক্ত খাইয়েই মহারাজ তাঁর সমস্ত আপ্যায়ন মাটি করছেন। স্বাদবিহীন খাদ্যদ্রব্যের বিপুল আয়োজন দেখলেই কবির “গা কেমন করে”! খাওয়ার অত্যাচারেই কবিকে কুনুর ত্যাগ করতে হবে! স্বল্পাহারী স্বল্পে সুখী কবি-ঋষির দিনযাপনের ছবি একটা শুভ্র রংয়ের পরশ বুলিয়ে যায় মনের উপর। কুনুরেই গল্প শোনার ঝোঁকে অধ্যাপক দম্পতি কবিকে নতুন খাতা উপহার দেন আর লেখা শুরু হয় শেষের কবিতার অনবদ্য চরণগুলি। এখানেও স্যর শঙ্করণ নায়ারের উদ্যোগে কবিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, যা ছিল কবির সমস্ত ভ্রমণেরই একটি নিয়মিত অঙ্গ। ফেরার পথে দক্ষিণ ভারতীয় ধনী ঘরের যুবকের সাধারণতম দক্ষিণ-দেশীয় খাবারের প্রতি টান দেখে কবি নব্যবাঙালি সমাজের যুবকদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন, ‘আমাদের বড্ড বেশি সাহেবিয়ানাতে পেয়ে বসেছে।’ অদ্যাবধি এ কথা বাঙালি সমাজের জন্য অমোঘ সত্য।

এরপর মাদ্রাজ থেকে জাহাজে পণ্ডিচেরী এবং সিংহল। এসময় কবি শ্রী অরবিন্দ ঘোষকে দেখার জন্য উৎসুক ছিলেন। দুজনের সাক্ষাৎ অবশ্যই হল কিন্তু তার আগে ঘটল সেই মজার ঘটনা। শারীরিক অস্বস্তির কারণে কবির পক্ষে ফরাসী জাহাজের মই লাগানো সিঁড়ি দিয়ে বন্দরে নামা অসম্ভব ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত একটি বিরাট পিপের ভিতরে দুটি মোড়া রাখা হয়, যার একটিতে বসেন কবিগুরু আর একটিতে নির্মলকুমারী! তারপর সেই মোড়াশুদ্ধ পিপে ক্রেনে তুলে শূন্যে ঝোলাতে ঝোলাতে একটি ছোট নৌকায় নামিয়ে কূলে ভেড়ানো হয়! এ নিয়ে পরে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কমিক কার্টুন আছে! নির্মলকুমারী লিখেছেন,

> যখন ক্রেনের মুখে আমরা শূন্যে ঝুলছি তখন জাহাজে কী অসম্ভব সোরগোল! সব যাত্রীরা রেলিং-এর ধারে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে আর হাসির স্রোত বয়ে চলেছে। ছোট ছেলেরা হৈ হৈ ক’রে চ্যাঁচাচ্ছে, উৎসাহে হাততালি দিচ্ছে ও মায়ের হাত ধরে টানাটানি করছে। ক্রেনে ক’রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শূন্যে ঝুলছেন এ-ছবি কল্পনা করা শক্ত। [পৃ. ২৫, কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে]

কবি বললেন,

> হাতি, ঘোড়া, গরুকে এমনি ক’রে নাবায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গরু ঘোড়ার সামিল হয়ে ক্রেনে ক’রে নাববে এ কি কখনো কেউ ভেবেছিল? [পৃ.২৫]

এর সঙ্গে ভেবে দেখার কথা এটাও যে বাঙালি মেয়ের ভ্রমণ-লেক্সিকনে এর আগে বা পরে কখনোই এমন বিশ্বকবির সঙ্গে একই পিপেয় চড়ে ভুবনদর্শনের ইতিবৃত্ত রচিত হওয়ার সুযোগ মেলেনি।

পণ্ডিচেরী থেকে ইংল্যান্ড যাওয়ার আকাঙ্খায় কবি কলম্বো পৌঁছলেন একদিন পরেই। স্বীকার করলেন বিখ্যাত ধনী শ্রী ডিসিল্‌ভার আতিথ্য। কিন্তু অসুস্থতা বেড়ে ওঠায় কলম্বোতেই থেকে গেলেন বিশ্রামে। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অনুরাধাপুরের অশত্থচৈত্যে অর্ঘ্য দিতে গেলেন অধ্যাপক দম্পতি, কবিই পাঠালেন। (পরে ১৯৩৪ এ নাচের দল নিয়ে কবি নিজেও অনুরাধাপুর দেখেছিলেন)। বর্তমানে ইউনেস্কো হেরিটেজ স্থাপত্য অনুরাধাপুরে মহারাজ অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা ভারতবর্ষ থেকে বহন করে যে অশত্থচারা নিয়ে গিয়ে লাগিয়েছিলেন তার পাদমূলে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। নির্মলকুমারী লিখছেন, এখানে সবার আগে যা চোখে পড়ে তা হল ভাবগম্ভীর পরিবেশ এবং জনসাধারণের অন্তর্নিহিত শৃংখলাবোধ। এমনকি অর্ঘ্য-বিক্রেতারাও কোনো রকম হাঁক ডাক করে ক্রেতাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন না। সমস্ত স্থানটি পূত মন্ত্রোচ্চারণের পবিত্রতায় পূর্ণ। একটি যেন নিষ্কম্প প্রদীপশিখা। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশীয় তীর্থে পাণ্ডা পরিবৃত গলবস্ত্র ভক্তকূলের অভক্তসুলভ আচরণ মনে পড়ে যায় লেখিকার।

এভাবেই কবি তাঁদের পাঠান ডাম্বালা, সিগিরিয়া, ক্যাণ্ডি দেখে নিতে। নিজে ডুবে ছিলেন যোগাযোগ উপন্যাস শেষ করতে আর শেষের কবিতার স্বপ্নমায়ায়। যদিও তখন শেষের কবিতাকে উল্লেখ করতেন 'মিতা' বলে, যা নাকি উপন্যাসটির মূলসুর! ক্রমশ মাদুরাই হয়ে আবার মাদ্রাজ, ট্রেনেই। কবি খান স্পেন্সারের সাহেবী খাওয়ার তাও যৎসামান্য। ত্রিচিতে দক্ষিণভারতীয় "হিন্দু" খাওয়ার দেখে যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন কবি। খাদ্যের এই পবিত্র অভিজাত দেশীয় রূপ কবিকে মুগ্ধ করেছিল।

এই ভ্রমণের মধ্যেই নির্মলকুমারীর বার কয়েক কবির সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের স্মৃতি মনে এসেছে দু-একটি ঘটনায়। বিলেতে অনেকদিন ভাত খেতে না পাওয়ার পর কেমন মমতাময়ী মায়ের মতো কবি শুধু আলুসেদ্ধ মাখন আর মাস্টার্ড সস মেখে একেবারে বাঙালি ঘি ভাতের স্বাদ এনে খাইয়েছিলেন বুভুক্ষু নির্মলকুমারীকে চকিতে ফিরে এসেছে সেই স্মৃতি! আসলে কবির অন্তরালে বাস করে একজন মানুষের কত না পরিচয়!

ফেরার পথে মাদ্রাজ পৌঁছেই আবারো প্রাণঘাতী গরম। প্রশান্তচন্দ্র চলে গেলেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডক্টর ব্রজেন্দ্র শীলের (১৮৬৪-১৯৩৮) সঙ্গে দেখা করতে তাঁর সেই গন্ধমাদনবৎ বইপত্র নিয়ে। মাদ্রাজে কবি ও নির্মলকুমারী রয়ে গেলেন। আর দেখ না দেখ এক বেলার মধ্যেই কবির মত পরিবর্তন (যাতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সিদ্ধ ছিলেন!)। তিনিও বহুদিনের বন্ধু ডক্টর শীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আর ব্যবস্থাও তখুনি হয়ে গেল। সন্ধ্যার ট্রেনে নির্মলকুমারীর তত্ত্বাবধানে রওনা দিলেন কবি! এমন সৌভাগ্য কজন বাঙালি মেয়ের হয়?! আর মেয়েরা যে সব পারেন তা আজকের কথা নয়, বৈদিক কালে বেদসূক্ত রচনা থেকে একালের কবিকে নিয়ে ভ্রমণের সময় ভোর চারটেয় অনামা কোনো স্টেশনে নেমে খানসামা ধরে রিফ্রেশমেন্ট রুম থেকে পরাধীন ভারতের বিখ্যাততম কবির ভোরবেলাকার চা যোগাড় করা! হৃষ্টচিত্তে কিন্তু করেছিলেন নির্মলকুমারী। অথচ কবির সমস্ত বাক্স ট্রেনে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব যাঁর উপরে ছিল সেই আরিয়াম ভুলে গিয়েছিলেন কবির জামাকাপড়ের বাক্সটাই! কি ভাগ্যি নির্মলকুমারীর গিন্নিপনার জোরে অন্তত প্রয়োজনে বদলাবার দু সেট কাপড় সঙ্গে ছিল। ব্যাঙ্গালোর স্টেশনে ডক্টর শীল এবং অধ্যাপক মহলানবীশ এসেছিলেন কবিদের স্বাগত জানাতে। তারপর ব্যাঙ্গালোরের ব্যালাব্রুয়ি বাংলোয় ডক্টর শীলের আতিথ্যে কবি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন তাঁর হয়রানী কিম্বা নয়রানীর গুণপণার কথা।

আর নির্মলকুমারীর মনে পড়েছিল একবার বুডাপেস্টের ব্যালাটনফ্যুরেডের কার্বনিক অ্যাসিড বাথ স্যানাটোরিয়ামে থাকাকালীন এক মঠে কবির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তাঁরা গিয়েছিলেন স্বামী স্ত্রী মিলে, আর তার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কবি সেই মঠে স্বয়ং উপস্থিত! আসলে খেয়ালী ইচ্ছের লাগাম ছেড়ে দিতেন রবীন্দ্রনাথ। কখনো যুক্তি তাঁকে চালিত করত আবার কখনো চালিত করত ছেলেমানুষী ইচ্ছের দল।

এখানে যোগাযোগ আর শেষের কবিতা একই সঙ্গে সব্যসাচীর মতো লিখছেন কবি, দুই উপন্যাস সম্পূর্ণ দুই আলাদা ভাষাভঙ্গীতে, আর রাণী মহলানবীশ আবিষ্কার করছেন ভারতীয় রেশম বস্ত্রের ধ্বংস হতে বসা রূপ। রেশমি শাড়ির উপর প্রাইমাস স্টোভ আর স্যসপ্যানের ডিজাইন দেখে সকলের আক্কেল গুড়ুম! আমাদের সুপ্রাচীন রেশম শিল্পের সৌন্দর্য বা বয়নশিল্পের অবনমন কবিকে অন্তরে চিন্তিত করে তুলেছিল। তিনি সুন্দরের উপাসক। সত্যেরও। আনন্দ থেকে আনন্দে তাঁর বিচরণ। "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি আনন্দেন জাতানি জীবন্তি..." [৫] এই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম বীজমন্ত্র। ডক্টর শীলের উৎসাহে তাড়াতাড়ি শেষ করলেন শেষের কবিতা ব্যালাক্রয়িতে বসে সারারাত জেগে। নির্মলকুমারী লেখার অতলে মগ্ন কবির পিছনে দাঁড়িয়ে শুনলেন 'হে বন্ধু বিদায়'-এর অমোঘ পঙক্তিগুলি। যা পরদিন কবি পাঠ করলেন সকলের সামনে। শেষ হল নির্মলকুমারীর ভ্রমণলেখা। আর কবির সঙ্গে এতো ভ্রমণ করেও মোটে এই একটি ভ্রমনকথাই তিনি লিখেছেন ভাবীকালের জন্য।

এবার রানী চন্দের কথা। যেখানে ভ্রমণ আর শুধু ভ্রমণের গন্তব্যে বাঁধা থাকে না, ভ্রমণ হয়ে ওঠে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 'সব হতে আপন' [৬] জুড়ে সেই স্মৃতি। এই ভ্রমণের মালা গেঁথেই ১৯৩৩ সালে কবি তাঁর একান্ত-সচিব শ্রীযুক্ত অনিল চন্দের (১৯০৬-১৯৭৬) সঙ্গে কলাভবনের ছাত্রী রানীর বিবাহ আয়োজন করেন বম্বের টাটা প্যালেসে। এই বিবাহে সর্বরকম সহোযোগিতা করেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। রাণীর লেখায় এখানে পথের কথা সেভাবে কিছু বেরিয়ে আসেনি, তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী গুলির মতো। শুধু জানা যায় পারিবারিক ভাবে বিবাহ স্থির হলেও কোনো জটিল কারণে পাত্র-পাত্রীর দুই পরিবারই বেঁকে বসেন। এমন সময় শান্তিনিকেতনের নাচের দল বম্বে যাচ্ছিল নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠান, শিল্প-প্রদর্শনী এবং সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর ফাণ্ড সংগ্রহের লক্ষ্যে| তবে এসময় বম্বে যাওয়ার মূল কারণ ছিল রবীন্দ্রসপ্তাহপালন, যার প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন সরোজিনী। এই আনন্দ-উৎসবে যাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথের আদেশে এবং রথীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাপনায় অনিল এবং রানী, যুগলে মিলিত হলেন এই দলের সঙ্গে বর্ধমান স্টেশনের ওয়েটিং রুমে। তারপর কবির পৌরোহিত্যে বৈদিক মতে বিবাহের কাহিনী তো ইতিহাস। কিন্তু এক্ষেত্রে বলার কথা এই যে রবীন্দ্রনাথ মানেই সমাজ-প্রচলিত নিয়ম নিগড়ের বিপরীতমুখী খোলা হাওয়ার অভিঘাত। যে কোনো বিষয়েই। ঠিক তেমনি প্রচলিত সাধারণ বাঙালি সমাজে যা হওয়ার নয়, যা নিয়মের রক্তচক্ষু বেড়াজালে আটকে যাওয়ার, নিদেনপক্ষে প্রশ্নসাপেক্ষ-- তাইই ঠিক ঘটে নানা ভাবে রানীর সঙ্গে, বিনা আয়াসে এবং আনন্দের আবরণে। ফলে সামাজিক বিচরণের ক্ষেত্রটি অনেক অবাধ, অনেক সহজ, অনেক বিস্তৃত হয়ে যায় কবির সঙ্গে থাকলে| যে কাঠিন্য এবং বাধার সম্মুখে পড়তে হয়েছিল পরবর্তীতে কলকাতা এবং শান্তিনিকেতনে ফিরে তার আগের এই আপাতমধুর উজ্জ্বলরসায়ন অংশটি রানীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। মুসলিম-পার্শী

পরিবেশে বৈদিক বিবাহের আয়োজন, উপস্থিত বেশির ভাগ মানুষই পরবর্তীকালে দেশবিখ্যাত হয়েছেন, অথচ কি সহজ মর্যাদামন্ডিত কিন্তু অনাড়ম্বরভাবে সমস্ত পরিচালনা করেছেন কবিগুরু!

রানীর লেখায় অন্তরের দিকে আলো পড়ে খুব বেশি। এই লেখাও তার ব্যতিক্রম নয়। কবির নানা একান্ত ব্যক্তিগত স্বভাবের বর্ণনা তাই খুব বেশি করে মন জয় করে নেয় আমাদের। তার সঙ্গে বিভিন্ন পরিবেশের যথোচিত রস সহকারে বর্ণনা। টাটা প্যালেসে বিয়ের আগে বা পরে রানীর অভিভাবক কিন্তু রবীন্দ্রনাথই। তিনি নবদম্পতিকে ছেড়ে দিচ্ছেন তাঁর জন্য সুরক্ষিত সযত্ন লালিত বিপুল বৈভবে সজ্জিত থাকার স্যুইটটি। নিজে থাকছেন পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট কামরায়। এমনি উনি করতেন বার বার নির্মলকুমারীর লেখাতেও পাই। কারুর সামান্য অসুবিধাও ঘটাতে চাইতেন না। অথচ মজা করতেন বেলাগাম। যেমন এই বম্বে যাত্রাতেই শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনী ছিল, যার উদ্বোধক এবং দর্শক ছিলেন বম্বে প্রেসিডেন্সীর তৎকালীন লাটসাহেব স্যর ফ্রেডেরিক সাইক্স্ (১৯২৮-১৯৩৩)। তিনি প্রদর্শনী উদ্বোধন করে কবির সঙ্গে আলাপে উৎসুক, অথচ কবি এগিয়ে দেন পাশে বসা শিল্পী রাণীকে, যেই না কবির বদলে রাণীকে পেয়ে ভদ্রতাসূচক এক দুটি মামুলি কথা বলে হাত মিলিয়েছেন ভাইসেরয়, অমনি কবির নির্মল হাস্যরসের উৎসারিত বন্যা! কেবলি হাসছেন আর সাদা বাংলায় রাণীর দিকে তাকিয়ে বলছেন,

এ হাত ধুসনে যেন আজ; বাবা, লাটসাহেব শেকহ্যাণ্ড করেছে, সোজা কথা? [পৃ.৫৫, সব হতে আপন]

এই ভ্রমণের সূচীতেই ছিল ভাইজাগ এবং হায়দ্রাবাদ ভ্রমণের আহ্বান। কবির সঙ্গী অন্যান্যদের সঙ্গেই রাণী ও অনিল চন্দ। হায়দ্রাবাদের বানজারা হিলসে অবস্থান কালে নিজাম দিলেন ব্যাঙ্কোয়েট কবিগুরুর সম্মানে। সেখানে রাণীকে কবি এই অতিরাজকীয় পার্টির জন্য তৈরি করলেন এক্কেবারে নিজের পছন্দমতো আভিজাত্যের আলোয়। সকলেই জানেন এমনিতে রাণী চন্দ ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ। বৈভবের বিলাসিতা কখনো তাঁকে ঢেকে ফেলতে পারেনি। রাণীর কলমে শুনব এবার,

এলাহী ব্যাপার। নিজামের ব্যাঙ্কোয়েট, চারি দিকের রোশনাই-এ দিন-রাত্রি ভুল হয়। কত জরি, কত রঙ, কত মণিমুক্তোর ঝলকানি; থ' বনে গেছি। গুরুদেব শিখিয়ে রেখেছিলেন আগে হতে সব। বলেছিলেন, এক বিশেষ সুরে ব্যান্ড বাজবে, পুরুষরা এক-একজন নারীকে নিয়ে খাবার টেবিলে যাবে। একজন এসে তোমার দিকে বাহু বাড়িয়ে দেবে, তুমি আলতোভাবে তোমার হাতখানা তার বাহুর উপর রেখো। তিনিই খাবার টেবিলে তোমার পাশে বসবেন। ... ব্যাণ্ড বাজল। দুরুদুরু বুক নিয়ে আছি। ... আমার কাছেও একজন স্মিতহাস্যে এসে দাঁড়ালেন বাহু বাড়িয়ে, আমিও হাত রাখলাম, তিনি আমাকে নিয়ে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ধীর পায়ে চলতে লাগলেন। ... বাড়ি ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এ রকম অতিরাজকীয় ব্যাঙ্কোয়েট আর পাইনি কখনো। স্বাধীন ভারতেও নয়। ব্যাঙ্কোয়েটের পরদিন মহারাজ ধনরাজগিরি এসে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনের জন্য। তিনি কথা দিয়েছিলেন পাঁচ হাজার দেবেন, দিলেন ডবল। মহারাজ চলে গেলে পর গুরুদেব কৌতুক করে বললেন- তুমি যে কাল রাজার পাশে বসেছিলে তাই দেখো টাকাটা কেমন ডবল হয়ে গেল। বলে হাসলেন— আমিও হাসলাম। এই ধনরাজগিরিই আমাকে বাহু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ব্যাঙ্কোয়েটের দিন। [পৃ.৬১, তদেব]

এভাবেই চাপা হাসির প্রবাহ বয়ে যায় রাণীর লেখনীতে। অভিভাবক রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যমণি। রবীন্দ্রনাথের উপদেশ পরামর্শ মেনে এসেছেন রক্ষা করেছেন মর্মে মর্মে, যেন মণিমঞ্জুষার নক্ষত্রচূর্ণ! লিখেছেন, গুরুদেবের আদেশে তাঁর পাশে বসতে

সঙ্কুচিত বোধ করতেন, তবু গুরুদেবের আদেশ পালন করতেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। আর এমনি এক বিড়ম্বিত হাস্যমুখর মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছিল বম্বেতে যখন হিদায়েতুল্লার বাড়ির সদ্য পর্দা খোলা মেয়েরা কবিগুরুর পাশে বসা সদ্যবিবাহিত, পর্দাবিহীন রানীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ঐ বুঢ্‌ঢা সাব আপকো সাব হ্যায়?!"

আবার ১৯৩৪ এ যখন অর্থসংগ্রহের উদ্দেশে বিপুল শান্তিনিকেতনী দল নিয়ে কবি চললেন সিংহল সেবারেও কবির সেক্রেটারি অনিল চন্দ গিয়েছিলেন সস্ত্রীক। সঙ্গে প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী , নন্দলাল বসু, সুরেন কর প্রভৃতি সকলে। এখানে জাহাজে লেখা হচ্ছিল 'চার অধ্যায়' ৭। আর কবির মেজাজ ছিল সপ্তমে। প্রতিমা দেবী যদিও অনুমান করেছিলেন কিছুটা এই লেখা নিয়েই সমস্যা, তার বিপুল গর্জন বর্ষণ সহ্য করেছিলেন সেক্রেটারি অনিল চন্দ, যিনি পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের ক্যাবিনেট মিনিস্টার হয়েছিলেন। রাণী জানাচ্ছেন, জাহাজ থেকেই গুরুদেব বড্ড আনমনা। থেকে থেকে দূরের দিকে তাকান , আবার কিছু লেখেন, কথা বলতে গেলে মনে হয় যেন জোর করে দু'একটা কথা বলছেন। কলম্বোয় এসে অবস্থার আরো অবনতি হল। সর্বদা গুরুগম্ভীর মুখ। যে কোন বিষয় নিয়েই কবি রেগে উঠছেন। মেয়ের দল দূরে ছিল এক বাড়িতে তাই নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করতে করতেই বলে ফেললেন, " একটা খাতা চাই , এখুনি, এই মুহূর্তে! কেন আমার কাগজপত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে না—এসব কেন কেউ খেয়াল রাখবে না" [পৃঃ ১১৮, তদেব]

রাণী তাঁর নতুন শান্তিনিকেতনী আঁকার খাতা এগিয়ে দিয়ে আপাত উপশম করলেন। রাণীর স্বামী ছুটলেন নতুন কাগজ কলমের সন্ধানে। আর "গুরুদেব" অনায়াসে ডুবে গেলেন লেখার অনন্ত সমুদ্রে। ক্রমশ তাঁর মেজাজ হালকা হতে শুরু করল। আর নৃত্যনাট্যের সুরে তালে ছেয়ে গেল কলম্বো, জাফনা, পানাদুরা, ক্যান্ডি বলা যায় সমস্ত সিলোন। পানাদুরায় এসে কবি সকলকে ডেকে শোনালেন চার অধ্যায়। তাঁর মন আর মুখমণ্ডল দুইই প্রশান্তিতে পূর্ণ।

রাণীর লেখায় শুধু কবিগুরুই নন, উঠে এসেছে প্রথম যুগের শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর একটুকরো দিলখোলা মজার চরিত্র। নৃত্যনাট্যের দলে নাচের শিক্ষক তাঁর যুবক পুত্রের জন্য খালি দুধের খোঁজ করছেন ক্যান্ডিতে গিয়ে। আর সেখানে দুধের একটু অপ্রতুল। এদিকে দুধ না খেলেই নাকি পুত্রের শরীর ভেঙে পড়বে, নাচতে পারবে না। প্রায় কবিগুরুর কাছে দরবার করবেন দুধের জন্য এমন সময় আসরে নামলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। ঐ শিক্ষকের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। কথায় কথায় বলতে লাগলেন এখানে তো সক্কলের দারুণ সুস্বাস্থ্য, কারণ এদেশের সব্বাই হাতির দুধ পান করে! সেই নাচের শিক্ষক তো বিষম খেয়ে একাকার! হস্তীদুগ্ধ! তওবা তওবা। আর কক্ষনো এমন উদ্ভট বায়না করতে শোনা যায়নি তাঁকে! আর ছিলেন সুরেন কর। শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর সমস্ত অর্থের দায়িত্ব তাঁর উপর। আর এ দায়িত্ব তিনি এতোই আন্তরিকভাবে পালন করেন যে মেয়েরা প্রচন্ড গরমে মাদ্রাজ থেকে ট্রেনে ফেরার পথে ছ' পয়সার লেমোনেড খেতে চাইলে খুব জোরে বুকপকেট চেপে রেখে কেবলি আশ্বাস দেন পরের স্টেশনে খাওয়াবেন। এভাবেই চলে আসে শান্তিনিকেতন আর লেমনেড থেকে যায় ফেলে আসা শতকের মেয়েদের ইচ্ছেয়।

এবার একটু ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরব। যে গুরুদেবের প্রতি সম্মান ও ভয়ে রানী চন্দ, রাণী মহলানবীশ এবং অন্যান্যদের হৃৎকম্প সেই গুরুদেব যখন শুধুই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামের এক নব্যযুবা, সেসময় আরো কয়েকজন পরিবারস্থ মহিলা সকাশে তাঁর দিদি বিখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২)গিয়েছিলেন দার্জিলিং! সঙ্গে ‘পুরুষ অভিভাবক’ বলতে রবি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ একা। রবীন্দ্রনাথ এর আগে দার্জিলিং এলেও মহিলাদের এটিই প্রথমবার। স্বর্ণকুমারীর ‘দারজিলিং পত্র’ [৮]-এর প্রকাশ কাল ভারতী পত্রিকায় বৈশাখ ১২৯৫ (১৮৮৮ সাল) থেকে পর পর চার মাস। স্বর্ণকুমারী জানাচ্ছেন, রবিবাবুর বেশভূষা রাজার মতো, দামুকদিয়া ঘাটে কিম্বা সিঞ্চলের পথে বার বার তাঁর সঙ্গিনীদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে পথচলতি মানুষ বারে বারে জিজ্ঞাসা করছেন, কোথাকার রাজা চলেছেন ভ্রমণে?! স্নেহময়ী অগ্রজা বেশ উপভোগ করছেন এই আনন্দ, এমন সময় রবীন্দ্রনাথ ঘুম স্টেশনকেই দার্জিলিং ভেবে নেমে পড়েছেন ট্রেন থেকে। কারণ,

তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যতই বাড়িঘর দেখিতেছেন, ততই প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহার পূর্বস্মৃতি ততই নূতন হইয়া উঠিতেছে, গতবারের যে বাড়িতে ছিলেন তাহার কাছে যে ঝরনাটি ছিল সেটি পর্যন্ত তিনি আমাদের দেখাইলেন, সবই মিলিয়া গেল, এখন কেবল গাড়ি থামিলে হয়, দারজিলিং-এ নামা মাত্র বাকি। গাড়িও থামিল, তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন আমাদের কেহ লইতে আসিয়াছে কি না, দেখিলেন কোথায় কেহ নাই। ” [পৃ. ১০৭, স্বর্ণকুমারী দেবীর ভ্রমণকথা]

তারপর তো ষণ্ডা চেহারার পাহাড়ি কুলি আর ‘ডাইনির’ মতো এক রাজ্যের মালা পরা, নোংরা জামাকাপড়ে পাহাড়ি ভিক্ষুণী কিম্বা ঘুম বুড়িকে দেখে নারীদলের হৃৎকম্প উপস্থিত। এদিকে অভিভাবক নেমে গিয়েছেন পরিচিত লোকজন ডেকে আনতে আর অন্যদিকে কুলি বলছে “গুম... গুম স্তিশন...উত্‌রেগা?!” এই শুনে দেহে প্রাণ ফিরল! আর নারীকুলের ‘অভিভাবক’ রবীন্দ্রনাথও ফিরেছেন ততক্ষণে! এই স্টেশন দার্জিলিং এর আগের ‘ঘুম’ স্টেশন শুনে তাঁরও যারপরনাই ঘুম ছুটে যাওয়া অবস্থা! এবং অতঃপর দার্জিলিং এ পৌঁছনো। এই সমস্তটা থেকে যা বলতে চাইছি, তা হল রবীন্দ্রনাথের গুরুদেব হয়ে ওঠার কাহিনী। ১৮৮৮ থেকে ১৯২৮ এই চল্লিশ বছরে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির আইকনে পরিণত হয়েছেন। ১৯১৩ তে নোবেল প্রাপ্তির পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের ‘কবিগুরু’ আসনটি প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে বাঙালি জনমানসে। নির্মলকুমারী বেশিরভাগ সময় কবি সম্বোধন করলেও রাণী চন্দ ১৯৩৩-৩৪ এ গুরুদেব ছাড়া কিচ্ছু সম্বোধন করেননি রবীন্দ্রনাথকে। বাঙালি মেয়ের ভ্রমণকথার ছাঁকনিতে ধরা পড়া এই ইতিহাস বাঙালির অন্তর্জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ নথির সন্ধান দেয়।।

তথ্যসূত্রঃ

১. রাণী বা নির্মলকুমারী মহলানবিশ এবং শ্রী রানী চন্দ এই দুই রাণীর মধ্যে মজা করে গোল বাঁধাবার জন্য কবি এমন হয়রানী আর নয়রানী নাম দিয়েছিলেন। কবির জীবনের শেষার্ধে এঁরা দুজনেই কবির অত্যন্ত কাছের মানুষ, বিশ্বাসের স্থল ছিলেন। নির্মলকুমারীর ‘বাইশে শ্রাবণ’ বইতে এর উল্লেখ আছে।

নির্মলকুমারী মহলানবিশ, বাইশে শ্রাবণ, প্রথম প্রকাশ ২২ শ্রাবণ , ১৩৬৬, সংস্করণ ১৪০১, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৭, বিশ্বভারতী,কলকাতা

২. শ্রী নির্মলকুমারী মহলানবিশ, কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে, সম্পাদনাঃ শ্রী সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ ১৬ আষাঢ়, ১৩৬৩, ডি.এম. লাইব্রেরি, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৪, সাগ্নিক বুকস্, কলকাতা

৩. যোগাযোগ – উপন্যাস, আষাঢ়, ১৩৩৬ (ইং. ১৯২৯)

৪. শেষের কবিতা – উপন্যাস, ভাদ্র, ১৩৩৬ (ইং. ১৯২৯)

৫. "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। ..." , তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।৬ , পৃ. ৫৪০, উপনিষদ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৬. শ্রী রানী চন্দ, সব হতে আপন, প্রথম প্রকাশ ২৫ বৈশাখ, ১৩৯১, সংস্করণ পৌষ ১৪০১, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা

৭. চার অধ্যায়-- উপন্যাস, অগ্রহায়ণ ১৩৪১, ইং. ১৯৩৪

৮. স্বর্ণকুমারী দেবীর ভ্রমণকথা, সম্পাঃ প্রত্যুষকুমার রীত, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পুনশ্চ, কলকাতা

[ ৬ ]

## জেল ভ্রমণ পর্ব

জেল ভ্রমণ এমনি এক অদ্ভুত ভ্রমণ, যা বাঙালি মেয়েদের একেবারে পিছুটানহীন ভাবে একাকী পথে বেরিয়ে পড়ার হাতছানি দিয়েছিল। অথচ একে কোনক্রমেই স্বেচ্ছাভ্রমণ বলা চলে না, এক্ষেত্রে কোনো পারিবারিক সম্মেলনও হওয়ার সুযোগ ছিল না আর না ছিল তাতে কোনো বেড়িয়ে বেড়ানোর আনন্দসম্ভার। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে স্বাধীনতার আগে মেয়েদের একাকী ভ্রমণের কোনো সুযোগ জেলে যাওয়া এবং বিচারের আগে বা পরে জেল থেকে জেলে চালান হওয়ার পরিসর টুকু ছাড়া আসেনি। সমাজের পরিচিত বিধিবদ্ধ গণ্ডীর বাইরে একরকম নিজস্ব যাপনের কিঞ্চিৎ স্বাদ এই দুর্ভাগ্যকে সাথে নিয়েই কিছু কিছু মেয়েরা লাভ করতে শুরু করেছিলেন।

বহু মেয়েরা বারে বারে লিখেছেন আমাদের দেশের মধ্যে মেয়েদের একাকী ভ্রমণ জরুরি হলেও কতখানি অসম্ভব দেশীয় মানুষের (আসলে পুরুষের) পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব এবং অব্যবস্থার ফলে।[১] বিবিধ ভয়ের শিকার মেয়েরা বহু শতক ধরে মেনে নিয়েছেন 'পথি নারী বিবর্জিতা' এই শাস্ত্রবাক্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে যখন এই পাখিপড়া বুলি উলটে দেওয়ার আয়োজন ঘনিয়ে এলো, তারও বহু দশক পর বিশ শতকের মেয়েরা একেবারে একাকী বেরোনোর সাহস টুকু করে উঠলেন। সমাজের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে মেয়েরা ক্রমশ দেশের কাজে, স্বাধীনতার লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই পথ ও একেবারেই সহজ ছিল না বা একদিনে হয়নি। একটি দুটি করে গুপ্তসমিতি এবং সভাসমিতিতে নাম লেখাতে লেখাতে একদিন হাজার হাজার কন্যারত্ন দেশমায়ের পূজার বন্দনা গেয়ে উঠলেন। এবং সে সাধনা কেবল নিরস্ত্রের সাধনা ছিল না, সে সাধনায় সশস্ত্র সংগ্রাম অচিরেই রঞ্জিত হয়ে উঠল। আর ভারতবর্ষে লিখিত হল নারী-ইতিহাসের অভূতপূর্ব এক অধ্যায়। এই পর্বে আমরা আলোচনা করবো দুই নারীর জেল ভ্রমণের কথা।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের উষাকালের অগ্নিকন্যা বীণা দাস ( ১৯১১-১৯৮৬), যিনি ১৯৩২ এর ৬ ফেব্রুয়ারী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে কনভোকেশন চলাকালীন বাংলার তৎকালীন গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে রিভলবার থেকে একাধিক গুলি চালান। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং বীণা দাশ গ্রেপ্তার হন। এখানে বলে রাখব , বীণার বাবা শ্রী বেণীমাধব দাস, একজন বিপ্লবীভাবাপন্ন মানুষ এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের আদিশিক্ষক। ফলে আমাদের কাজের অন্য অধ্যায়ের মতো এই অধ্যায়েও বাবার প্রভাব মেয়ের জীবনে পরম মাহাত্ম বিকাশ করেছে তেমনটা দেখা যায়।

এরপর বীণা দাস জেলে গেলেন, প্রথম বার। বিচারে তাঁর নয় বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। যদিও পরে গান্ধিজীর হস্তক্ষেপে ১৯৩৯ এ সাত বছরের মাথায় ছাড়া পান। এই সাতবছরে একাধিক জেলে থেকেছেন বীণা। প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেল আর মেদিনীপুর জেল পরে হিজলি এবং বাংলাদেশের অনেকগুলি জেল, শেষ পর্যন্ত দিনাজপুর হয়ে কলকাতা, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল| জেল থেকে জেলে যাওয়ার পথ নয়, কয়েদখানার অন্তরালে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বীণা। তাই বীণার লেখায় এক জেল থেকে অন্য জেলে যাত্রার ইতিহাস একেবারেই ধরা পড়েনা। বরং ধরা পড়ে কিছু একান্ত নিগুঢ় উপলব্ধি, জীবন এবং তার লক্ষ্য সম্বন্ধে। আবার রানী চন্দের ( ১৯১২-১৯৯৭) লেখায় অন্তর বাহির দুইই সযতনে ছাপ ফেলে যায় পাঠক মনে|

এক জায়গায় বীণা আর রানীর মিল আছে। এঁরা দুজনেই খুলে ধরেছেন সমাজের অদেখা অংশের মেয়েদের জীবনের পরণকথা। এবং তারই সঙ্গে অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয় কয়েদখানার সঙ্গে নারীর আদান-প্রদানের রূপটিও ধরা পড়েছে এই দুই লেখায়। একটি বীণা দাসের ‘শৃঙ্খল ঝঙ্কার’ (প্রথম প্রকাশঃ ১৯৪৮) [২] এবং আরেকটি শ্রী রানী চন্দের ‘জেনানা ফাটক’ [৩]। রানীর লেখায় এক জেল থেকে অন্য জেলে চালান যাওয়ার পথটুকুও কি এক অদম্য আগ্রহ আর উৎসাহে পরিপূর্ণ। একটি কথা না বললেই নয়, তা হল, পরিবার এবং সমাজের আওতার বাইরে এই জেল থেকে জেলে গতায়াতের ধারাটি আজও মেয়েদের বা যে কোনো কয়েদীর জন্যই বহাল আছে, কিন্তু তার ভ্রমণের মাধুর্যটুকু ঘুচে গিয়েছে। তাই প্রথমে বীণা দাশ এবং পরে রাণী চন্দের কথা বলে আমরা এই পর্ব শেষ করব। পরবর্তীকালে জয়া মিত্র বা মীনাক্ষি সেনের জেলের প্রগাঢ় অন্ধকার ঋণাত্মক অভিজ্ঞতা কিছুতেই ভ্রমণের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এমনকি স্বাধীনতার কিছু দিনের মধ্যেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সুরমা ঘটকের জেল যাপনের সঙ্গেও ভ্রমণভাবাত্মকতার কোনো যোগ নেই।

জেল-জীবনের ক্লেদ পেরিয়েও রাণী চন্দ ভ্রমণের আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন, বীণা দাশ প্রাথমিকভাবে ক্লেদ দেখতেই পাননি, পরে যদিও গভীর যন্ত্রণার সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন। কিন্তু সুরমা ঘটক, জয়া মিত্র, মীনাক্ষি সেন-এর লেখায় জেলের তীব্র জটিল সুচতুর অন্যায় অবিচার নিরবচ্ছিন্ন ঘৃণার এবং কর্দমাক্ত পঙ্কিল পাপের স্রোত আর হাড় হিম করা ভয়ানক শারীরিক মানসিক অত্যাচারের খতিয়ান ছাড়া কিছু মনে ধরা পড়েনা। প্রথমে বীনা দাশের কারান্তরালের অভিজ্ঞতা আলোচনা করবো। মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের ভয়ানক রকম শ্রেণী বৈষম্য থাকলেও সিস্টারহুডের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না, বরং নানাভাবে প্রকাশ পেতে থাকে হৃদয়ের অন্তর্গত আত্মীয়তা। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ১৯৩২ এর ফেব্রুয়ারীতে কয়েকদিনের মধ্যে বীণা কে নিয়ে যাওয়া হল মেদিনীপুর জেলে। ‘পোলিটিকাল প্রিজনার’ বা রাজনৈতিক বন্দী বিষয় টি ছেলেদের মধ্যে ততোদিনে কিছুটা একচেটিয়া হলেও মেয়েদের মধ্যে প্রায় নতুনই বলা চলে। যদিও এই সময়ে নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিপ্লব-মন্ত্রে উদ্বোধিত হয়েছেন। এই নতুন দিনের কারিগর হওয়ার মুহূর্তে নারী-পুরুষ ভেদ অনেকটাই মুছে গিয়েছিল দেশের সন্তানের ভূমিকায়। বলা চলে কৃষ্ণভাবিনী দাসের স্বপ্নপূরণের সূচনা হয়েছিল এভাবেই। মেদিনীপুর জেল সম্পর্কে লিখলেন বীণা,

> ... অসংখ্য মেয়েদের ভিড়ে জেল ভেঙে পড়েছে। তবে কলকাতার সঙ্গে তফাৎ এই যে এখানে বেশিরভাগই গ্রামের মেয়ে। সুদূর পল্লী থেকে ছোট ছোট বাচ্চাকাচ্চা বুকে নিয়ে কত যে মেয়ে চলে এসেছে –- স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ নিতে। কতজনের কপালে পিঠে লাঠির দাগ, আরও অন্যধরণের অত্যাচারের চিহ্নও রয়েছে শরীরে, দেশের জন্য সমস্ত লাঞ্ছনাই একান্ত সহজভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে এরা। একেবারে অশিক্ষিত গ্রামের মেয়ে বউ। এমনিতে নিতান্তই সাধারণ ওরা, রাতদিন ঝগড়া করে , চেঁচামিচি করে। তবু ভারি শ্রদ্ধা করতাম ওদের—মনে হত ওদের জেলে আসা আমার চেয়ে কত শক্ত, কত দুঃখের।
>
> প্রথম কয়েকমাস জেল টা ঠিক জেল বলে বুঝতে পারিনি। সঙ্গিনীদের কাউকে ডাকি দিদি, বৌদি, কেউ মাসিমা, কেউ ঠাকুমা। স্নেহে যত্নে আমাদের তিনজন কে সবাই ঢেকে রেখে দিতেন। সবচেয়ে ভালো খাওয়া টা আমাদের জন্য, ঘরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো জায়গাটা আমাদের শোবার জন্য। এক গেলাস জল ও ঢেলে নিতে দিতেন না আমাদের। [পৃ.৩৬-৩৭, শৃঙ্খল ঝঙ্কার]

বিচারের আগে প্রেসিডেন্সি জেলে ক'টি দিন থাকার সময় বীণা দেখেছেন কি মায়া তাঁর জন্য অন্যান্য মেয়েদের। সকলেই বাঙালি নন, কেউ গুজরাতি কেউ অন্য কিছু। কিন্তু যদি বিচারে প্রাণদণ্ড হয় এই ভয়ে দুদিনের পাওয়া বীণা কে তাঁরা নিজেদের অশ্রুজলে আর ভালবাসায় সাজিয়ে দেন বিচারের দিন কোর্টে যাওয়ার আগে। অপরিচিত মেয়ের দলের এহেন ভালোবাসার অভূতপূর্ব উদাহরণ এই জেলখানার চার দেওয়াল। তবে শুধু ভালোবাসাই নয়, অত্যাচার ও ছিল। কঠিন বীভৎস অত্যাচার। যে অত্যাচার দেখা যায় না কিন্তু কিভাবে যেন প্রাণ কে নিষ্পিষ্ট করে প্রাণবায়ু বের করে নেয় কঠিন হাতে এই জেলের চার দেওয়ালেরই মধ্যে।

জেলেই বীণার আলাপ হয়েছিল স্টিফেন্স হত্যা মামলার  আসামী শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরীর সঙ্গে। দুটি ছোট্ট মেয়ে। সেই মেয়েদের একজন কে পাঠিয়ে দেওয়া হল ঢাকা আর আরেকজন কে এক ডিভিশন নির্দিষ্ট করে বিচার হওয়ার পরেও নামিয়ে দেওয়া হল ডিভিশন থ্রিতে। তারপর শুরু হল নানাভাবে অত্যাচারের অন্যায়ের ফর্দ। অসহ্য গরমে একটা হাতপাখা চাইলেও তা জেলকোডের বিপরীতে যায়। অথচ রাজবন্দীকে অন্য ডিভিশনে নামিয়ে আনার নোংরা খেলার কোনো প্রতিকার হয় না, কারণ রাষ্ট্র মেয়েটির উপর তার থাবা বসাতে পারে তাহলে সহজেই। অসুস্থ হয়ে পড়েন নানা অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনশন শুরু করে শান্তি ,সুনীতি এবং বীণা। ক্রমশ ওঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্ত তার আগে নানাভাবে মেয়েদের সঙ্গে ঘটতে থাকা কারান্তরালের অপরাধগুলি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও উল্লেখ করলে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বীণা কে ভাঙা ভাঙা বাংলায় জানান, সীমাহীন এই অন্যায় না দেখতে পারলে চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে। অন্যায়ের ফিরিস্তি খুব অদ্ভুত। খেতে না দেওয়া , শারীরিক যন্ত্রণা , যে কোনো ভাবে বেঁচে থাকার পথে বাধা সৃষ্টি করা থেকে উঠতে বসতে যৌন হয়রানি কিছুই বাদ ছিল না সেখানে। উনিশ শতক আর বিশ শতকের ইংরেজের মুখ বাঙালি মেয়ের কাছে একেবারে আলাদা হয়ে উঠেছে এসময়। উৎসাহে উদ্দাম মন গুলি কিছুদিন কারাবাসের পর ক্রমশ ক্লান্ত শ্রান্ত ছিবড়ের মতো হয়ে উঠত অমানুষিক পরিশ্রম আর যন্ত্রণার আঘাতে। দৈত্যের মতো জেলের নির্বিকার প্রাচীরের বাইরে থেকে যার কিছুমাত্রও বোঝা অসম্ভব। সমস্ত জীবনরস শুষে শুকিয়ে নেওয়ার আসলেই জেল এক দুর্দান্ত ব্যবস্থা। যদিও হিজলি জেলে বীণারা অনেকটা সময় এরই মধ্যে খুব সুন্দর আনন্দ করে সারস্বত সাধনায় মগ্ন হয়ে কাটাতে পেরেছিলেন, কিন্তু বছরের পর বছর পেরিয়ে চার দেওয়ালের অবসাদ মনকে কি পরিমাণ অবসন্ন করে তোলে, হতাশ করে তোলে তা জানতে আর বাকি ছিল না বিশেষ কিছু। বীণার দ্বিতীয়বারের জেলকয়েদ (১৯৪৩-১৯৪৬) বিষয়ে খুব বেশি তথ্য তিনি দেননি। শুধু জানিয়েছেন একদিন কোনো এক পূর্বপরিচিত পথচারিণীর সঙ্গে জেলের জানালা দিয়ে কথা বলার পর জানালা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল লৌহজালিকায়। বন্দিনীদের স্বাস্থ্যের তোয়াক্কা না করেই এই ব্যবস্থা।

রাণী চন্দ জেলে ছিলেন, কিছুমাস মাত্র। ১৯৪২ এর অগাস্টে জেলে এসে ১৯৪৩ এর অক্টোবরে ঘরে ফেরা। অথচ তাঁর

জেনানা ফাটক বইটি এক বিস্ময়-সাম্রাজ্য। কয়েদখানার রহস্যে ঘেরা চরিত্রের চিত্রশালা। এবং জীবনবেদনার কাব্যিক অর্ঘ্য| রাণীর জেলবাস কে অবশ্যই জেল ভ্রমণ বলতে হবে। বাড়ির বাইরে থাকা, পুরোপুরি না হলেও একেবারে নিজের মতো থাকা এবং অগুনতি মেয়েদের সঙ্গে একান্ত জীবনযাপন আর বিভিন্ন জেলে ভ্রমণের ইতিহাসকে অমূল্য মণিরত্নে পরিণত করে গিয়েছেন রাণী। আলাপ, সঞ্চারী আর অন্তরায় বিভক্ত জেনানা ফাটক ছড়িয়ে আছে সিউড়ি জেল থেকে রাজশাহী

জেল পর্যন্ত। রাণীর লেখায় চালান যাওয়ার পথ এক উত্তেজনা রোমাঞ্চে ভরা উষ্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে হাজির হয়। যদিও সিউড়ি থেকে রাজশাহী যাওয়ার আগে জানাতে ভোলেন না, নারীর বাসা বাঁধা মন সহজেই শেকড় চারিয়ে দেয় অজ্ঞাত মায়ায়, মন থেকে মনে। নিজের সঙ্গে সঙ্গে সেসবকেও গুছিয়ে তুলে নিতে হয় এক জেল থেকে অন্য জেলে যাওয়ার সময়। এই ব্যথা মনের মধ্যে বিঁধতে থাকে সর্বক্ষণ, কিন্তু যেই মেলে নতুন পথের আভাস মন রওনা দেয় 'চলি গো চলি গো যাই গো চলে' [৪] আওড়াতে আওড়াতে। এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা। এমনকি ভারি অদ্ভুত বাইরের পরিবেশ ও। তেমনি এক ছবি ধরা পড়ে রাণীর লেখায়, রাজশাহী যাওয়ার সময়।

সময় হয়ে এলো রওনা হবার। ... এক এক করে ফটকের বাইরে বের হলাম। দড়াম করে ফটক বন্ধ হল... আপিসের কাজ সারা হলে – দুটো ঘোড়ার গাড়িতে ভাগাভাগি করে উঠে বসলুম। জেলার, ডেপুটি জেলারের বাড়ির জানলার পর্দাগুলির ফাঁকে ফাঁকে – কৌতূহলী জোড়া জোড়া সুর্মা পরা চোখ, সিন্দুরের টিপ পরা কপাল, গোছা গোছা কাঁচের চুড়ি, সোনার চুড়ি, সাদা শাঁখা-পরা সরু মোটা হাত দেখা দিল।

চাবুকের ঘা খেয়ে ঘোড়াগুলি টগবগ করে পা ফেলল, গাড়ি গড়িয়ে চলল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দুপাশে বোঁ বোঁ করে কয়েকটা সাইকেলও ছুটল! আরোহীদের কেউ যুবক, কেউ প্রৌঢ়—কারো গায়ে কোট, কারো গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী... দেখে মনে হয় হঠাৎ যেন তাদের জরুরি কোন কাজের কথা মনে পড়ে গেছে! কিন্তু কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার তারা থামে কেন মাঝ রাস্তায়? কেউ বা মালকোঁচা মারে, কারো বা দেখা হয়ে যায় অতিপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে ঠিক এই সময়েই?! এলা বলল, এরা আমাদের গুপ্তসাথী! তাই তো! সিউড়ি স্টেশনে waiting room এ সোজা এনে ঢুকিয়ে দিল আমাদের। ফাঁকে ফাঁকে মুখ বাড়াই , চেনা মুখ আছে কয়েকটি। গুপ্তসাথীর এক একজন তাদের গলা জড়িয়ে বসে আছে গল্প করার ভাবে। [পৃ.৩১, জেনানা ফাটক]

এই লম্বা পথ যেন আর শেষ হয় না। সিউড়ি থেকে অণ্ডাল হয়ে ব্যাণ্ডেল জংশন, নৈহাটি, রানাঘাট, ঈশ্বরদি হয়ে ক্রমশ রাজশাহী। অবিভক্ত বাংলার এই সুবিপুল যাত্রাপথে আরো কত রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে। মেয়ে পোলিটিক্যাল প্রিজনারদের দেখতে ভিড় জমায় পুরুষরা, সাধারণ গৃহস্থ  বধূ জিজ্ঞাসা করে এ পথে কেন আসা? আবার কোন অতিউৎসাহীকে ধরে এই বন্দিনীরা জোর করে বলান বন্দেমাতরম! কেউ বা স্লোগানের ভয়ে পিঠটান দেয়। এদিকে কোন স্টেশনে প্রিজনারদের নিয়ে যাওয়ার ট্রেন ভরা গোরা সৈন্যের হল্লা, যাত্রীর আর মোটঘাটের ভিড়ে আসল প্রিজনারকেই ট্রেনে না তুলে ট্রেন ছেড়ে চলে যাওয়ার বিপদ। তাতে খানিক খানিক মুক্তির স্বাদও মেলে বইকি। কিন্তু মনের মধ্যে চেপে বসে ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর অন্যায় শাস্তির হিমশীতল ভয়। তাই বহুকষ্টে চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে,

তাড়াতাড়ি তাতে উঠে বিছানার মোটের উপর চেপে বসলুম। দেখে শুনে ট্রেন ছাড়ল—এবারে আর কেউ বাকি পড়ে নেই। এতোক্ষণে কুলকুল হাসিতে ভেঙে পড়ল সবাই। সত্যিই কী বিষম কথা—ট্রেন চলে যাবে মাঝরাস্তায় আমাদের ফেলে? আমরা যে political prisoner ! [পৃ. ৩৫, তদেব]

এই গর্ব, অহংকার আনন্দ ধুলিসাৎ করে দেওয়ার চেষ্টায় কেউ কেউ পথে দুয়ো দেন এই লক্ষ্মীছাড়ি মেয়েদের। কিন্তু কাবু করা যায় না তাদের। পথ চলতে ছোট ছোট ছাউনি দেওয়া হোটেলে ভাত খাওয়ার বন্দোবস্ত। রাণীর মনে হয় এক অসামান্য আপ্যায়ন। তারপর বহু স্টেশন ঘুরে, উঠে নেমে ক্রমশ রাজশাহী জেলের অন্দরে বন্দী হওয়া। বন্দী হওয়ার আগে আকাশটুকু দেখে নিতে ভোলেন না রাণী, ভোলে না অন্য মেয়েরা। যদিও এ নিরুদ্দেশ যাত্রা নয় , অন্তত রাণীর পক্ষে, কেননা খুব গুরুতর কোন অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ছিল না। তবু জেলযাপন এক অনন্ত নারীকথা লিখিয়ে নেয় তাঁকে

দিয়ে। আসার পথে দেখেছেন তাঁরা স্টেশনে স্টেশনে নাম মুছে ফেলা হয়েছে, যাতে তাঁরা জানতে না পারেন চলার পথের হদিশ। আবার অন্য অরাজনৈতিক, অসামী মেয়েরা বলে এই যে জেলের থেকে অন্য জেলে যাওয়ার আনন্দ, হইচই কিছুই তাদের জীবনে নেই, কারণ পথ চলতে চলতে সঙ্গে থাকা এসকর্ট জমাদারনী সমস্ত পথকে বলতে বলতে আসে কয়েদীর ঘৃণিত ইতিহাস। কিছুতেই কোন ছাড় দেয় না অতীতের থেকে। রেহাই পায় না তারা অপরাধের সীমা থেকে। অপরাধ যেন সর্বাঙ্গে লিপ্ত হয়ে থাকে। এ কি কম শাস্তি? শরীরের উপর অত্যাচারের আর মনের উপর অনুশোচনার বোঝা কমে না মেয়েদের।

অপরাধী মেয়েদের অদেখা এক জীবন। দলে দলে মেয়েরা আসে। অপরাধের ফিরিস্তি সাংঘাতিক এক একজনের। খুন, চুরি, বিষ দেওয়া, পরকীয়া এবং হত্যাজনিত সেসব অপরাধের কোন ছাপ থাকে না সেইসব মেয়েদের মুখে। একেবারেই আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব যুক্তি আছে তাদের কৃতকর্মের স্বপক্ষে। সেসব শুনে মনে হতে থাকে পৃথিবীর সরলতম মেয়েটি জীবনের জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছে জঘন্যতম অপরাধের সঙ্গে। আজিমন, মিছিরন,রূপজান, বানু, বানুর মা, রাধা, সরলা, নেছামন, ফুলজানের দলের সঙ্গে আসে অনেক শিশুর দল। নিরপরাধ শিশুরা অপরাধী মায়ের জীবনের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, মাতিয়ে রাখে জেলের আঙিনা। এরা মিশে যায় এলা, শান্তি, মায়া, বিমলা ভাবী, যমুনা,ননীর মতো রাজবন্দীদের সঙ্গে। রাজনৈতিক বন্দী সাবিত্রী দিদির ছেলে সতু আর খুনের আসামী গঙ্গার ছেলে দাজু দুই খুদে গলাগলি করে দিন কাটায়। খতিজা, জলিল রা শিখে নেয় জেলের ব্যবহার, মায়েদের চুলোচুলি-আঁচড়ানো-কামড়ানোর হিংসা গরগরে জীবন। তারা সহজেই শিখে যায় অপভাষার ব্যবহারও। কেউ কেউ বা আবার জেল খাটে মিথ্যে অপবাদে, অন্যের অপরাধের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে। হয়তো মহাভারতের চেয়েও জটিল সে ইতিহাস, বিপুল সে জীবনতরঙ্গ। তার সঙ্গে যুক্ত হয় জেল কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন নিয়ম, মেট্রনের, জমাদারনীর আর ডাক্তারের অনাচার। এই জেলবাসের মধ্য দিয়ে আভাস পাওয়া যায় সে সময়ে বাঙালি মেয়েদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা অস্পষ্ট রূপরেখা। গান্ধীজীর সর্বাত্মকতা এবং কংগ্রেসের প্রভাব। জেলে পালিত হয় আলপনা দিয়ে সামান্য ফুল সাজিয়ে গান্ধীজয়ন্তী। সবসময় পাঠ করেন রাণী সদ্যপ্রয়াত রবীন্দ্রনাথের নানা রকম প্রবন্ধ। মনকে একটি শান্ত সমাহিত আশ্রয়ে মুড়ে রাখেন যেন। কিন্তু এই সামান্য সৌন্দর্যের আয়োজন জেলার আর মেট্রনের চোখে অপরাধ। ঠিক যেমন এক দশক আগে বীনা দাশ কেও শুনতে হয়েছিল ঝরে পড়া ফুল কুড়িয়ে মাথার কাছে সাজিয়ে রাখার 'অপরাধে' বিলাসিতার অপব্যাখ্যা। এসব সময়ে অকারণেই রেগে ওঠেন কর্তাযন্ত্র। যন্ত্রণা দিতে থাকেন নানা উপায়ে, বিবিধ অছিলায়। সমাজের বহু স্তরের মেয়েদের একীভূত রূপ হয়তো অচেনা শক্তির ইঙ্গিত বহন করে আনে। ক্রমশ এই চেতনার একতাকেও ভাঙা সম্ভব হয়েছে স্বাধীন দেশের জেল কর্তৃপক্ষের কূট এবং নীচ বুদ্ধিতে তা জানা যায় মীনাক্ষি সেনের লেখায়। তবে রাণীর সময়ে ততটা বিষাক্ত প্রকাশ অবরোধের মধ্যে দেখা যায়নি। উদয়াস্ত পরিশ্রম আর কর্তায় ইচ্ছেয় কর্মের সময়েও কোনো না কোনো ভাবে রাণীর

ভালো লেগেছে স্বল্প জেল জীবনের অমূল্য মুহূর্ত গুলি| সবাই মিলে অনেক অনেক আনন্দ সম্ভার নিজেদের জন্য জড়ো করে নেয় মেয়েরা এই বদ্ধতার মধ্যেও| এক একদিন মেট্রন কে নাস্তানাবুদ করে রাজনৈতিক বন্দী মেয়েরা অন্যের খাটে অন্যের কম্বলের তলায় একসঙ্গে ঢুকে পড়ে| জেলময় হুড়োহুড়ি পড়ে যায় বন্দী গুনতিতে কম হলে| কখনও বা কালবৈশাখী ঝড়ে আম কুড়োনোর ধুম আবার কখনও ডাক্তারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, অনশনের স্পৃহা জাগিয়ে তোলে বন্দী মন গুলিকে| বেরিয়ে আসার সময় রাণী লেখেন,

এই ঘর, ঘরের কোণা, বারান্দা, বাগান, আকাশ, বাতাস, চিল , শালিক –সবাই যেন আপনজনের মতো আঁকড়ে ধরেছে| ছাড়বার বেলায় ব্যথা বাজছে| এখানে একদিকে যেমন দুঃখ কষ্ট কদর্য গ্লানি; আবার ছিল পাখির কাকলি, ফুলের সৌরভ, কচি পাতার মাধুর্য| সবই ছিল| যা পেরেছি কুড়িয়েছি, যা পারিনি তা আঘাত করেছে| জীবনের যেটা কুৎসিত দিক তাকে দূরে সরাতে অনবরত লড়াই করে চলেছি| তবু বলব; ভালো মন্দ সব মিলিয়ে ভুলেছিলাম— ভুলিয়ে রেখেছিল এরা আমায়| ··· মনে হয় এই সেদিন মাত্র খেলাঘর পেতে বসেছিলাম| কারো বোন, কারো দিদিমা, কারো মা, কারো মাসি হয়ে দিন কাটছিল| আজ সে পাট তুলতে সহজ মনে পারছি কই? [পৃ.১৪৫-১৪৬]

তথ্যসূত্রঃ

১. ভ্রামণিক বিমলা দাসগুপ্তা তাঁর 'কাশ্মীরে ক'দিন' গ্রন্থের সুচনায় বলছেন, "বিধি প্রসাদাৎ এমনি দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যথাকার সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" বলিয়া বিশেষ বিধির বিধান করিয়া গিয়াছেন এবং যথায় এই শাস্ত্রানুমোদিত বিধি পালনে গৃহস্থমাত্রেরই সম্যক্ নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।... নরোচিত সেই আচরণ চিরন্তন স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? '

বিমলা দসগুপ্তা, নরওয়ে-ভ্রমণ এবং কাশ্মীরে ক'দিন, সংকলনঃ অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৭, পৌষ ১৪১৪, দে'জ পাবলিশিং এবং স্কুল অব উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

২. বীণা দাস, শৃঙ্খল ঝঙ্কার, ভূমিকাঃ রবিন পাল, অগ্নিযুগ গ্রন্থমালা ১১, প্রথম র‍্যাডিকাল সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা

৩. শ্রী রানী চন্দ, জেনানা ফাটক, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জুন ১৯৮৩, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৪. চলি গো চলি গো যাই গো চলে, রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগ-বাউল, তাল-কাহারবা,রচনাকাল ২৩ ফাল্গুন ১৩২১ (ইং. ১৯১৫) বোলপুর থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে ট্রেনে গানটি রচিত হয়, স্বরলিপিকারঃ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

[ ৭ ]

## একা মেয়ের অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণ

এ এক ছোট্ট কিন্তু স্বাধীনপক্ষ আনন্দের অধ্যায়। আজকের এই একুশ শতকে মেয়েদের একাকী ভ্রমণ বা সোলো ট্রিপ তো খুব সহজেই ভেবে এবং বাস্তবে রূপায়িত করে ফেলা সম্ভব। বেড়াতে যাওয়ার আগে বাড়িতে বসেই সমস্ত ব্যবস্থা সারা হয়ে যায় আন্তর্জালে। আর সব একাকী ভ্রমণেই একটা না একটা অ্যাডভেঞ্চার, বলা ভালো রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতেই হবে। অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণের সেটাই যেন দস্তুর। আমাদের এই ভ্রমণকথার কথামালায় এমনি একটি সোলো বা একাকী ভ্রমণের উপভোগ্য অধ্যায় 'ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে' (প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, যদিও ভ্রমণকাল ১৯৭৭)। এই রোমাঞ্চকর অবাক ভ্রমণেরও কাণ্ডারী শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯), জোড়হাট সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা ডক্টর সেন এই পরিচয়ের বদলে এক অনন্ত অভিযাত্রিকের পরিচয়ই এই ভ্রমণে যাঁর পরিচিতি হয়ে উঠেছে ক্রমশ। বেড়াতে যাওয়ার আগে এখনকার মতো তখন কিন্তু কোনো হোটেল বুক করে যাননি নবনীতা। নবনীতা সেই সময়ের এক উজ্জ্বল স্কলার এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, প্রথিতযশা সাহিত্যিক। তাঁর বেশিরভাগ ভ্রমণের মতোই এই ভ্রমণটিও আধা স্কলারলি এবং প্রায় পুরোটাই রোমকূপ খাড়া করে দেওয়ার মতো উত্তেজনাকর। এই ভ্রমণের উদ্যোক্তাদের কথা ছিল নবনীতাকে কাজিরাঙা ঘুরিয়ে ফেরত পাঠাবার। কিন্তু নবনীতা দেবসেন ভ্রমণ করেন মনের ইচ্ছেয়, কর্তৃপক্ষের ইচ্ছেয় নয়। তাই নিজের মতো করে জঙ্গল লজের আতিথ্য নিয়ে সেই অতিথিনিবাসের কর্তার কন্যাকে নিয়ে হাতির পিঠে চড়ে, রোদ-বৃষ্টি-ব্রহ্মপুত্রকে সর্বাঙ্গে এবং মনের মধ্যে জড়িয়ে কাজিরাঙা ঘুরে নিয়ে তেজপুর ফিরে যাওয়ার পথে তাওয়াং নামের প্রেমে পড়া; আর তাওয়াং মনাস্ট্রি দেখার প্রবল প্রচন্ড আকুলিবিকুলি করা ইচ্ছের বশে ড. নবনীতা দেবসেন কারুর সাহায্য না পেয়ে স্রেফ ট্রাকে চেপে চলে গেলেন তাওয়াং! এতো তাড়াতাড়ি এক লাইনে নয়, এ গল্প বলতে হবে থেমে থেমে বুঝতে হবে এর মধ্যেকার বাঙালি মেয়ের অবস্থানের অন্দরের কথাগুলি।

শুরু করি সাহিত্যসম্মেলনে যাওয়ার পর্ব থেকে। এই ভ্রমণ কিম্বা আরো এক কনফারেন্স থেকে কুম্ভ ভ্রমণ নবনীতার ক্ষেত্রে সবই একাকী ভ্রমণ এবং নিজের কাজের সূত্রে কাজ ছাড়িয়ে ভ্রমণ। এর আগে মেয়েরা স্বামীর কাজের সূত্রে ভ্রমণ করতেন। কিন্তু বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু হল নিজেদের কর্মসূত্রে ভ্রমণ। তবে নবনীতা দেবসেন যেখানেই যান সেখানেই ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে নানান মজার বিভ্রাট। এক্ষেত্রেও তা প্রথামাফিক ঘটে গেল বাগডোগরা বিমানবন্দরে। দমদম থেকে বাগডোগরা গিয়ে জোড়হাটের বদলে আবারো দমদমের প্লেনেই চেপে বসেছিলেন। সহযাত্রী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের দিকপাল গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই। তিনি চলেছিলেন অসমেই অন্য কোনো সাহিত্য সম্মেলনে। দুজনেই কথার তোড়ে ভুল করে দমদমগামী বিমানে উঠে পড়ে আবারো নেমে যখন নির্দিষ্ট প্লেনে চড়লেন আশুতোষ বাবু এক্কেবারে স্পিকটি নট হয়ে রইলেন! বুঝেছেন এ মেয়ে তো মেয়ে নয় ইন্দ্রজাল নিশ্চয়!

এরপর জোড়হাটের দুরন্ত সাহিত্য সম্মেলন। অহমিয়া আর বাংলা সাহিত্য নিয়ে মাথা উঁচু আলোচনা এবং কাজিরাঙা ভ্রমণ। এই ভ্রমণে দেখা যাবে বাঙালি মেয়েরা কতখানি এগিয়ে আসতে পেরেছেন 'মাত্র' এক শতকের আগের মেয়েদের চেয়ে, সাহসে, ভাবনায় এবং কর্মের মাধ্যমে প্রচলিত সামাজিক নিয়মাবলীর বেড়া ভাঙায়, তবে তা বিগত শতকের পূর্বনারীদের অবদান কে ভুলে গিয়ে নয়। 'গৌরচন্দ্রিকা'য় নবনীতা বলেছেন,

নিশ্চয়ই সে মহাভাগ্যবতী যার না আছে হাতে পায়ে বেড়ি, না বুকের ভেতর চাবিতালা। মানুষের কাছে আমি অনেক পেয়েছি, প্রাপ্তির যেন শেষ নেই। এত সমাদর, এত অনাদর, এত ভালোবাসা, এত প্রতারণা জীবনের একূল-ওকূল ভাসিয়ে দিয়েছে যে, আমার মনে হয় আমার মতো সুখী সুভগা আর কে? [পৃষ্ঠা. ১০]

কাজিরাঙায় হাতির পিঠে চড়ে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ঘোরা। এ অনুভূতি বোঝানো অসম্ভব। নবনীতার লেখায় একটা বড় গুণ হল কিচ্ছু না লুকোনো, মনের ভাব , পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অবিকল ফুটে ওঠে। তাই সমাজের বাঁধন মুক্ত হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একাকী একাত্ম হয়ে ছোট্ট খুকুর মতোই খুশি হয়ে উঠেছেন। সর্বত্রই নিজের অবাধ ইচ্ছের কাছে ছেড়ে দিয়েছেন বিনা প্রশ্নে নিজেকে। এই ভ্রমণের ভেতর

ভ্রমণ (জোড়হাট- কাজিরাঙ্গা থেকে হঠাৎ তাওয়াং) তাও আবার বিশুদ্ধ ইচ্ছেশক্তির জোরে এটাই প্রমাণ করে শাসন না মানার হাওয়া মেয়েদের অন্তরে অন্দরে জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে। কে কিভাবে তাকে গ্রহণ করেছে বা করবে সেটা অবশ্যই ব্যক্তিগত শিক্ষা, পরিসর-বোধ, রুচি এবং পছন্দের প্রশ্ন। তবে মূল প্রশ্ন টা নারী-অধিকারেরই শুধু নয়, মানবাধিকারেরও। নারী আর শুধুমাত্র লিঙ্গপরিচয়ের গণ্ডীতে আটকে থাকা সত্তা নয়। একজন সচেতন মানুষ হিসেবেই সমাজে তার ভূমিকা স্বীকৃত এবং নির্ধারিত হওয়ার দিন এসে গিয়েছে।

কিন্তু এখনো বাস্তব পরিস্থিতি অন্য কথা বলে। অরুণাচলের পথে তাওয়াং যেতে হলে সরকারি পারমিট লাগে। অফিসে হত্যা দিয়ে ঘুরে হেঁটে যখন পারমিট ঠিক হলনা কিন্তু আর্মির রেশন ট্রাকে তাওয়াং যাওয়ার কথা হল সদ্য পাশ করে কাজে যোগ দেওয়া অতি লাজুক ডাক্তারের সঙ্গে, তখন আর নবনীতা কি ডরান কোনো নিয়মের কলকাঠিকে? বিভিন্ন সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য মাধ্যমে কাজ সারার জন্য অনেক অপেক্ষার পর শেষ পর্যন্ত নিজেই ফোন করে ফেললেন এডিসিকে নিজের পরিচয় দিয়ে। এখানে অবশ্য নবনীতার গুরুগম্ভীর অধ্যাপক এবং সাহিত্যসভার হোমরাচোমড়া প্রধান বক্তার পরিচয়েই কাজ হল! পারমিট এলো এবং সকলকে অবাক করে দিয়ে ভাসানের লরির মতো মালভর্তি (আলমারি, মুরগি, বস্তা এবং আরো অনেক কিছু) লরির ড্রাইভারের পাশের আসনে দিব্যি চড়ে বসলেন নবনীতা। আর ঠান্ডার দেশে যাচ্ছেন তাই নিজের শাল ছাড়া অন্য শীতপোষাক না থাকলেও অসুবিধে নেই পরিচিত, প্রায় পরিচিত , সদ্য এবং অর্ধ পরিচিতদের থেকে এরই মধ্যে সংগ্রহ করে ফেলেছেন ওভারকোট, বাঁদুরে টুপি, লম্বা মোজা, হাতকাটা সোয়েটার, ফুলহাতা কার্ডিগান, দস্তানা, মাফলার ইত্যাদি। এর সঙ্গে নিজের আছে বাক্স ভরা নানা রকম ওষুধ, 'ফুটানি কা থলিয়া' বা ভ্যানিটি ব্যাগ, বাটা থেকে নতুন কেনা স্নিকার্স, মস্তিষ্কে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর নিজে। গোপন অন্দরে আরো আছে অচেনাকে চেনার, অজানাকে জানার স্পর্শ করার আনন্দ, অপার স্বাধীনতার বোধ।

এইবার রেশন ট্রাকের পথ চলা শুরু। বড় বিচিত্র সহযাত্রী নিয়ে। মানচন্দ জাঠ ড্রাইভার, মাইলা নেপালী ক্লিনার। তারপাশে নবনীতা নিজের ব্যাগ ও কোট সমেত, এপাশে মিস্টার সেন নামক জনৈক মদ্যপ রেশন অফিসার আর তিন বছর আগে ডাক্তার হওয়া বছর ছাব্বিশের আর্মি ডাক্তার সিন্ধি, লেখকের ভাষায় 'লম্বু' ললওয়ানি সাহেব। দেখা গেল এই ডাক্তার ললওয়ানি তো ডাক্তার সেনকে মোটেই পাত্তা দেন না! নিজে থেকে কথা বলতে গেলেও এড়িয়ে চলেন! এদিকে বয়ঃজ্যেষ্ঠা নবনীতার কিন্তু দেখা হয়ে গেছে ডাক্তারকে বেশ হিন্দি সিনেমার নায়ক বচ্চনোচিত মনে হয়, তার চোখের মণির রং নীল! ভাবা যায় একশো বছর আগে পরে বাঙালি মেয়ের ভাবনায় আর তার প্রকাশে কতখানি তফাৎ হয়ে গিয়েছে! আগেকার ভ্রমণের সময় এক তো বাল্যে বিবাহিত মেয়েরা এভাবে ভাবতেও পারতেন না; নিজের স্বামীর দিকেই দিনমানে তাকাতে পারতেন না তাঁরা তো পরপুরুষ অতি বিষম বস্তু। সে সময় ডিভোর্স ছিলনা কিন্তু পতিত্যজিতা স্ত্রীরা ছিলেন, বাল্য বা যৌবনে বিধবারা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর মতো। তবে মূলস্রোতের মেয়েদের তুলনায় তাঁরা সংখ্যায় কমই ছিলেন। আর এই ১৯৭৭ এ ঘুরে ১৯৮৪তে প্রকাশিত হওয়া বইয়ে কি অবলীলায় লিখছেন নবনীতা নিজের ভাবনা! সমাজের রক্তচক্ষু তখনো ছিল চোরাগোপ্তা, তবে তা নিজের যোগ্যতায় নিজস্ব অর্থনৈতিক সহায়তার ঘেরাটোপে প্রতিষ্ঠিত নারীকে ততটা ঘাঁটাতে সাহস পায়না এই যা। তাছাড়া সর্বক্ষেত্রেই নবনীতা নিজের বাবা মা এবং মেয়েদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন, যা তাঁর জীবনের এক অতিবিশিষ্ট প্রাপ্তি। আজও পর্যন্ত এই দুর্দান্ত খুঁটিটির অভাবে কত মেধা অক্লেশে ঝরে যায়, প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তার উদাহরণ ভুরি ভুরি দেখা যায় চোখ মেললে।

এবার প্রথম রাত বমডিলায় থাকা। ঐতিহাসিক ম্যাকমাহন লাইন, যেখানে ইন্দো-চীন যুদ্ধে ১৯৬২ তে চীনা সৈন্যকে আটকে দেওয়া হয়েছিল। সেখানেই ইন্সপেকশন বাংলোয় নবনীতা বুকিং এর পরোয়া না করেই দিব্য চৌকিদারকে ম্যানেজ করে যোগাড় করে ফেললেন গদি-বালিশ-চাদর ও কম্বল! তদুপরি স্নানের গরম জল আর উষ্ণ গরম চা! যদিও পরে জানা গেছিল চৌকিদার তাঁকে মিসেস ললওয়ানি ঠাউরেছিল! সে তো এই সারা ট্যুরেই কেউ না কেউ তাঁকে মিসেস ললওয়ানি ভেবেই নিয়েছেন, যেন নামছাড়া কোনো সম্পর্কের অস্তিত্বই নেই সমস্ত ভারতবাসীর কাছে। দুই অপরিচিত সহযাত্রীর মধ্যে যে বন্ধুত্বের, স্নেহের এবং  শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে হৃদয়ের সুকুমার সম্পর্ক থাকতে পারে তা যেন এক বিরাট ভেলকি! আসলে মেয়েদের যে কোনো কিছুই সব্বার কাছে ভেলকি, এমনকি মেয়েদের কাছেও! এমন করেই পুরুষী স্বর, পুরুষী দৃষ্টি, পুরুষী ভাবনা কালে কালেই মেয়েদের মন আর মাথার চালক হয়ে বসেছে আঁট হয়ে, তাকে আর নাড়ায় সে সাধ্য কার? এই যে তাওয়াং যাওয়ার ব্যাপারটাই, এই হঠাৎখুশি ইচ্ছেটাই তো সমাজের চোখে স্বীকৃতি পাবে না , পায় না কোনোদিন। সমাজশাসকদের মতে এটা স্রেফ

উড়ণচণ্ডীপনা, স্রেফ খামখেয়াল। অথচ একই ইচ্ছে পুরুষের হলে তা অভিহিত হত অসীম জ্ঞানতৃষ্ণার আকুতি হিসেবে, মেয়েদের জন্য তা কেবল অন্যায় জেদ আর অপ্রয়োজনীয় সাহসের সংজ্ঞা। নবনীতা লিখতে বাধ্য হচ্ছেন,

পুরুষমানুষের অধিকার আছে, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে পদাঘাত করে সে পারে অন্য জীবন বেছে নিতে। তাতে অন্য পুরুষেরা ভীতিসূচক বা নিন্দাসূচক কিছু খুঁজে পাননা। এরকম ব্যক্তিগত বিদ্রোহ তো চিরকালই আছে। তাতে সমাজ সংসার কিছু ভেঙে যায়নি। দু চারজন খ্যাপাটে ওরকম থাকেই। --কিন্তু মেয়েমানুষ? ছিঃ। [পৃ. ৪৬ ]

এই ধিক্কারকে উলটো ধিক্কার জানাবার সাহস করেছেন নবনীতা। মনে রাখতে হবে এসময় পশ্চিমের নারী আন্দোলন বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে। নবনীতা নিজে পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা এবং ডিগ্রি অর্জন সমাপ্ত করেছেন, সেকালে যা বেশ দুর্লভ। এবং তারপর সংসারজীবনও তাঁর ইউরোপ আমেরিকায় ছিল বেশিরভাগটাই। ফলে মাথা উঁচু করে চলতে গিয়ে কাউকে ভয় পাওয়ার কথা মনেই আসেনি তাঁর কখনো। অবলীলায় তাই জানিয়েছেন উড়ণচণ্ডী মেয়েদের যে সমাজ ভালোবাসে না তা সে সমাজের অপ্রাপ্তি, মেয়েটির বা মেয়েদের নয়। একই পথক্লেশে পুরুষ আর নারীটির প্রতি আলাদা আচরণকারী সমাজের নিয়মের পরোয়া করেননা নবনীতা। তাই তিনি লাজুকতম ভীত চকিত ডাক্তারকে নিয়ে একঘরে রাত কাটিয়ে ফেলেন যেভাবে দুটি মানুষ এক ঘরে থাকে ঠিক সেই স্বাভাবিকতায়। যদিও ললওয়ানি সারারাত চিন্তায় ঘুমোতে পারেননি, ডাইনিং টেবিলের ওপর বসে বসে পা দুলিয়েছেন। নবনীতা বার বার গদিতে ঘুমোনোর অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও।

কাউকে পরোয়া করেননা বলেই নবনীতা এরপরেও ললওয়ানির সঙ্গে অন্য ট্রাক ধরে তাওয়াং পৌঁচেছেন, দিদি-ভাই এর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং কিমাশ্চর্যম ললওয়ানির কোয়ার্টারে সযত্নে তিনদিন আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। ফেরার সময় লাজুক ললওয়ানি মিল্ক মেইডের টিন গুঁজে দিয়েছে বাক্সে দিদির জন্য স্নেহ-উপহার। দিদিকে বাহাদুরের থেকে চেয়ে চামচে করে চেটে খেয়ে নিতে দেখেছিল কিনা ! এই সম্পর্ককে কোনো নামে কোনও বাঁধনে বাঁধা যায় কি? নবনীতা লিখেছেন,

না আমি পড়ি কারুর প্রেমে, না আর কেউ পড়ে আমার প্রেমে। কী বলছেন? বয়স হচ্ছে, মেয়ে বড় হচ্ছে, ও-সব কী কথা? বাহ দেবানন্দের বুঝি বয়স হচ্ছে না, কিশোরকুমারের বুঝি ছেলে ছোট্ট? কেবল আমারি বয়স হচ্ছে? এই যে এত ঘুরি, এ দেশ ও-দেশ, এ তীর্থ, ও কনফারেন্স, কোথাওই কি কোনোই সম্ভাব্য প্রেমিক লুকিয়ে থাকতে পারত না আমার জন্য? কিন্তু আমার স্বভাবদোষেই তা পারেনা। এখন কথা হচ্ছে গিয়ে কোনটা বেশি জরুরি? স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো না পরাধীন ভাবে প্রেম করা? প্রেমিকরা দারুণ পজেসিভ জীব হয়; প্রেমের হাজতে পুরে দেবে। ইচ্ছেমতো বিহার করা বন্ধ। তাই আমি সুপার-হিউম্যান লেভেলে প্রেমে পড়ি। কখনো গঙ্গার সঙ্গে কখনো হিমালয়ের। কখনো ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে, কখনো তিব্বতের। [পৃ. ৪৬-৪৭]

আর এই প্রেমের গুঁতোয় তাওয়াং মঠ দেখে ফেরার পথে দেখা পেয়ে যান মাকে সঙ্গে নিয়ে চাকরি করতে আসা বাঙালি ডাক্তার অবিবাহিতা স্বপ্না চৌধুরীর! অর্থাৎ বাঙালি মেয়েদের কাজের পরিধি বেড়েছে। যেন সমাজের অচেতনেই বিপুলায়তন হয়ে উঠেছে; নইলে পুরোনো জীর্ণ বাঙালি সমাজ এ ভাবনা ভাবতেই পারত না। মেয়েরা ভাবলেও তাকে জলজ্যান্ত সমাধি দিয়ে কর্তব্য (নারীর সুরক্ষা) পালন করা হত। এই প্রেমের নেশাতেই দেখা পেয়ে যান সুভাষ রঞ্জন ঘোষের আর কেবলি ছুটে ছুটে যান এগ্রিকালচারাল অফিসার ঘোষ সাহেবের সঙ্গে ইয়েশি আনির বাড়ি শিউ বস্তিতে তো কখনো মোম্পা উপজাতির পেমা খাণ্ডু লামার বাড়ি রাত কাটান, রকশি খান ! বাঙালি মেয়ের এই যে ফ্রি স্টাইল মদ্যপান পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে একাসনে বসে এমনটাও তখনো পর্যন্ত অ্যাডভেঞ্চারেরই অঙ্গ ছিল বটে! সমস্ত মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে তুড়ি মারার প্রক্রিয়া, যেটা আরো অর্ধ শতক আগে নবনীতা দেবসেনের মতো মানুষেরা করে গিয়েছিলেন বলেই আজকের মেয়েরা নিজেদের অস্থি-মজ্জায় এতোটা আগুন সহজে অনুভব করতে পারে।

তারপর আবার কলকাতা ফিরে আসা এবং ক্রমশ বই লিখে প্রকাশ করা এক নারীর ভ্রমণসুখ, যা নারীর নিজস্ব সঞ্চয়। এমন সঞ্চয় চিরায়তের। পরবর্তী কালের নারীবিশ্বের ভাবনায় নবনীতা দেবসেনের এই ভ্রমণকথাটি উষ্ণীষের মূল্যবান রত্নের মতো স্বমর্যাদায় উজ্জ্বল।

# খ. ভারতবর্ষের বাইরে ভ্রমণ

‘ভারতবর্ষের বাইরে ভ্রমণ’ এ পর্বে মূল ঝোঁকটিই ছিল লণ্ডন কে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ড তথা ইয়ুরোপের উপর। তাই বিলেত এবং বৃহত্তর অর্থে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্যুইতজারল্যাণ্ড, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে ইত্যাদি দেশ দেশ মিলিয়ে মেয়েদের ইয়ুরোপ ভ্রমণের খতিয়ান ধরা রইল এই অধ্যায়ে।

**[ ১ ]**

## বিলেত এবং ইয়ুরোপ ভ্রমণ

বিলেত বিষয় টা উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত বাঙালি সম্প্রদায়ের কাছে এক মহান প্রতর্ক| লণ্ডনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাঙালির ইয়ুরোপ ভাবনার মধ্যে দুটি ভাবধারা সে সময় সমান্তরালে বয়ে যেত। এক, বিলেত প্রভুর দেশ, সে দেশ থেকে তাদের মতো করে শিক্ষালাভ করে এলে এদেশে ব্রিটিশ প্রভুর শাসন ঘুচানো সম্ভব হলেও হতে পারে বা অন্তত তাঁদের সমমর্যাদা লাভ করা যেতে পারে ব্রিটিশ এবং আপামর বাঙালি সমাজের কাছে। দুই, বিলেত আসলে কেমন, যেখান থেকে এমন দোর্দোণ্ডপ্রতাপ শাসকের জন্ম? সেটা চাক্ষুষ এবং অভিজ্ঞতার অন্তর্গত করা একান্ত জরুরি। তাদের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার, ধর্ম এবং বিজ্ঞান শিক্ষা সবই জানা জরুরি। আবার সেটা জানা হলেই কিছু মানুষের (মূলত ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির) একটা ধারণা গড়ে উঠছিল, ছোট এবং বড় ইংরেজ বিষয়ে। দেশীয় শাসকের ভূমিকায় অত্যাচারী ছোট ইংরেজ, কিন্তু তাদের নিজেদের দেশে উদার স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক বড় ইংরেজ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এমন তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। মনে হয় শাসকের শোষণের দিকটিকে মান্যতা দেওয়ার আগে শিক্ষিত বাঙালি আপ্রাণ চেষ্টা করছিল শাসককে মনোমতো করে নেওয়ার। তাই পরাধীন ভারতবাসী মধ্যবিত্ত নব্য ইংরেজি শিক্ষিত বাবু সম্প্রদায় নিজেদেরকে ইংরেজের অনেকটা কাছের মনে করতেন সে সময়, এবং পূর্বজ ইংরেজি অশিক্ষিত বা সমকালীন ইংরেজি না জানা শ্রেণীকে ‘অপর’ (The significant other) বলে চিহ্নিত করতে শুরু করেছিলেন। বলা বাহুল্য ইংরেজই এই অসদ্ বুদ্ধির উদগাতা। এই বিশেষত্বপূর্ণ অপরের বিষয়ে সীমন্তী সেন তাঁর সন্দর্ভগ্রন্থ “Travels to Europe Self and Other in Bengali Travel Narratives 1870-1910”-এ যা বলছেন আমরা একবার দেখে নিতে চাই,

Turning to the late-nineteenth-century Bengali travelers, we pass from this perceptional fluidity to a clearly defined ideological mould indicating clear locations of the ‘I’ and the ‘Other’. With the increasing penetration of colonial power through its ever-expending administrative and educational network, a generation of indigenous literati had been bred. The mental world of this generation was created and structured through a thoroughgoing and systematic representation of the Western self-image. This was the emerging middle class, who, chose the British Rule out of their ‘own free will’ or out of ‘love’ that had a significance that ran into their whole conception of living. The British empire, with its whole edifice of the ‘science of state’, stood for a culture that appeared infinitely more equipped to negotiate with the realities of the world than anything that the new middle class had learnt to identify as their own. Western cultural colonization, as we know, implied the universalisation of a particular world view by negating and nullifying a very great range of beliefs and sensibilities in the non-European world. Within the parameters of the absolutist truth claims of Enlightenment rationality, ‘Science’ became a gospel, a culture in itself. Science was the modernity that created the pathway of a temporally linear, mono-directional story of progress. And as this ideology

came in tandem with British rule, our late-nineteenth century Western-educated colonised elite, bred through Macaulayan pedagogy, saw scientism as synonymous with their mentor's civilization. [page: 54-55] [1]

ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মোক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিলেত। তবে সকলেই প্রায় শিক্ষালাভ ও ডিগ্রী অর্জন শেষে দেশে ফিরে এসে ব্রিটিশ শাসকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়ে একটি ভারতীয় সাহেবি সমাজ গড়ে তুলেছিলেন যাঁদের বিলিতি চাল অনুকরণপ্রিয়তা ছিল পূর্ণমাত্রায়, বিলিতি ব্যবস্থায় সামাজিকতা ছিল স্বাভাবিক, কিছু উদারতা ছিল স্বসমাজভুক্ত মানুষের প্রতি কিন্তু সকলেরই অন্তর্দৃষ্টি ছিল না। সকলেই দেশীয় আবেগে পূর্ণ ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে বিলেতের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের সাজানো অন্তঃপুরটুকু ছাড়া বিশেষ ভাবে সমস্ত বাঙালি সমাজের আধুনিকায়ন সবাই করতে চাননি। সকলেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা এই কারণেই বিশেষভাবে এখানে বলা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি, কারণ বিলেতের যা কিছু সুসভ্যতার আলোক তা তিনি প্রথমে নিজের পরিবারে এবং ক্রমশ বাঙালি সমাজের মধ্যে প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। নারীস্বাধীনতার অন্যতম প্রাণপুরুষ সত্যেন্দ্রনাথ এ কথা বললে একটুও ভুল বলা হয়না। তাঁর সহধর্মিণীও মানসিক এবং সামাজিকভাবে তাঁকে সমানরকম সহায়তা করেছেন সবরকম লোকনিন্দার ভয়কে তুচ্ছ করেই। জ্ঞানদানন্দিনীদেবীকে নিজের মনোমতো মানসী রূপে গড়ে নিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তারপর কিভাবে দুজনেই এমনকি বিশেষ বিশেষ অসহযোগ পরিবারের অন্দরেই সহ্য করে লাল টুকটুকে দিন আনার ভাবনা কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন তা আমরা অন্য অধ্যায়ে দেখেছি। তাই জ্ঞানদানন্দিনীর কথা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের আলোচনায়। যদিও তিনি আলাদা করে কোনো ভ্রমণকথা লেখননি, তবে তাঁর সংক্ষিপ্ত বিলেতবাস এবং তার আগে বিলেতযাত্রার দুঃসাহসিকতার ছবি ধরা আছে তাঁর স্মৃতিকথা 'পুরাতনী'তে। একে আমরা তাই ট্রাভেল এক্সপেরিয়েন্স বা ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা বলতে পারি।

আর এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা এবং ভ্রমণ কাহিনী-এই দুয়ের সাধারণ অংশটি হল ভ্রমণ। তাই ভ্রমণের যে আলোচনাবিন্দুতে এই মুহূর্তে আমরা জোর দিতে চাইছি, তা হল দুঃসাহসিকতা। যা স্বামীর ভরসায় এবং প্ররোচনায় তিনটি ছোট ছোট সন্তানের হাত ধরে এবং আরো একটি সন্তানের আগমন সংবাদ সহযোগে ঠাকুরবাড়ির বধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেখাতে পেরেছিলেন। যদিও একদম ছোটটি লণ্ডনে গিয়ে এবং অপর সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েক মাসে পরই মারা যায়, কিন্তু শারীরিক মানসিক এবং সর্বোপরি সামাজিক বাধা তাঁর দৃঢ়তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ব্যক্তিগত অসামান্য ক্ষতি স্বীকার করেও বাঙালি মেয়েরা সমস্ত বাংলার সমাজ এবং বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে দরজা খুলে দিতে চেয়েছেন। এটা এই পর্বের আলোচনায় আমরা বারে বারেই দেখতে পাবো। এবং খুব অভুতপূর্বভাবে কয়েক দশকের মধ্যেই একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর বাঙালি মেয়েদের মধ্যে বিলেত যাওয়ার পথ অত্যন্ত সুগম হয়ে উঠেছিল যেভাবে, সে বিষয়েও আমরা আলোচনায় ফিরব। কিন্তু আপাতত জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' [২] (১৯১৫) বইতে লিখেছিলেন,

আমি ছোটবেলা থেকেই স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেকসময় ধমকাইতেন, "তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মতো গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি নাকি?"

বলাই বাহুল্য এই 'অঘটন' ঠাকুরবাড়ি থেকেই ঘটানো হয়েছিল। ১৮৫৯ এ নয় বছরের বালিকা জ্ঞানদানন্দিনীকে বিবাহের পর থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ নিজের ইচ্ছেমতো তাঁকে গড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর স্বাভাবিকভাবেই সে কারণে পারিবারিক শাসনতন্ত্রের খাঁড়ার ঘা সহ্য করতে হয়েছিল জ্ঞানদানন্দিনীকে। স্বামীকে লেখা জ্ঞানদানন্দিনীর বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে জানা যায় শাশুড়ি তাঁর সঙ্গে ভালো করে কথা বলতেন না। আলাদা আলাদা থাকতেন, অন্য বৌদের আদর করতেন। বৌ মানুষের স্বাধীনতার ইচ্ছে তাঁর অপছন্দ ছিল। এমনকি একটি চিঠিতে বিলেত (১৮৬২-১৮৬৪ বিলেতবাস সিভিলসার্ভিসের পরীক্ষার জন্য) থেকে সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনীকে পরম পূজনীয় বাবামশায় সম্পর্কে লিখেছেন,

বাবামশায় চান আমি যেন অন্তপুরের মানমর্য্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি, অর্থাৎ তোমাকে চিরজীবনের মতো চারি প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি। [৩] [লন্ডন, ২ জুলাই ১৮৬৪]

সত্যেন্দ্রনাথের ভাবনায় আক্ষেপ এবং দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সত্যেন্দ্রনাথই আরো প্রায় দেড় দশক পর জ্ঞানদানন্দিনীকে উদ্বুদ্ধ করবেন প্রথমবার কালাপানি পার হতে ১৮৭৭ সালে। এর আগে বেশ কয়েকজন বাঙালি মেয়েই বিলেতে গিয়েছেন, কিন্তু তা ছিল তাদের শৈশবকালের পারিবারিক সিদ্ধান্ত। তাঁরা বেশিরভাগই সমস্ত পরিবারের শিকড় শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে বিলেতে গিয়ে বসবাস করছিলেন। যেমন রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় বা অরু দত্ত তরু দত্তের পরিবার। ক্ষেত্র দত্ত তাঁর মেম স্ত্রী-কন্যা সহ বিলেতেই থেকে গিয়েছিলেন সেসময়। গুডিভ সূর্যকুমার চক্রবর্তীর পরিবারও লন্ডনেই থিতু হয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির একটি শাখা পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর স্ত্রীর মৃত্যুর পর রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং লন্ডনে দুটি কন্যা সহ বসবাস করছিলেন। তিনিও বিধর্মী স্ত্রী গ্রহণের কারণে ত্যাজ্য হয়েছিলেন পরিবার কর্তৃক। এই তথ্য থেকে সে সময়ের কলকাতার মূলস্রোতের হিন্দু পরিবার গুলির গোঁড়া সামাজিক ধর্মীয় এবং মানসিক অবস্থান এর একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। বর্তমানের হুজুগে বাঙালির ট্যাগ খুব সহজে সে আমলের বাঙালিদের প্রতি আরোপ করা যায় না। অবশ্যই রেনেসাঁর আলোকায়ন এই অবস্থার পরিবর্তনের ধ্বজা বহন করেছে। কিন্তু তার আগে প্রদীপের নীচে আছে গাঢ় কালির ইতিহাস, যা সবচেয়ে বেশি দলন করেছে বাঙালি মেয়ের ভাগ্য।

১৮৭৭ এ জ্ঞানদানন্দিনী তিন শিশুসন্তান নিয়ে একাকী বিলেত পাড়ি দিলেন, সত্যেন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছেয়। সঙ্গে 'নীচজাতীয়' সুরাটি ঝি চাকর। এই জ্ঞানদানন্দিনী আগের মত ব্রীড়াশীলা নববধূ নন। এইসময় নিজের এবং অন্যদের অভিভাবক জ্ঞানদানন্দিনী স্বয়ং। বাঙালি মেয়ের এই স্বয়ং অভিভাবকত্বের ধারণা সেসময় কেনো আজও কিছুতেই সমাজ-অনুমোদিত হতে চায়না। তাই সত্যেন্দ্রনাথের ভাবনাকে আমরা কুর্নিশ জানাতে বাধ্য। মনে ভয় আশঙ্কার দোলাচল থাকলেও নতুন দেশ দেখার আনন্দ ও ছিল সমপরিমাণ। জ্ঞানদানন্দিনী 'পুরাতনী' তে জানিয়েছেন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁদের নিতে এসেছিলেন জাহাজঘাটে। নিজে পরিবারের বিরুদ্ধাচারণ করলেও জ্ঞানেন্দ্রমোহন সত্যেন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাতে পারেননি। তাঁর দুই কন্যা বলেন্দ্রবালা ও সত্যেন্দ্রবালা। এঁরা হয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনীর এবং শিশুগুলির সহচরী। এই ঠাকুর পরিবারেই বেশ কিছুদিন ছিলেন সকলে। এখানে প্রবাসী বাঙালি পরিবারের ছবি তুলে ধরেছেন জ্ঞানদানন্দিনী, মেয়েদের ইংরেজি পোষাক, অনেক বয়স পর্যন্ত বিয়ে না হওয়া ইত্যাদিই এসেছে সেই ছবিতে।

এরপর শুরু হয় জ্ঞানদানন্দিনীর সংসার। স্বাধীন সংসার বিলেতে। প্রায় আড়াই বছর তাঁরা বিলেতে ছিলেন। এর মধ্যে জ্ঞানদানন্দিনীর দুটি সন্তানই মারা গিয়েছে। ১৮৭৮ সালে সেপ্টেম্বরে সত্যেন্দ্রনাথ ফার্লোর ছুটিতে লণ্ডন যান রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে। এসময় জ্ঞানদানন্দিনীরা বসবাস করছিলেন ব্রাইটনে। এখানে প্রায়ই আসতেন ক্ষেত্র দত্তের কন্যা মেবেল দত্ত এবং গুডিভ সূর্যকুমারের কন্যা অ্যানি চক্রবর্তী। এই মেবেল দত্তের সঙ্গে পরে তারকনাথ পালিতের বিবাহ হয়, যাঁদের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ পালিত বা লোকেন পালিত আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। অ্যানি চক্রবর্তীর মা ও বাঙালি ছিলেন না, জ্ঞানদানন্দিনীর মতামত অনুসারে 'মালয়-ফিরঙ্গী'... বোঝা সম্ভব বাঙালির চিরাচরিত সমাজব্যবস্থায় আঘাত আসতে আরম্ভ করেছিল। ছেলেরা অন্য জাতে অন্য ধর্মে বিবাহ শুরু করেছিলেন। এবং তার জন্য পরিবারকে ত্যাগ করতেও পিছপা হননি। ক্রমশ মেয়েরাও নব্য জীবনধর্মের দীক্ষায় দীক্ষিত স্বামীদের সঙ্গে সমান ভাবে নিজেদের জীবন ভাগ করে নিতে শিখেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনীর লেখা [৪] থেকে জানা যায় ইংরেজ রীতিতেই তাঁরা চলতেন, পার্টি হত, পানভোজনাদি চলত। মদ্যপানের রেওয়াজ ছিল এবং তাতে স্বাভাবিকভাবেই কোনো বাধা আসেনি। যা দেশের অন্দরমহলের আবহাওয়ায় মেয়েরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। বাঙালি সমাজ সর্বদাই মেয়েদের উপর অনাচার আর পাপবোধের ধারণা চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত। পদে পদে বেড়ি নিয়ে আজও মেয়েদের নানা ক্ষেত্রে বেঁচে থাকতে হয়, কারণ সামাজিক এবং মানসিক অগ্রগতির ধারণা আসলেই আপেক্ষিক। পরিবেশ, পরিবারভুক্ত মানুষ, তাদের মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর তফাতে স্বাধীনতা এবং ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভরশীল। যে কারণে কলকাতায় ফিরে ক্রমে ক্রমে জ্ঞানদানন্দিনীরা পারিবারিক আড় ভাঙতে পারলেও কলকাতা থেকে স্বামীর সঙ্গে ইংল্যান্ডে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে নিতে কৃষ্ণভাবিনী দাস কিছুতেই পারিবারিক শাসনের দণ্ডভোগ এড়াতে পারেননি।

আমরা আমাদের প্রথম মহিয়সীর কথায় আসব, যিনি প্রবল দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন (সকলের প্রতি অসহায় সম্মান বজায় রেখেই) এবং যাঁর জীবন প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া-স্রোতে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা জ্ঞানদানন্দিনীর স্বামীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পর স্বামীর ভালোবাসায় স্বামীকে পাশে পেয়ে বিলেত যাওয়ার এবং চিরজীবনের মতো সন্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার তীব্রতম যন্ত্রণাকাতর অধ্যায়টিতে প্রবেশ করছি।

একটি আজীবন সংগ্রামের নাম কৃষ্ণভাবিনী দাশ। তাঁর মতো করে বিক্ষুব্ধ জীবনযুদ্ধ কাউকে লড়তে হয়নি। এমনকি জ্ঞানদানন্দিনীকেও না। দুজনেই সন্তান হারিয়েছেন, কিন্তু অনেক খানি তফাৎ ছিল দুজনের পরিস্থিতি এবং জৈবনিক অভিজ্ঞতায়। এক ঈপ্সার তাড়ণা ছিল কৃষ্ণভাবিনীর মধ্যে। ঘরের বদ্ধ চার দেওয়ালের বাইরের পৃথিবীর রং রূপ গন্ধ স্পর্শ কেমন তার ছোঁওয়া লেগে নিজের জীবনের রং রূপ কিভাবে বদলে যায় বা আদৌ বদলে যায় কি না এই তত্ত্ব জানার আগ্রহ ছিল কৃষ্ণভাবিনীর প্রবল ভাবে। তার মাশুল ও দিতে হয়েছে প্রবল ভাবে তাঁকে, যা অন্য কোনো ভ্রামণিককে দিতে হয়নি। বিশেষ করে কৃষ্ণভাবিনীর জীবনকথা জানতে হবে এই কারণেই মেয়েদের বিলেতভ্রমণ বিষয়ে , কেননা তার মধ্যে সাধারণ বাঙালি সমাজের মানসিক ছাঁচ স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। এমনকি শিক্ষার অস্ফুট আলোও তাকে আলোকিত করতে পারেনি। কৃষ্ণভাবিনীর ঈপ্সার ফসল হল বাঙালি মেয়ের লেখা প্রথম বিলেতভ্রমণ কাহিনী, "ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা"[৫] (১৮৮৫ তে প্রকাশিত)। বইয়ে তাঁর নিজের নাম ছিল না। লেখা ছিল প্রচ্ছদে, "বঙ্গমহিলা-প্রণীত"। সেসময়ের মেয়েদের লেখা প্রচুর বইয়ে বঙ্গমহিলা, বঙ্গনারী ইত্যাদি নাম দেখা যায়। কতটা পারিবারিক এবং সামাজিক চাপ থাকলে সমষ্টির আড়ালে নিজেকে লুকোবার এই রীতি মেয়েরা গ্রহণ করেছেন বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না। এ যেন এক সামাজিক ঘোমটা; সোশ্যাল কার্টেন| যার সাহায্যে নিজেকে আর পরিবারকে লুকিয়ে রেখে মেয়েরা নিজেদের খোলা মনের কথা খোলাখুলি বলছেন, আলোচনা করতে চাইছেন। নিজেদের সামগ্রিক এবং খুঁটিনাটি দেখাকে তাঁরা একেবারেই সমসাময়িক অভিভাবক বা অনভিভাবক পুরুষের দেখার সঙ্গে মেলাচ্ছেন না। বলা যায় একটা আলাদা নারীদৃষ্টির ছাঁকনি প্রতিটি ভ্রামণিক নারীর মধ্যে স্বতঃই অবস্থিত ছিল। যা তাঁদের অনুভব এবং লেখনীকে প্রভাবিত করেছে, পূর্ণ করেছে। কৃষ্ণভাবিনীর ভ্রমণকথায় এবং তার আগে তাঁর জীবনকথায় এর উদাহরণ সহজেই দেখা যাবে।

১৮৬৪ সালে (মাস জানা যায় না যদিও) কৃষ্ণভাবিনীর জন্ম হয় নবদ্বীপের চুয়াডাঙ্গায় কিম্বা কাজলা গ্রামে অথবা বহরমপুরের চোয়া গ্রামে;সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরাও স্থির নিশ্চিত নন , যদিও কৃষ্ণভাবিনীর স্বামী দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে 'কাজলানী' বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মজৈবনিক স্মৃতিচারণ "পাগলের কথা"য়[৬]| কিন্তু মেয়েদের প্রতি সমাজের সার্বিক এই উপেক্ষার মধ্যেও একটা বিষয় জানা যায় যে কৃষ্ণভাবিনীর হাতেখড়ি সম্পন্ন হয়েছিল। মেধাবী এই মেয়েটির মাত্র দশ বছর বয়সে বিয়ে হয় কলকাতায় বিদ্যাসাগরের বন্ধু, পেশায় হাইকোর্টের উকিল শ্রীনাথ দাসের মধ্যম তনয় দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে। দেবেন্দ্রনাথ বাড়িতেই কৃষ্ণভাবিনীকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। পরবর্তীতে কৃষ্ণভাবিনী তাঁর ব্যক্তিগত সুচেতনার তাগিদে নিজেকে আরো শাণিত, তীক্ষ্ণধী করে গড়ে তোলেন; তা সেটা কেবলমাত্র নিজের কারণে নয়, সামগ্রিক বঙ্গমহিলার হয়ে অসি থুড়ি কলম চালানোর দায়বদ্ধতায় নিয়োজিত হয়ে। এই পাঠাভ্যাসের ফলে কোনো ডিগ্রী না থাকা সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। আর এই পাঠাভ্যাসের ফলেই প্রথম থেকেই গড়ে ওঠে কৃষ্ণভাবিনীর স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছে, যাকে শুধুমাত্র নারীবাদের প্রকরণে ফেলে কাজ শেষ করে দেওয়া যায়না। কৃষ্ণভাবিনী চেয়েছিলেন আপামর বাঙালি মেয়েদের সমাজ কর্তৃক প্রতিমাপূজার কাঠামো হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে; তাই তিনি মেয়েদের জন্য নারী কিংবা দেবী নয়, মানুষের মর্যাদা চান, চান পুরুষের সমান ক্ষমতাশালী মানুষের তক্মা আদায় করতে| কিন্তু আপাতত প্রসঙ্গান্তর। কৃষ্ণভাবিনীর প্রথম জীবন কালাপানি পেরোনোর তথাকথিত 'দুঃশীলতায়' মগ্ন। আর এখানেই ধরা পড়বে উনিশ শতকের বাঙালিনীর'স্বাধীনতাকামী ঈপ্সার' রূপরেখা। 'পথি নারী বিবর্জিতা' – সমাজের এই বিষবড়ি নির্দ্বিধায় এবং বিনাবিচারে গিলতে না চাওয়ার ছোট্ট একটা স্ফুলিঙ্গ থেকে বড়সড় একটা লঙ্কাদহন পালার উদ্যোগ করলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস, যখন তাঁর স্বামী বিলেতফেরত দেবেন্দ্রনাথকে সমাজে একঘরে করলেন তাঁর শ্বশুর শ্রীনাথ দাস। বোঝা সম্ভব কতখানি প্রতিক্রিয়াশীল পরিবার কৃষ্ণভাবিনীকে বেড় দিয়ে রেখেছিল। দেবেন্দ্রনাথ যে সময়ে বিলেতে ছিলেন (সিভিলসার্ভিস দিতে পারেননি বয়স সামান্য বেশি হয়ে যাওয়ায়) সেসময় কৃষ্ণভাবিনীর কনিষ্ঠ পুত্রটি মারা যায়। দুই ছেলে মেয়ের একজনকে হারিয়ে মনের দিক থেকে কৃষ্ণভাবিনী সেসময় বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন| কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তখন আসতে পারেননি এবং চিঠি লিখে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া তাঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভবও ছিল না। শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধ আবহে কৃষ্ণভাবিনী কন্যা তিলোত্তমাকে বুকে নিয়ে বাঁচছিলেন একা। তাই কন্যার পাঁচ বছর বয়সে স্বামী বিলেত থেকে ফিরে আসার পর পরিবার তাঁকে ত্যাগ করলেও কৃষ্ণভাবিনী স্বামীর পাশে দাঁড়ালেন। অন্য একটি বাড়িতে উঠে গেলেন। যদিও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রইল। দেশীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি দেবেন্দ্রনাথের শুভকারী মনে না হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলেত যেতে উদ্যত হন। এইবারে কৃষ্ণভাবিনী সরাসরি তাঁর

পক্ষাবলম্বন করলেন; নিজেও স্বামীর সঙ্গে ইংল্যান্ড যাবেন মনস্থ করলেন কোনো বিরোধিতাকে আমল না দিয়ে। নারীর এই স্বেচ্ছার সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদাহরণের এটি এক মোড় ঘোরানো ইতিহাস। কৃষ্ণভাবিনী নিজেকে বিলেত যাওয়ার উপযোগী করে তুললেন। কিন্তু গোল বাঁধল সাত বছরের কন্যা তিলোত্তমাকে নিয়ে। শ্বশুর শ্রীনাথ দাসের তীব্র বিরোধিতায় কৃষ্ণভাবিনী-দেবেন্দ্রনাথকে মেয়ে ছাড়াই দ্বিতীয় এবং শেষবারের জন্য লন্ডন রওনা দিতে হল। আদতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রীনাথ দাস তাঁর বড়ো ছেলে উপেন্দ্রনাথের বিধবাবিবাহ (উপেন্দ্র-সরোজিনী[৭] শ্লেষাত্মক নাটক এঁদের নিয়েই লেখা) মেনে নিতে পারেননি, ছোট ছেলে জ্ঞানেন্দ্রনাথের উগ্র নারী স্বাধীনতার ঝাঁজ মেনে নিতে পারেননি। আর এঁদের সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণভাবিনীর বিদ্রোহী সিদ্ধান্ত। ঘরের বউ-এর এতখানি স্পর্ধার প্রকাশ স্বাভাবিকভাবেই ১৮৮২-তে শ্রীনাথ দাসের মেনে নেওয়ার প্রশ্নই ছিল না। যদিও এর এক দশকেরও আগে অরু ও তরু দত্ত য়ুরোপে চলে গিয়েছেন, আর স্বামীর ইচ্ছেয় জ্ঞানদানন্দিনী যাচ্ছেন বিলেতে কৃষ্ণভাবিনীর কাছাকাছি সময়েই (১৮৭৭)। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনীর ক্ষেত্রে এই উদার সমাজ পরিসর তাঁর সহায়তার জন্যপ্রস্তুত ছিল না, যা ছিল ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়ায় বা রামবাগানের দত্ত পরিবারের অরু-তরুর ক্ষেত্রে তাঁদের খ্রিষ্টীয় পারিবারিক সংগঠনে।

এরপর বিলেত গেলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণভাবিনী। কিন্তু পরিবারের কর্তা শ্রীনাথ দাসের হস্তক্ষেপে কৃষ্ণভাবিনীর কন্যাকে নিয়ে যেতে পারলেন না। ভেবেছিলেন পরে কখনো এসে নিয়ে যাবেন বা অন্য কোনো ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালি শ্রীনাথ দাস তাঁর নাতনি তিলোত্তমার বিবাহ দিয়ে দিলেন দশ বছর বয়সে বাবা মায়ের অনুমতি ছাড়াই এক ধনী সন্তান কুপাত্রের সঙ্গে। কৃষ্ণভাবিনীর মেয়েকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল। যে স্বাধীনতা তিনি অর্জন করেছিলেন নিজের এবং পরবর্তী প্রজন্মের মেয়েদের জন্য, দুর্ভাগ্যবশত তাঁর নিজের কন্যাই তার স্বাদ পেতে পারেনি। মেয়েটি অকালে মারা যায়। ১৮৯০তে কৃষ্ণভাবিনী দেশে ফেরেন। মেয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না মা বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। কিন্তু মেয়েটির সন্তান মারা যাওয়ার পর স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করলে স্বামীপরিত্যক্তা কন্যাকে বুকে তুলে নেন কোনো বাধা না মেনে কৃষ্ণভাবিনী। কন্যা তিলোত্তমার অভিমান কিন্তু মায়ের প্রতি আমৃত্যু বজায় ছিল। মায়ের লেখনীর গুণ কন্যাতেও বর্তেছিল, এবং তিলোত্তমা কবিতায় নিজের কথা লিখে গিয়েছে। সেখানে প্রতি ছত্রে তার মায়ের ওপর দোষারোপ এবং অভিমান। তার নিজের জীবন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য কৃষ্ণভাবিনীর স্বার্থপরতাকেই সে দায়ী করেছে। অদ্ভুত ভাবে যে পিতামহ এই বিধ্বংসী অন্যায়ের কারণ তাঁকে কিন্তু কখনো একবারের জন্যও দায়ী করেনি তিলোত্তমা দাসী। মা আর মেয়ের ব্যক্তিগত শিক্ষায় কয়েক যোজন তফাৎ হয়ে গিয়েছিল বোঝা যায় তদের নামের প্রকরণ থেকেও। কৃষ্ণভাবিনী দাস আর তাঁর কন্যা তিলোত্তমা দাসী যেন নিজেদের জীবন দিয়ে আপনি এবং অপরের (self and others) তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করে যান। নারীস্বাধীনতার লক্ষ্যে মায়ের এই আত্মত্যাগ মেয়ের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসেনি। মায়ের প্রতি বিষবাষ্পপূর্ণ আলোচনাই সে শুনেছে তার গঠনমূলক বছরগুলিতে। সুবর্ণলতা উপন্যাসে যেমন সুবর্ণকে বারে বারে শ্বশুরবাড়িতে শুনতে হত মা কত খারাপ, মা চলে গেছেন সংসার না করে হয়তো তিলোত্তমাকেও তাইই শুনতে হয়েছে পিতামহের কাছে, বিবাহের পর স্বামীর পরিবারে ক্রমাগত। আর মেয়েটি যেহেতু শিক্ষার আলো একেবারেই পেতে পারেনি সে ও মাকে সমান ভাবেই দায়ী করেছে তার জীবনের অন্যায় অঘটনের জন্য। তার ভাবনার ক্ষমতা ছিল সেটা তার লেখা পড়লে জানা যায় কিন্তু সেই ক্ষমতায় শিক্ষা এবং মননের আলো এসে পড়েনি সেটাও তার লেখায় প্রকাশ পায়। এটাই ছিল কৃষ্ণভাবিনীর জীবনের বিপুল ট্রাজেডি। এমনই ট্রাজেডি ক্রমশ তাঁকে বাধ্য করেছিল সমস্ত সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে। তিনি ক্রমশ নিজেকে একা করে নেন। যে নারী বিলিতি গাউন পরে মাত্র কবছর আগেই বিলেত গিয়েছিলেন সেই নারী, ১৯০৯ এ স্বামী এবং একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে সাদা থান পরে প্রবল কৃচ্ছ্রের সাধনে আত্মমগ্ন হন। কোনো পাপবোধ তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল তা জানা যায় না কিন্তু নিজেকে বিদগ্ধ মন্ডলীর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে তিনি যে প্রায়শ্চিত্তের আগুন নিজের মনে জ্বেলেছিলেন তা স্পষ্ট প্রতীয়মান এতকাল পরেও। ১৯১৯ এ কৃষ্ণভাবিনী মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর মডার্ণ রিভিউতে লেখা হয়, “ Hindu lady: with the selfless, pure, and unostentatious devotion of the typical Hindu widow, she combined the method, the energy and the spirit of active social service of the West.”[৮] তিনি সমকালের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মেলবন্ধনের একটি নিদর্শন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু রেনেসাঁ যুগের প্রগতির ভাবনা থেকে সরে গিয়ে তাঁর শেষ জীবনের নীরবতায়, চিরায়ত সংস্কারের আরাধনায় প্রথমজীবনের বিদ্রোহমুখর সত্তাকে ডুবিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া থেকে বুঝে ওঠা সম্ভব বাঙালি সমাজের স্থিতিস্থাপকতা খুব মনমোহক অবস্থায় ছিল না।

সামাজিক চাপের প্রাবল্যের কাছে তিনি শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করলেও তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনী অবিনশ্বর হয়ে রয়ে গিয়েছে। বইটি এতোকাল পরেও যে কোনো মানুষ কে স্বাধীনতার স্বাদ দিতে সদর্থক ভূমিকা পালন করে। এখানেই জিতে গিয়েছেন কৃষ্ণভাবিনী, হেরে গিয়েছে তাঁর সময়কার সামাজিক প্রথা। ১৮৮২তে কৃষ্ণভাবিনী ইংলণ্ড যান এবং ১৮৮৫তে বই প্রকাশিত হয়। বইটিতে মোট ২০টি অধ্যায়। যথাক্রমে, 'পূর্বকথা', 'কলিকাতা হইতে বোম্বাই', 'বোম্বাই হইতে বেনিস', 'বেনিস হইতে লণ্ডন', 'নানাপ্রকার চিন্তা', 'লণ্ডন', ' ইংরাজ জাতি ও তাঁহাদের প্রকৃতি', 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার সংসার', 'লণ্ডনে প্রদক্ষিণ', 'ইংরাজ মহিলা', 'রাজবাটী-ক্লব-যাদুঘর-নাট্যশালা-মদ্যশালা ইত্যাদি', 'ইংরাজী বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবন', 'মদ না গরল', 'ইংলন্ডের অন্তর্ভাগ-চাষা ও জমীদার-এদেশের জলবায়ু', 'শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা', 'ইংরাজদের ধর্ম ও মহোৎসব', 'স্বাধীন ইংরাজ-রাজ্যব্যবস্থা-পার্লিয়ামেন্টের সভ্য-নির্বাচন', 'দৈনিক জীবন', 'ব্রিটিস পরিশ্রম-কারুকর্ম্ম-বাণিজ্য-আয়-শ্রমজীবী লোক' এবং 'শেষ কথা'।।

মূলত পাঠিকাদের উদ্দেশ্য করে লেখা, তবে সকলেই পড়ুন এমন একটা উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণভাবিনীর। তিনি লিখছেন,

পাঠিকাগণ! আমিও আপনাদের ন্যায় একটা বাড়িতে বদ্ধ ছিলাম; দেশের, পৃথিবীর কোন বিষয়ের সহিত সম্পর্ক ছিল না; সামান্য গুটিকতক জিনিসে মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতাম কিন্তু পারিতাম না। দেশের সমস্ত ব্যাপার উত্তমরূপে জানিবার নিমিত্ত লালায়িত হইতাম, এবং কেহ বিলাত যাইতেছেন কিম্বা কেহ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিলেই মন নাচিয়া উঠিত, বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের নিকটে গিয়া বিদেশ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার নূতন বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য পরাধীনা বঙ্গবাসিনীদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, সুতরাং চুপ করিয়া থাকিতাম। [পৃ.৬, ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা]

বলাই বাহুল্য এ চিত্র ছিল বাংলার ঘরে ঘরে। এবং বিশেষ করে মেয়েদেরই জন্য। ভাবলে অবাক লাগে একটি ভ্রমণ কথায় কৃষ্ণভাবিনী কতরকম দৃষ্টিকোণ থেকে বিলেতের পরিচয় তুলে ধরেছেন বাঙালিনীদের সামনে। প্রায় কোনো আঙ্গিকই বাদ যায়নি। ইংরেজ সেসময় শাসকের রাজদন্ড জাঁকিয়ে বসেছে আমাদের দেশে, তাই তাদের জাতীয় চরিত্র আসলে কেমন আর তা কিভাবে প্রতিভাত হতে পারে আমাদের দেশীয় মানুষদের চোখে সে বিষয়ে কৃষ্ণভাবিনী লিখেছেন,

আমি এই পুস্তকে এদেশে ইংরাজদের ভাল মন্দ যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি; বিদেশে, বিশেষ ভারতবর্ষে ইহাদের যে রূপান্তর হয় , তাহা সমস্ত মন হইতে দূর করিয়া যতদূর সাধ্য অপক্ষপাতীভাবে ইঙ্গরাজদের আচার ব্যবহার ইত্যাদি বর্ণনা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যেরূপ অমিল প্রভেদ এবং ইংলন্ডবাসীদের সহিত ভারতবাসীদের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে স্থিরচিত্তে ইংরাজদের গুণাগুণ পর্য্যালোচনা করা আমাদের পক্ষে অতি কঠিন ব্যাপার; [পৃ. ৩৬ ]

লেখিকার মতে স্বাধীন ও পরাধীন জীবনের মূলগত তফাৎ বোঝানোর জন্যই এই লেখা। একদম শেষ অধ্যায়ে স্বগোতোক্তির মতো লেখা কবিতায় বলেছেন,

এইত জননি! স্বাধীন ব্রিটনে/ এসেছি, লইয়া কত আশা মনে/ ভেবেছিনু পাব চিরশান্তি ধনে,/ কিন্তু মা ভারত! সুখ কোথায়? ... তাই ভাবি এই তেজোময় প্রাণ,/ এ অতুল সুখ উচ্চ ধন মান,/ ঘৃণা হয় হায়! রাখিতে এ প্রাণ/ হীন অধীনতা-কলঙ্কময়। [পৃ. ১৫৪]

যে অন্তর্দাহ নিয়ে কলকাতা ছেড়েছিলেন কৃষ্ণভাবিনী সেই অন্তর্দাহ অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ব্রিটেনে গিয়ে মানুষের জীবনে (বিশেষত মেয়েদের) স্বাধীনতার প্রশ্নহীন চিহ্ন গুলি দেখে। ব্রিটেনের মতো ঔপনিবেশিক দেশের সমস্ত ধনসম্পত্তি আহৃত হয় অন্য দেশ কে শোষণ করে। আর ভারতবর্ষের মতো অনন্ত সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলির পরিণতি হয় ব্রিটিশ কুশাসনের পদদলনে পিষ্ট হওয়ার দুর্ভাগ্য বহন করার ইতিহাসে। এই যন্ত্রণা ক্রমশ কৃষ্ণভাবিনীকে অন্তরে অস্থির করে তুলেছিল।

২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বোম্বাই হইয়া ইংলণ্ডে যাইবার জন্য আমার স্বামীর সহিত হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতা হইতে রওনা হইলাম। আজ আমি মুখ খুলিয়া কলের গাড়িতে উঠিলাম। ... দেখিতে দেখিতে হুগলী, ও বর্দ্ধমান ইত্যাদি ষ্টেশনে আসিতে লাগিলাম; ইহারা আমার

পূর্বপরিচিত, আগে প্রালয় যাইবার সময় মুখ ঢাকিয়া এই স্টেশন দিয়া যাইতাম, কই আজ আমার সে ঘোমটা কোথায়? ঘোমটা টানিতে গিয়া মাথায় টুপিতে হাত ঠেকাতে নিজের ভিন্ন পোষাক দেখিয়া মনে মনে একটু লজ্জা হইল। আজ আমাকে কোনো পরিচিত লোক দেখিলে চিনিতে পারিবে না, হয়তো "মেম সাহেব" বলিয়া সেলাম করিবে, অথবা ভয়ে সরিয়া যাইবে। কি আশ্চর্য্য ! পোষাকে এত প্রভেদ ! [পৃঃ৭]

কৃষ্ণভাবিনীর যাত্রা শুরু হল। কন্যাকে কলকাতায় ফেলে আসার যন্ত্রণায় মলিন যাত্রার প্রারম্ভ ভাগ। বারে বারে বলছেন কলকাতার কথা; বিবাহপরবর্তী জীবনের বাল্যসহচরী কলকাতা; মা, ভাই বোনের কথা। কন্যার নাম কখনো প্রত্যক্ষভাবে বলেননি, কিন্তু রক্তক্ষরণ চলছিল তা বিষাদপূর্ণ ভাবনার প্রকাশে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃষ্ণভাবিনীর মূল বক্তব্য পরাধীন দেশের মানুষদের মানসিকতা বিষয়ে। কৃষ্ণভাবিনী ইংলণ্ড যাওয়ার জন্য নিজেকে সর্বরকমে প্রস্তুত করছিলেন, তাই নিজের পরিধেয় বদলে ফেলেছিলেন। 'When in Rome, do as Romans do' নীতি মেনে চলেছিলেন, যা তাঁর পরবর্তী বিলেতযাত্রিণীরা আর করেননি। কিন্তু এর ফলে দাস মনোবৃত্তি যে আমাদের দেশের মানুষের রক্তে মজ্জায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে তা অতি সহজেই ধরা পড়েছে কৃষ্ণভাবিনীর চোখে। কৃষ্ণভাবিনী অত্যন্ত মেধাবিনী। তাঁর সমস্ত বইটি পড়লে বার বার সেই মেধাকে কুর্ণিশ জানাতে হয়। সাহেবী পোষাকে আবৃত হয়ে সারারাত রেলগাড়ির কামরায় ভেবেছেন বসে নানা জাতি, সমাজ, লোকাচারে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের কথা। বার বার ভেবেছেন পাটনা স্টেশনে নেমে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে স্বাধীনতার স্বাদ বুঝি এই ! এবং দুঃখার্ত হয়েছেন সর্বস্তরের ভারতীয় নারীদের জন্য, যাঁরা এই স্বাদ আশু পেতে পারবেন এমন সম্ভাবনাই নেই। এই বই লেখার কারণ হিসেবে কৃষ্ণভাবিনী প্রথমেই জানিয়েছিলেন, স্বাধীনতা আর পরাধীনতায় কত প্রভেদ তা জানাবার , বিশেষ করে যে মেয়েরা ঘরের চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে দিনযাপন করে তাদের কাছে সেই সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্যই তাঁর এই প্রয়াস। সেই কৃষ্ণভাবিনী মোগলসরাই, বেনারস, এলাহাবাদ হয়ে গাড়ি বদল করে জব্বলপুর এবং সেখানে আবারো গাড়ি বদল করে বোম্বে পৌঁছে আড়াই দিনের যাত্রার পর পার্শি মেয়েদের সাক্ষাৎ পেলেন। অবাক হয়ে দেখলেন তাঁরা কিন্তু দিব্য স্বাধীন। ব্রিটিশের পরাধীনতা সহ্য করেও যতটা সম্ভব শালীনতা বজায় রেখে স্বাধীন থাকা যায় ততটাই তাঁরা স্বাধীন। যেখানে বাঙালি মেয়ে দিনমানে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে পারেনা সামাজিক বিধিনিষেধের কঠোরতায় সেখানে পার্শি মেয়েরা অবলীলায় পুরুষদের সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরোন রাস্তায়, অসংকোচে চলাফেরা করেন, নিত্যদিনের কাজ ভাগ করে নেন। মনে রাখতে হবে বম্বে যাঁরাই গিয়েছেন তাঁরাই (মূলত মেয়েরা) পার্শি মেয়েদের এই অসামান্য স্বাধীনতার স্বাদে নিজেকে জারিত করতে চেয়েছেন, সামাজিক বিধি বিহীন জীবনে অনেকটা দম ফেলার, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার ফুরসৎ পেয়েছেন। নীতিনির্ধারকের কড়া চোখের বাইরে পৃথিবীকে তাকিয়ে দেখেছেন। মেয়েরা বিশেষ করে এই তথ্য বারে বারে তাঁদের ভ্রমণকথায় লিখে গিয়েছেন। যেন পুরুষতান্ত্রিক বাঙালি সমাজকে বারে বারে চোখে আঙুল দিয়ে নিজেদের চাহিদা টুকু দেখাতে বোঝাতে চেয়েছিলেন। বেশিরভাগ মানুষই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বুঝতে না চাইলেও কিছু শুভবুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ (বলা ভালো পুরুষ) নারীর আলোকায়ন, শিক্ষা এবং স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বলা যায় উনিশ শতকের নারীদের লেখা এই ভ্রমণকাহিনী গুলি সেই শুভচিন্তার সুপরিণতি।

বম্বে নেমেও কৃষ্ণভাবিনীর একই অনুভূতি হল সাহেবী পোষাক বিষয়ে। এখানেও কেউ দৃকপাত মাত্র করলেন না তাঁর দিকে। বহিরঙ্গের প্রতি মানুষের এই ভীতি এবং প্রীতি কৃষ্ণভাবিনী পছন্দ করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন,

আজ যদি আমি ঘোমটা দিয়া এই ষ্টেশনে দাঁড়াইতাম , তাহা হইলে কতলোক চাহিয়া দেখিত, কিন্তু আমাদের দেশে ইংরাজি পোষাকের কি মাহাত্ম্য ! কেহ তাকাইতেও সাহস করে না, সকলেই ভয় পায়। [পৃ. ১১]

এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় তাঁর জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে বম্বের বন্দর। কৃষ্ণভাবিনীর জীবনেও যেন বন্দরের কাল ঘুচল। এক অনিশ্চিতি বুকে নিয়ে তিনি বিলেত রওনা দিলেন, আর দেশে ফেরবার আশ্বাসটুকুও সে সময় তাঁর কাছে ছিল না। লিখছেন,

বহুদিন হতে হৃদয়ে আমার, / গোপনে রয়েছে এক আশালতা, / দেখিবার তরে প্রিয় স্বাধীনতা, / যাইব যে দেশে বসতি উহার। ... কত পুত্র তব বিদ্যা শিখিবারে, / যায় মা ! ইংলণ্ডে ছাড়ি প্রিয়জন; / কত জ্ঞানরত্নে নিজ নিজ মন, মন্ডিত করিয়া পুন আসে ফিরে। / কেন মোরা তবে হয়ে তব সুতা,/ পারিনা জননি ! সে দেশে যাইতে,/ বিদ্যা জ্ঞানধনে হৃদয় ভূষিতে, / দেখিয়া স্বাধীন ব্রিটন-দুহিতা। ...ভাবি হায়,/ মোরা হইয়া মানব, / রয়েছি পিঞ্জরে চক্ষুহীনা সব... / তাই বহুকষ্টে পিঞ্জর ভাঙিয়ে / হয়েছি নাহির জ্ঞানচক্ষু তরে...

এবং শেষে অতিব্যক্তিগত দু লাইন,

কেহই জানেনা যাতনা আমার, / নাহিক কাহারে জানাতে বাসনা, / কি কাজ জানায়ে, কেহ বুঝিবে না; / পড়িতেছে অশ্রু ছিঁড়ি হৃদি তার । / অনেক কেলেশে বাঁধিয়া হৃদয়, / ভারত ! জননি ! প্রিয় জন্মভূমি ! / অতি কষ্টে আজ লইনু বিদায়।। [পৃ. ১৬]

এবার যাত্রাপথ। বম্বে থেকে ভেনিস হয়ে লণ্ডন। ভেনিস (কৃষ্ণভাবিনীর লেখায় বেনিস) যাত্রার শুরুতে অন্তর্দাহের প্রসঙ্গ আবারো এসেছে। এসেছে প্রশ্ন যে কেন সমুদ্র পার হয়ে বিদেশ যাওয়া যাবে না আর বিদেশ গেলেই দেশ কে ভুলে যেতে হবে ? অনুভব করেছেন এমন কোনো অনুশাসন সত্যিই থাকা সম্ভব নয়। এই নিয়ম মানুষের, বিশেষত সমকালীন মানুষের ভাবনার একটা সীমাবদ্ধতাকেই প্রকাশ করে , প্রবল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই বক্তব্য বার বার পেশ করেছেন কৃষ্ণভাবিনী। আর সেই বক্তব্য সরাসরি আমরা এবং অপরের ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করে। বরং দেশাত্মবোধ যে অনেক বেশিমাত্রায় জারিত হচ্ছিল তাঁর মনে তারই নির্ভুল আভাস দেয় পাঠককে। নতুন দেশ দেখার আনন্দ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাতে নিজের দেশকে ভুলে যাওয়ার মতো অপরিণত মানসিকতা এবং ঠুনকো সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই, কৃষ্ণভাবিনীর লেখা সরাসরি পড়লেই এখুনি আমরা এই বিষয়টি বুঝতে পারবো।

ভারতবর্ষ—জন্মস্থান—কলিকাতা—আত্মীয়বন্ধু ইত্যাদি এক এক করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সকলকে যেখানে যেরকম ভাবে দেখিয়া আসিয়াছি তাহারা প্রায় সেইখানে সেইরকমভাবে আছে, কিন্তু এই চারিদিনে আমি কতদূরে আসিয়াছি এবং আমার আহারাদির কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ! মা দেখিলে হয়তো খ্রীষ্টান হইয়াছি মনে করিয়া কাঁদিবেন, ভাইবোনেরা দেখিলে আর দৌড়িয়া আসিয়া আর "দিদি" বলিয়া হাত ধরিতে সাহস করিবে না—পাছে "জাত" যায়। অন্যান্য আত্মীয়রা দেখিলে "মেমসাহেব" বলিয়া ঠাট্টা করিবেন। কিন্তু আমার মনে তো কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যদিও আমি সেই ঘোমটা দিয়া বৌ হইয়া নাই বটে, আমার খাওয়া দাওয়া পোষাক ইত্যাদি সব ইংরাজি ধরণে হইতেছে, কেহ দেখিলে "হিন্দুর মেয়ে" বলিয়া জানিতে পারেন না; তবুও আমার মা, বাপ, ভাই, বোন, আত্মীয়পরিজন সকলের প্রতি সেইরূপ ভালোবাসা আছে, এখনও তাহাদের দেখিতে পাইলে দৌড়িয়া গিয়া গলা ধরিয়া কথা কহি। এখনও আমার ভারতবর্ষের জন্য সেই প্রকার কষ্ট হইতেছে, তবে আমাদের দেশীয় লোকেরা যে জাহাজে উঠিলে মন বদলাইয়া যায় বলেন তাহা একেবারে ভুল বলিয়া মনে হইতেছে; তাঁহারা বোধহয় আলাদা পোষাক দেখিয়াই আলাদা মন হইয়া যায় বিশ্বাস করেন। [পৃ.২০]

বোঝা যায় কৃষ্ণভাবিনীর মনের জোর অসীম ছিল। সেটি পরবর্তী জীবনে তাঁর সমস্ত কাজেই প্রকাশিত। কালাপানি পেরোনো রোধ করার জন্য সমাজ কতরকম নিদান যে দিত সেসময় তার ইয়ত্তা নেই। কৃষ্ণভাবিনী যুক্তির শাণিত তরবারী চালিয়ে লিখেছেন,

আমাদের দেশের লোকেরা জাহাজের নামে ভয় পায় কেন? বিপদ ত সব স্থানেই আছে; ঘরে বসিয়া রোগে মরিতে পার, বজ্রাঘাতে মরিতে পার, তবে "যদি" জাহাজ ডুবে না হয় জলে ডুবিয়া মরিবে এই প্রভেদ। [পৃ.১৬]

এই সাহস এবং নিজেকে সরাসরি পেশ করার ক্ষমতা সে যুগে অবশ্যই বিরল প্রতিভা। আর সেই প্রতিভার প্রকাশ সমস্ত ভ্রমণকথা জুড়েই অবিরল। যে কারণে ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডগামী ইংরেজের সহযাত্রী ভারতবাসীর প্রতি ব্যবহার বেশ সমালোচকের দৃষ্টিতেই বিচার করেন কৃষ্ণভাবিনী। শাসক বলে কোনো দ্বিধা রাখেন না বক্তব্যে।

বম্বে থেকে এডেন হয়ে তাঁরা ভেনিস পৌঁছন এবং ভেনিস থেকে ট্রেনে ('কলের গাড়ি') সুইট্জারল্যান্ড , জার্মানি, ফ্রান্স হয়ে ডোভার চ্যানেলের মাধ্যমে অবশেষে সেই সব পেয়েছির দেশ লন্ডনে উপস্থিত হন। ২৬ সেপ্টেম্বর রওনা দিয়ে তাঁরা ২০ অক্টোবর লন্ডন এলেন। চেয়ারিং

ক্রস স্টেশনের আলো দেখে কৃষ্ণভাবিনী সাংঘাতিক অবাক হয়েছিলেন। যদিও তার অনেক আগে থেকেই ইউরোপের মধ্য দিয়ে আসার সময় ইউরোপীয় এঞ্জিনিয়ারিং এর প্রশংসা খোলামনে করেছেন কৃষ্ণভাবিনী।

বিলেতযাত্রা সংক্রান্ত সব ভ্রমণকাহিনীগুলিরই যাত্রাপথ এবং বাহন অর্থাৎ জাহাজের বর্ণনা একটি সাধারণ বিষয়। আমরা তাই ক্যাপ্টেন, প্রথম শ্রেনী-দ্বিতীয় শ্রেণী, পোর্টহোল, ক্লান্তিকর একঘেয়ে নীল সমুদ্র বা সমুদ্রপীড়ার বর্ণনায় আটকে না থেকে দেখার চেষ্টা করবো জাহাজি দিনগুলি ভ্রামণিক মেয়েদের কেমন কাটত; কেমন ছিল তাঁদের আচরণ (ঘরের বাইরে জীবনে প্রথমবার নানাধরণের যাত্রীর সঙ্গে সহজ ভাবে থাকার এবং কার্যক্ষেত্রে মেশার প্রয়োজনে) এবং বিভিন্ন বিষয়/ ঘটনার পর্যবেক্ষণের বিশেষ বুনট, যেখান থেকে তাঁদের দেখার চোখ কিভাবে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে বা অভিযোজিত হচ্ছে তা জানা যায়। যদিও একদম প্রথম বিলেতযাত্রার এই ভ্রমণকথায় আমরা এই বিষয় গুলো ছুঁয়ে যেতে চাইবো ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে এবং পরের দিকে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো না পৌনঃপুনিকতার কারণে, বিশিষ্ট কোনো সংঘটন ছাড়া।

ভারতবর্ষীয় এবং বিশেষত বাঙালিরা বিলেতগামী জাহাজে ওঠার পর থেকেই স্বাদ পেতে শুরু করতেন ব্রিটিশ এটিকেটের। নিয়মানুবর্তিতা এবং কর্মক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির যাত্রীভেদের শিক্ষাও এখানেই শুরু হত। আর শ্রেণিভেদ অনুসারে জাহাজ কর্তৃপক্ষের থেকে প্রাপ্ত সুবিধা গুলিরও ভেদ হত বলাই বাহুল্য। যদিও কৃষ্ণভাবিনীকে খুব সমস্যায় পড়তে হয়নি কারণ এক তো তিনি প্রথম শ্রেণির কেবিনের যাত্রী ছিলেন আর দুই এক মুহূর্তের জন্য ও তাঁকে সমুদ্রপীড়া বা সি সিকনেস ভোগ করতে হয়নি। বম্বে থেকে যাওয়ার কারণে ছ'দিনের মাথায় কৃষ্ণভাবিনীরা সরাসরি এডেন বন্দর পৌঁছে গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে এই জাহাজ যাত্রা হলে ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপের বর্ণনা আসতে পারত। যেমন টা পাওয়া যায় পরে কয়েক দশক পর স্বামী বিবেকানন্দ[৯] বা শিবনাথ শাস্ত্রীর ভ্রমণকথায়[১০]। কৃষ্ণভাবিনীর জলযাত্রার বর্ণনায় একদম প্রথমদিকের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংযোগের ইতিহাসের কিছু তথ্য পাওয়া যায়, যেটা পরবর্তী আর কোনো ভ্রমণকথায় আমরা দেখব না।

এডেনে বন্দর লাগোয়া কত জাহাজ দেখলেন কৃষ্ণভাবিনী কিন্তু ভারতের বা এশিয়া মহাদেশের কোনো দেশের জাহাজ না দেখে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের জাতীয় জীবনের ফাঁকগুলি অনুধাবন করেন। ভারতবাসী কোথায় পিছিয়ে পড়েছে এ বিষয়ে খেদ করেন। মনে পড়ে যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাহাজ ব্যবসায়ে হাত পাকানোর এবং ক্রমশ ভরাডুবি হওয়ার কথা।

এডেন ছাড়িয়ে লোহিত সাগর হয়ে তাঁরা সুয়েজ প্রণালী দিয়ে সুয়েজ নগরের কাছে আসেন, কিন্তু ফরাসী দের সঙ্গে মিশরীয়দের যদ্ধের রেশ তখনো ঐ অঞ্চল থেকে মোছেনি বলে কাউকে নামতে বা জাহাজ থামাতে দেওয়া হয়নি। ক্রমশ সুয়েজ খাল অর্ধেক পেরনোর পর একটি কলকাতাগামী জাহাজের সন্ধান পেয়ে কৃষ্ণভাবিনীর মন আবারো উচাটন হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোনো কাজ অর্ধেক করে ছেড়ে যাওয়াকে কৃষ্ণভাবিনী নীতিগত ভাবে কখনো সমর্থন করেননি। তিনি এ প্রসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের তুলনা টেনে বলেছেন তিনি বীরনারী না হতে পারেন, কিন্তু জীবনযুদ্ধের স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন তা থেকে পিছিয়ে এসে কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত তিনি কিছুতে স্থাপন করতে পারবেন না। এই দৃঢ়তার কারণেই এক অর্থে ভ্রমণকাহিনীটি এতোকাল পরে এসেও আমরা পড়তে পারছি। যাত্রাপথে সুয়েজ প্রণালীর বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে কবে কিভাবে কত অর্থব্যয়ে সুয়েজ খাল নির্মিত হল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন কৃষ্ণভাবিনী। ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরের সংযোগকারী এই প্রণালীটি ১৮৬৯ থেকে খুলে দেওয়া হয়েছিল। তার আগে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ইউরোপ পৌঁছতে হত জাহাজ কে। এই বিষয়টির বিশদ বর্ণনা আছে লেখায়।

এরপর পোর্ট সাইদ পেরিয়ে জাহাজ পরিবর্তন। আরো কয়েকজন যাত্রীর মতো কৃষ্ণভাবিনীরা আর সমুদ্রে না থেকে ইতালির মধ্যে দিয়ে ইংল্যাণ্ড যাবেন সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো একটি ইতালিয় জাহাজে উঠে ভূমধ্যসাগর এলেন। চারিদিকে অনন্ত নীল জলরাশি। কৃষ্ণভাবিনী বলছেন, " আমরা এই দিন কতক সমুদ্রের উপরে থাকিয়া এত বিরক্ত হইয়াছি, না জানি আগে যখন লোকে দেড় বৎসর, নয় মাস, ছয় মাস ও তিন মাসে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যাওয়া আসা করিত তখন তাহাদের মনে কত কষ্ট হইত!"

এই বর্ণনা পড়লে আমাদের আজকালকার একদিনে কিছু ঘন্টায় মাত্র উড়োজাহাজে লণ্ডন যাওয়া মানুষদের কেমন রূপকথার মতো মনে হতে পারে তা বলাই বাহুল্য। এই সময় ব্রিন্দিসি নগরে এসে কৃষ্ণভাবিনীদের কোয়ারেন্টাইনে পড়তে হল। আমাদের এই লেখা যে সময়ের ফসল সেখানে সভ্যতার নবতম সংযোজন এই কোয়ারেন্টাইন। দেখা যায় মিশর বা ভারতবর্ষে ওলাউঠা হলে ইতালিতে এবং ইওরোপের অন্যান্য বন্দর গুলিতে জাহাজকে দশ পনেরো বা পঁচিশ দিন পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে রাখা হত। ব্রিন্দিসি থেকে অড্রিয়াটিক সাগর হয়ে ভেনিসে পৌঁছলেন অবশেষে বঙ্গমহিলা। বাঙালি মেয়ের জীবনে ইওরোপ জাঁকিয়ে বসল। ভেনিসে নেমেই প্রথম অভিজ্ঞতা গন্ডোলা ভ্রমণ। জলের মধ্যে শহর দেখার আনন্দে বাঙালি মেয়ের পিঠে পাখির ডানা লাগতে দেরি হয়না। ভেনিস ছেড়ে সন্ধ্যার ট্রেনে লন্ডন যাওয়ার আগেই ভালো করে ভেনিস শহর দেখে নিয়েছিলেন কৃষ্ণভাবিনী। সেখানে মানুষের স্বাধীনতা দুচোখ ভরে, সমস্ত হৃদয় মন ভরে তিনি দেখেছেন। ইতালিয়ানরা ইয়ুরোপিয়ান কিন্তু ইংরেজ নন , প্রভুর জাত নন তাই যেন তাঁদের মধ্যে সহজে নিজেকে মেলে দিতে পেরেছিলেন কৃষ্ণভাবিনী, যা পরবর্তীতে লণ্ডনে গিয়ে হয়ে দাঁড়ায় চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ। দেখার চোখের সঙ্গে সমান ভাবে সেখানে কাজ করে মস্তিষ্ক। ভেনিসের সেন্ট মার্ক স্কোয়ার বা পাবলিক গার্ডেন গুলি দেখতে গিয়ে ,

দেখিলাম যে উহা লোকে পরিপূর্ণ, অধিকাংশই স্ত্রীলোক; গরিব, বড় মানুষ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই বেড়াইতেছে বা বসিয়া গল্প করিতেছে। ইহাদের দেখিয়া স্বদেশীয়া অবরুদ্ধা ভগিনীদের কথা মনে পড়িয়া অত্যন্ত দুঃখবোধ হইল, তাঁহারা এ সুখ কী প্রকার তাহা একেবারে জানেন না। এদেশের স্ত্রীলোকেরা দেখিতে মন্দ নয়, আমাদের মত ইহাদের মুখ চেটাল, চুল ও চোক কাল, কিন্তু রং বেশ পরিষ্কার সাদা অথচ ঘোরাল। ইহাদের দেখিলে অতি নম্র ও সরল বলিয়া বোধ হয় এবং দিদি বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে... ইহাদের মনে যে একটা স্বাভাবিক সভ্যতা ও স্বাধীনতার তেজ আছে তাহা ইহাদের মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। [পৃ. ২৯]

এইসময়ের বেশির ভাগ ভ্রমণকথাতেই ইতালির সঙ্গে ভারতবর্ষের একটা সাযুজ্য দেখাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইতালি ছিল দক্ষিণ ইয়ুরোপের প্রাণকেন্দ্র, তুলনামূলকভাবে অনুন্নত এবং অসংস্কৃত , দরিদ্র উত্তর ইওরোপের তুলনায়। তাছাড়াও ছিল প্রোস্টেটানিজম এর আবাসস্থল। ভারতীয় ব্রাহ্মরা বিশেষ করে তাই ক্যাথোলিকদের পৌত্তলিকতাহীন ধর্মের একটা প্রতিস্ব খুঁজে নিতেন ইতালিতে। সেদিক থেকেও নিজেদের সঙ্গে একটা মিল দেখাতে চাইতেন তাঁরা। কৃষ্ণভাবিনীর লেখাতেও এই একই লক্ষণ আছে, যদিও তিনি হিন্দু ছিলেন, ব্রাহ্ম নন। কৃষ্ণভাবিনী নিজের দেশের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে ইতালির তুলনা করে সঠিক ভাবে লিখেছেন,

রোমরাজ্যের পতনের পর ইটালীর অতি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল; নিজ দেশের নাম ও গৌরব রক্ষা করা দূরে থাকুক স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারাইয়া ইটালীয়েরা পরস্পর বিবাদে রত হইয়াছিল। এইরূপে অনেক বৎসর অতীত হইলে উহারা ক্রমে নিজেদের দোষ ও হীনাবস্থা বুঝিতে পারিল এবং অবশেষে পরস্পর বিবাদ মিটাইয়া সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশানুরাগী মাট্সিনি, গারিবল্ডী প্রভৃতির সাহায্যে আবার স্বাধীনতা পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের কি হইয়াছে? একজন বাঙ্গালী কবি বলিয়াছেন যে "ভারত সুধুই ঘুমায়ে রয়" ইহাই ঐ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর। [পৃ. ২৯-৩০]

ভেনিস থেকে এবার মিলানের পথে। তারপর মিলানে গাড়ি বদল করে আল্পসের গা দিয়ে যাত্রাপথ। চোখের সামনে অভাবনীয় সমস্ত দৃশ্যের অবতারণা। দুপাশে গগনভেদী উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, সবুজ স্বপ্নে ঘেরা উপত্যকার হাতছানি আবার কখনো বা শুধু পাথুরে মৃত্যুময় হিম বিষাদের ছবি। কৃষ্ণভাবিনী সেই প্রথম বাঙালিনী যিনি এই অনাস্বাদিতপূর্ব পথে ভ্রমণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ পথেও পথ চলতে চলতে প্রতিটি সুড়ঙ্গের খননকাল, আর্থিক ব্যয় , কত শ্রমিকের কতদিন লেগেছিল কাজ করতে সেই শ্রম-সময় ইত্যাদির সমস্ত বিবরণ তিনি লেখায় উপস্থিত করেছেন। একটা অন্তত আমরা তেমন উদাহরণ দেখব, যা থেকে কৃষ্ণভাবিনীর তথ্য ও সত্যের প্রতি অবিচল মনোভাবের একটা ধারণা পাঠক করে নিতে পারেন। আল্পস পর্বতের সেন্টগদার্ড শৃঙ্গের কাছে এসে কৃষ্ণভাবিনীর পক্ষে ভাবা সম্ভব হয়নি এই বিপুলাকৃতি পর্বত পেরিয়ে ট্রেন কিভাবে চলাচল করবে। অথচ ইওরোপীয় এঞ্জিনিয়ারিং সেই অভাবনীয়কে বাস্তবে পরিণত করেছিল সুড়ঙ্গ খননের মাধ্যমে।

সম্মুখেই প্রকান্ড পর্বত, নীচে সুড়ঙ্গটিকে একটা অন্ধকার ছিদ্রের মতো দেখা যাইতেছে। ইহার একদিকে ঐরোলো নামে একটী ইটালীয় ছোট নগর, আর অন্যদিকে সুইটজর্লণ্ডদেশের ঘোষেণেন নামক একটী গ্রাম। সুড়ঙ্গটী লম্বে প্রায় পাঁচ ক্রোশ এবং পনর হাত মাত্র চওড়া , কেবল দুইটি গাড়ী একসময়ে পাশাপাশি যাইতে পারে। ইহার ভিতর দিয়া আসিতে আমাদের প্রায় পঁচিশ মিনিট লাগিয়াছিল। ভিতরে একেবারে ঘোর অন্ধকার, কেবল কলের গাড়ির শব্দ

ভিন্ন কিছুই দেখা শুনা যায়না। ইটালী ও সুইটজর্লন্ড দুই দিকেই একসময়ে ১৮৭২ খীষ্টাব্দে এই সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ শেষ হয়। ইহার নির্ম্মাণে প্রথমে নয় কোটি টাকা খরচ হইবে হিসাব হইয়াছিল কিন্তু শেষ হইলে পনর কোটি টাকা ব্যয় পড়িয়াছে ঠিক হইল। ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে আল্পস্ পর্বতের ভিতর দিয়া মন্টসেনিস নামক আরেকটী এই প্রকার সুড়ঙ্গ আছে, কিন্তু সেটী সেন্টগথার্ড সুড়ঙ্গ অপেক্ষা ছোট, এইটী প্রস্তুত করিতে তাহার চেয়ে অধিক বুদ্ধি ও কৌশলের আবশ্যক হইয়াছিল। ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারদের বিদ্যা ও বুদ্ধির ক্ষমতা ভাবিতে ভাবিতে আবার আমরা বেলা চারটার সময় গাড়ীতে উঠিলাম। [পৃঃ৩৩]

এই বর্ণনা থেকে বোঝা সম্ভব খুব সামান্য বিষয় ও কত নিষ্ঠাভরে কৃষ্ণভাবিনী পরিবেশন করেছেন পাঠকের কথা মাথায় রেখে। এর পর ক্রমশ সুইট্জারল্যান্ড , জার্মানি পেরিয়ে ফ্রান্স। ফ্রান্সের কালে বন্দরে কিছু সময় কাটিয়ে তাঁরা লন্ডনগামী জাহাজে ওঠেন। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী এরই মধ্যে ফ্রেঞ্চ  ভাষা থেকে ফরাসী নারী সকলকে নিয়ে নিজের মতো করে কালটিভেট করে ফেলেছেন। নারীদৃষ্টির ম্যাজিক বোধহয় এখানেই। অবলীলায় অসম্ভবকে সম্ভব করা। ফরাসী মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য বিবেচ্য,

ফরাসী স্ত্রীলোকেরা অতিশয় নম্র ও লজ্জাশীলা। ইহারা 'বাবু' নহে, গরিব স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সঙ্গে সমানে কাজ করে, লাঙ্গল বহে,  জল টানে—এইরূপ অনেক শক্ত কাজে স্বামীর সাহায্য করে। ইহাদের মুখে কেমন একটা সরলতা ও স্বাধীনতার ভাব আছে তাহা দেখিলে ফরাসী মহিলাদের ভালোবাসিতে ইচ্ছা করে। ফরাসী স্ত্রীলোকেরা বাল্যকাল হইতেই জ্ঞান ও শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। ইহাদের রুচি অতি চমৎকার, যাহার যেটী মানাবে সে সেই পোষাকটী পরে, কেবল দেখাইবার জন্য কতগুলো পোষাক পরিয়া আপনাকে কুৎসিত করে না। [পৃ.৩৪]

এরপর আরেক জাহাজে এবং কলের গাড়িতে লন্ডন। ঘন্টা তিনেকের মধ্যে। কৃষ্ণভাবিনীর হৃদয়ে উথাল পাথাল হয়ে বয় খুশির হাওয়া। লেখেন, "আজ আমি সেই অবগুণ্ঠনবতী বঙ্গমহিলা ইংলণ্ডে ! যে ইংলণ্ডের বিষয় কত আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি, আজ আমি সেই বহুদূরস্থিত ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত।"

এবার লন্ডন বাস। কৃষ্ণভাবিনীর লণ্ডন বাস মোট সাত বা সাড়ে সাত বছরের। ১৮৯০তে তিনি দেশে ফিরে আসেন স্বামীর সঙ্গে। এই লম্বা সময় লণ্ডনে থেকে তিনি ব্রিটিশ প্রভুর জাতির জীবনের বিভিন্ন দিকের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন এবং নিজের ভ্রমণকথাতে সংযুক্ত করেছেন। আসলে এটি নিছক এক ভ্রমণ কথা নয়, এর আড়ালে কৃষ্ণভাবিনী নিজের ভাবনাকেই পেশ করেছেন সমসাময়িক এবং অনাগত প্রজন্মের বাঙালিদের প্রতি। খাঁচায় বন্ধ পাখি যখন মুক্ত আকাশের স্বাদ পেয়ে কিছুদিনের জন্য স্বাধীন ভাবে উড়তে শুরু করেছিল তখন চতুর্দিকের নিন্দারবে তার মন খানিক বিচলিত হলেও স্বাধীন ডানা দুটির বিচলন ঘটেনি। বরং সে সংগ্রহ করেছে আকাশের তত্ত্ব, কেন আকাশ এতো বিপুল, কেন এতো গভীর প্রভাব , অনাদি অনন্ত হাতছানি এবং কোন মন্ত্র আকাশের থেকে শিখে নিজের এবং স্বজাতীয়দের জীবনে প্রয়োগ করলে এই বন্ধনমুক্তি ঘটবে সেই প্রয়াসই কৃষ্ণভাবিনীকে করতে দেখি ব্যক্তিগত উদ্যোগে। অন্য খুব কম ভ্রামণিকই এই স্বজাতীয় ভগিনীদের কথা ভেবে নিজের জীবনকে একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই এমন বিদ্রোহ তাঁদের করতেই হয়নি (দুর্গাবতী ঘোষ, বিমলা দাশগুপ্তা বা অমলাশঙ্কর), অথবা ব্যক্তিগত স্তরেই বিদ্রোহের আঁচ ধূমায়িত হয়েছে (যেমন, উমা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে)। যে নামগুলো উল্লিখিত হল বন্ধনীভুক্ত ভাবে, তাঁদের প্রত্যেক কে নিয়েই আমরা এই অধ্যায় ক্রমশ সাজিয়ে তুলব। কৃষ্ণভাবিনীর এই লড়াইয়ের কথা (মানসিক এবং সামাজিক দুইই) অত্যন্ত বেশি বিবেচনার দাবী রাখে, কেননা এ আন্দোলন তিনি উপস্থিত না করলে আমরা ততটা সহজে কালাপানির জল-অচল সমাজ থেকে জল-চল এবং ক্রমশ এই নোনাজলের অতি-সচলতার সন্ধান পেতে পারতাম না। বিশেষত খুব সাধারণ পরিবারের মেয়েরাও আজ যে স্বপ্ন দেখি বা দেখার চেষ্টা করি তার পিছনে কৃষ্ণভাবিনী দাসের এই সামাজিক অবদান টুকুর ভূমিকা অতি প্রয়োজনীয় ছিল।  এমনকি নবনীতা দেবসেনের একা ভ্রমণ নিয়েও বারে বারে প্রশ্ন উঠেছে , অর্থাৎ বিশ শতকের পরার্ধেও খুব হাল্কা প্রশ্ন সমাজের তরফ থেকে তোলা হয়েছে, এমনকি অন্তর্দেশীয় ভ্রমণের ক্ষেত্রেই তা বেশি। তার যোগ্য জবাব দিতে নবনীতার বাঁধেনি। এই আলোচনা আমরা অন্য অধ্যায়ে করেছি এবং আবারো করব। কিন্তু একুশ শতকের একদম শুরুর দিকের এই দ্বিতীয় দশকে সত্যিই বোধহয় একটি মেয়ে একা যাবে অন্য কোনো দেশে বা নিজের দেশেরই অন্য রাজ্যে চাকরি নিয়ে এই ভাবনায় অভিভাবকদের যতটা গর্ব আর আনন্দ হয় দুশ্চিন্তা তার চেয়ে অনেক কম হয় এটা চোখ বুজে

বলে দেওয়া সম্ভব। এই ক্ষেত্রে অন্তত ছেলে এবং মেয়ের অর্থাৎ দুই বিপরীত লিঙ্গভাবনার মধ্যে একটা সমতা এসেছে। এটাই কৃষ্ণভাবিনীর স্বপ্নের একটা বড় অংশ ছিল।

লন্ডনে থাকতে থাকতে এক বিপুল সারগর্ভ লেখা লিখলেন কৃষ্ণভাবিনী। লিখে ফেললেন তাঁর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা, যার প্রথম কয়েকটি অধ্যায় কেই শুধু ভ্রমণ কথা বলা উচিত। বাকিটা জীবনের অনন্ত অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা ব্রিটেনের স্বাধীন জীবনের নিরিখে ভারতবর্ষের পরাধীন জীবনের পর্যালোচনা। স্বাধীনতার বোধ কৃষ্ণভাবিনীকে সব থেকে বেশি উশকে দিয়েছে বারে বারে তা তাঁর বইয়ে প্রকাশিত। কৃষ্ণভাবিনীর সমস্ত বই জুড়েই অনেক সময় একই ভাবনার বহুকৌণিক প্রকাশ পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তা হয়তো কখনো কখনো আমাদের কৃষ্ণভাবিনী পর্যালোচনাকেও প্রভাবিত করবে। ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলার বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় , ‘‘নানাপ্রকার চিন্তা’’ ।

কৃষ্ণভাবিনী লন্ডনে আসার কিছুদিন পর তাঁর কথার মুখ এবং ভাবনার উৎস খুলে গিয়েছে অবিরল ধারায়। কৃষ্ণভাবিনীর চিন্তা কিভাবে কোন পথে পরিচালিত হয়েছে তার কিছু নির্যাস আমরা এইবারে দেখব , ‘‘নানপ্রকার চিন্তা’’ অধ্যায় থেকে। কৃষ্ণভাবিনী প্রথমেই সরব হয়েছেন বাঙালিদের উপহাসপ্রিয়তার বিরুদ্ধে। কোনো নতুন জিনিস কে সানন্দে প্রসন্ন চিত্তে বাঙালিরা গ্রহণ করতে পারেন না। বিশেষত তা যদি মেয়েদের জীবনে হয় তাহলে তো আরোই পারেন না। আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে, (বিশেষ করে বাঙালিদের কথাই বলছেন, কেননা অবাঙালিদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ সেসময় বাঙালি সমাজে একেবারে অসম্ভব ছিল) দেশ গঠনের লক্ষ্যে বৃহত্তর জাতীয়তা বোধের অভাব অত্যন্ত প্রকট ছিল। কিভাবে সবরকম মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দেশের উন্নতি ঘটানো সম্ভব এই ভাবনায় খুব কম মানুষকেই উদ্বুদ্ধ হতে দেখেছেন কৃষ্ণভাবিনী তাঁর সমকালে। বরং ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সামাজিক কোন্দল-কলঙ্কের আসর বসাতে বাঙালি সমাজপতিদের অনেক বেশি উদ্যোগী হতে দেখেছেন কৃষ্ণভাবিনী। কিভাবে বাঙালি সমাজকেই নানা জাতপাত রীতিনীতি আচার-বিচারের ফাঁদে ফেলে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক সুবিধা আরো বেশি আদায় করে নেওয়া যাবে, গুটিকয়েক উচ্চমনস্ক সুশিক্ষিত বাঙালি পরিবার ছাড়া মূলস্রোতের বাঙালি সাধারণ মানুষকে এমনটাই বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণভাবিনী। এই অতি-প্রতিক্রীয়াশীল, কূটবুদ্ধি মানুষের দল সমাজের এবং মানুষের ভালোর জন্য করা কোনো সংস্কারকেই আন্তরিক ভাবে সাধুবাদ জানিয়ে সমাজে গ্রহণ করেননি, এবং অন্যদের গ্রহণের পথে যত পেরেছেন বাধা সৃষ্টি করেছেন। না ছিল এদের সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি, না অন্তর্দৃষ্টি, না সামাজিক মঙ্গলের চিন্তা। মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার (সামাজিক-মানসিক-আর্থিক) করতে কখনো বাঁধেনি এই সম্প্রদায়ের। কৃষ্ণভাবিনী অত্যন্ত যথার্থ ভাবে লিখেছেন দুই মহাদেশের সাধারণ মানুষের মূলগত কিছু প্রভেদের কথা।

উপহাস সকলেই করিতে পারে , এবং অনেক স্থলে কুসংস্কার ও অনভিজ্ঞতাই উহার সূত্র। আমাদের দেশীয় লোকেদের উপহাসই আমাদের দেশের উন্নতিপথের কন্টক হইয়াছে। কেহ যদি কোন নূতন বিষয়ে হস্তার্পণ করেন, তাহা হইলে অমনি দেশশুদ্ধ লোক তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দেন, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া তাঁহার উপর একেবারে খড়গহস্ত হন, এবং সেটা পরে ভালো বলিয়া প্রমাণিত হইলেও কেহ তাঁহার সহিত সে বিষয়ে যোগ দিতে অগ্রসর হন না, বরং পশ্চাৎ ফিরিয়া যান। সকল দেশেই কোন নূতন বিষয় অবলম্বন করিলে লোকে প্রথমে বিদ্রূপ করে, কিন্তু প্রভেদ এই , যে আমাদের দেশে সে অবলম্বিত বিষয় ভালো হইলেও লোকে তাহা হইতে বিমুখ হয়, আর এ সব দেশে তাহার আদর করে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা কুসংস্কার ও মূর্খতায় আচ্ছন্ন। আবার আমাদের দেশীয় লোকেরা যেরূপ গোঁড়া, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে কোন নূতন বিষয় প্রচলিত করা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার, বিশেষ তাঁহারা কাউকে বিদেশীয়দের কিছু অনুকরণ করিতে দেখিলে হিতাহিতবিবেচনাশূন্য হইয়া একেবারে তাঁহার প্রতি শত্রুভাব অবলম্বন করেন। কেহ যদি ১৬ বৎসর অবধি কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠান, তবে লোকে অমনি তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য অগ্রসর হন; কেহ ১৪ বৎসর পর্যন্ত কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিলে লোকে তাঁহাকে ‘একঘরে’ করিবার পন্থা দেখিয়া বেড়ান। এইরূপ শত শত ঘটনা আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের ভিতরে নিরন্তর ঘটিতেছে। [পৃ. ৩৬-৩৭]

কৃষ্ণভাবিনীর মতে আমাদের এই দুর্দশার প্রধান কারণ কূপমন্ডুকতা। আমরা আপন হতে বাহির হয়ে ভুবন খানি দেখিনা। আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই শুভবুদ্ধি এবং শিক্ষিত উদার মানসিকতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। দাসত্ব করে ছদ্ম সুখে থাকতে আমরা যতটা ভালোবাসি ততটা পছন্দ করে উঠতে পারিনা অন্য জাতির ভালো গুণ গুলির কদর করতে কিম্বা সেগুলি আত্মীকরণ করে নিজেদের জাতীয় চরিত্র এবং সমাজের উন্নতি ঘটাতে। কেউ যদি বিদেশ থেকে ফিরে কোন কারণে দেশের ভুলগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন তাহলে তাঁকে সমাজের বাঁকা

পরিহাস শুনতে হয়, একা হয়ে যেতে হয়। ফলে আমাদের কর্মে কিম্বা মননে এগিয়ে যাওয়ার পথ আমরা নিজের হাতেই বন্ধ করে দিই। এই বদ্ধ অবস্থার প্রেক্ষিতে কৃষ্ণভাবিনী যে পথনির্দেশ দিচ্ছেন তাঁর লেখায় , তার কোনো তুলনা অন্যান্য ভ্রমণকাহিনীতে সচরাচর মেলে না।

তিনি বার বার বলছেন ইংরেজদের দেশে গিয়ে একটি জাতি হিসেবে ইংরেজ নরনারীর দৈনন্দিন জীবন দেখে তিনি বুঝেছেন কতখানি দারিদ্র্য , শ্রেণি-বৈষম্য, অন্যায় অত্যাচার, অশিক্ষা এবং অশিষ্টতা তাদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে; তিনি দেখেছেন নিচু সমাজের ইংরেজকে মানুষ ভাবতে পারাই একটা খুব কঠিন কাজ কারণ তার ভয়ানক হীন জীবনযাত্রা এবং হীনতর ঘৃণ্য আচরণ। অথচ এটাই কিন্তু সমস্ত ইংলন্ডের মুখ নয়। ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলির মতো ব্রিটেন ও অন্যের ভালো গুণের অনুকরণ করতে দুবার ভাবে না। ফলে পিছিয়ে থাকা উপদ্রুত অঞ্চল গুলি ছাড়াও এগিয়ে থাকা মানুষ এবং সামাজিক চলিষ্ণুতার অভাব তাদের হয়না। যে কোনো ইওরোপীয় দেশেরই এই নীতি। অন্যের ভালোকে তারা বৃহত্তর জীবনের অঙ্গ করে নেয় সহজেই। ফলে আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নতির পথ তাদের জন্য ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে। ইংরেজের মতো স্বার্থান্ধ এবং স্বার্থপর জাতি পৃথিবীতে দুটি হয়না। সেই ইংরেজ ও স্বজাতিয়ের প্রতি কেবলি ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে সংহতি এবং সার্বভৌমিকতাই প্রতিষ্ঠা করে থাকে। যা গোষ্ঠীবদ্ধ ভারতবাসীর জীবনে এক্কেবারে অপ্রতুল। তাই বেড়াতে গিয়ে মানুষের জীবন থেকে যে শিক্ষা ভারতবাসীরা লাভ করেন তার কোনো পরিমাপ হয়না। এখানে কৃষ্ণভাবিনী ভারতবর্ষের অতীত গৌরব স্মরণ করে বলেছেন, এতো পুরাতনী সভ্যতার ধারক ও বাহক আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, যার প্রাচীন সভ্যতা অন্যান্য জাতিগুলি গ্রহণ করে তাকে আরো দিনে দিনে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে, সেই ভারতবর্ষের আজ ঘোর দুর্দিন। কোন এমন সন্তান তার নেই যে তার পরাধীনতার কালিমা ঘুচিয়ে দিতে পারে বলে, বীর্যে, শৌর্যে , জ্ঞানে, শিক্ষার ছটায় এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে। তাই যথার্থই মনে করেছেন, "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়"।

এমন কি পরবর্তী অধ্যায়ে যখন লন্ডনের বর্ণনা দিয়েছেন, তখনও এই কথা ফিরে এসেছে। কৃষ্ণভাবিনীর বইয়ে সবচেয়ে বেশি আছে বেড়াতে যাওয়ার পর নিজের দেশের অবস্থার আলোচনা। লন্ডন শহরের সুবিধা অসুবিধা সমস্ত রকম দিক থেকে আলোচনা করেছেন কৃষ্ণভাবিনী আর মাঝে মাঝেই এসেছে কলকাতার সঙ্গে তুলনা। যেমন কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ইংরেজরা নেটিভ বাঙালিদের আমোদ প্রমোদ করা একেবারেই পছন্দ করত না কিন্তু লন্ডনের রিজেন্ট পার্কে কেউই কাউকে কোন বিষয়ে বাধা দিতে পারে না... কিম্বা আমাদের বাঙালিদের ছাপা বইয়ের বাংলা বা সংস্কৃতের এতো বিপুল রকম শোচনীয় অবস্থা কিন্তু লন্ডনের ছাপাখানার সংস্কৃত বা বাংলা সম্পর্কে জ্ঞানহীন ইংরেজ কর্মচারী কেমন নিষ্ঠাভরে কেবল ব্লকের পর ব্লক বসিয়ে বই ছাপান যা প্রায় ত্রুটিশূন্য। এবম্বিধ নানা বিষয়ে দেশের মানুষ এবং তাদের নানাবিধ চরিত্রের প্রবণতার সঙ্গে প্রভুর দেশের উন্নত বিষয়গুলির অনবরত তুলনা করেছেন লেখিকা। এর মধ্যে যখনি মেয়েদের কথা এসেছে তখন লেখনী শতধারে বিকশিত হয়েছে। কৃষ্ণভাবিনী যেন ডেকে ডেকে বলতে চেয়েছেন মেয়েদের কত কি শেখার জানার দেখার এবং নিজেদের সেই মতো তৈরি করার আছে। নইলে মেয়েরা সমাজের সামনের সারিতে কোনোদিনই এগিয়ে আসতে পারবেন না। এই দুর্ভাগ্য-ভ্রামণিক নিজেই হয়তো জানতেন না , পরবর্তী শতাব্দী তাঁকেই একজন প্রথম সারির পূর্বনারীর সম্মান দেবে। ইংলন্ডের মেয়েদের স্বাধীনতার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে তাঁকে। আর পছন্দ করেছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ায় প্রশাসক-ভূমিকা। একজন নারী দেশের মাথা এবং তাঁর নীতিতে সমস্ত দেশ মায় উপনিবেশ গুলি পর্যন্ত চলছে, ভারতবর্ষীয় বধূ কৃষ্ণভাবিনীর কাছে এ এক মহৎ স্বপ্নের মতো ঘটনা| কারণ তিনি নিজে এবং তাঁর মতো হাজার হাজার কন্যারা সমাজ-সংসার-দেশ-পারিবারিক জীবনের একাধিক অনবরত নিগড়ে বদ্ধ হয়ে থাকতে বাধ্য হন। পরের, বিশেষত পুরুষের ইচ্ছায় চলতে বাধ্য থাকেন। নিজস্ব সত্তার কোনো স্ফুরণ তাঁদের মধ্যে দেখা যাওয়া এক অসম্ভাব্য বিষয়। ইংলণ্ডের মেয়েদের নিয়ে লিখতে গিয়ে বারে বারে কৃষ্ণভাবিনীর স্বজাতীয়াদের কথা উঠে এসেছে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে। ঘোড়ায় চড়া স্বাধীনচারিণী ইংরেজ ললনাকে কৃষ্ণভাবিনীর কখনো মনে হয়েছে স্বপনচারিণী আবার কখনো বা উদ্যত খড়গ দেবী চামুণ্ডা। মেয়েদের কোন বিষয়েই পিছিয়ে রাখা হয়নি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা যেমন কৃষ্ণভাবিনীর অত্যন্ত ভালো লেগেছিল| সমস্ত সামাজিক অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে প্রভুর দেশের মেয়েদের অবস্থানের বিচার এবং বর্ণনা তিনি করেছেন। সামগ্রিক ভাবে খতিয়ে দেখেছেন নারীপুরুষের সম্পর্কের প্রয়োগনীতি এবং আমাদের দেশীয় তৎকালীন সমাজের সঙ্গে তার পার্থক্য। এতোটা মেধাবী জটিল বিশ্লেষণ অন্য কোনো বিলেতভ্রমণ কাহিনীতে আমরা আর দেখতে পাবো না।

বহিরঙ্গের পোষাক থেকে মস্তিষ্কের ক্ষুরধার বুদ্ধি সবই এসেছে তাঁর অণুবীক্ষণের নীচে। এবার সরাসরি চলে যাই কৃষ্ণভাবিনীর কলমের কাছে, মেয়েদের সম্পর্কে বিবিধ আলোচনার ক্ষেত্রে, নারীর পোষাক এবং আচার আচরণ থেকে নারীর অন্তর্জগৎ ক্রমশ সান্দ্র এবং স্তরীভূত হয়েছে কৃষ্ণভাবিনীর বীক্ষণ,

ওদিকে ঢং ঢং করিয়া গির্জ্জার ঘন্টাগুলি বাজিতেছে ... স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার পরিচ্ছদ পরিয়া চলিতেছে, পুরুষদের বস্ত্রে কোনো আড়ম্বর নাই, সকলেরই কাল পোষাক। আমাদের দেশের অনেক পুরুষের মত এখানকার স্ত্রীলোকেরা বেড়াইতে যাইবার সময় "ফুলবাবু" সাজে। ... রাস্তায় যে সকল লোক চলিতেছে, তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকের ভাগ অধিক। সকল দেশেই দেখিতে পাই স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা ধর্ম্মকার্য্য ও পূজা আর্চ্চায় বেশি রত এবং সকল দেশেই স্ত্রীরা অধিক গোঁড়া। এখানে অনেক স্ত্রীরা কেবল ধর্ম্ম দেখাইবার জন্য গির্জ্জায় যায় এবং অবিবাহিতা স্ত্রীরা অনেকসময় আপনাদের বেশভূষা দেখাইবার ও বর খুঁজিবার জন্য উপাসনালয়ে গিয়া থাকে। [পৃঃ ৪৬]

এই স্বাধীন ভাবে এবং অনেকসময় লজ্জারহিত ভাবে বর খোঁজা বিষয় টি আমাদের দেশের বহু ভ্রামণকেরই চোখে বিসদৃশ ঠেকেছে। স্বামী বিবেকানন্দ[১১] বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের[১২] লেখায় প্রাক-বিবাহ সম্ভাব্য পূর্বরাগের প্রস্তুতি খুব তির্যকভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাঁদের মতো কৃষ্ণভাবিনী এইটুকুতেই থেমে থাকেননি। মেয়েদের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রের বৃহত্তর কল্যাণমূলক ভূমিকা গুলির বিষয়ে অনেক খানি আলোকপাত করেছেন। বারে বারে দেখিয়েছেন ইংরেজ সমাজের বেশ কয়েকটি ভালোগুণ আমাদের দেশীয় সামাজিক কাঠামোয় একান্ত জরুরী। বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে। বাল্যবিবাহ রদ, নারীশিক্ষার বিস্তার ছাড়াও মেয়েদের দেশভ্রমণ (অভিভাবকের সঙ্গে বা স্বাধীন ভাবে ) কতখানি জরুরি শুধু ব্যক্তি নয়, সামগ্রিক নারীজাতির স্বনির্ভরতাবোধের উন্নতিকল্পে।

ইংরেজরা অতিশয় বিদেশ-ভ্রমণ প্রিয়। অনেকে অবকাশ পাইলেই নানাদেশ পর্য্যটনে বাহির হয়। বিদেশে গিয়া সকল বিষয় ভালো করিয়া বুঝিবার জন্য নানা বিষয়ের খবর লয় আর বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করে। এই ভ্রমণে কেবল পুরুষেরা নয়, স্ত্রীলোকেরাও স্বামী, পিতা বা ভ্রাতার সহিত গিয়া থাকে। ...ইংরেজরা বিদেশভ্রমণ কে শিক্ষার অংশ বলিয়া ধরে ...নানাদেশ পর্য্যটনে কুসংস্কার সকল দূরীভূত হয়, নূতন নূতন দ্রব্য দর্শনে জ্ঞানচক্ষু সকল প্রস্ফুটিত হয়, নব নব ভাবের আবির্ভাবে মন প্রশস্ত হয় এবং অভিনব লোকের সহবাসে অন্তঃকরণ বিকশিত হয়। [পৃঃ ৫৮]

বলা বাহুল্য কৃষ্ণভাবিনী আমাদের দেশীয় ভ্রমণ বিরোধী রীতির দিকেই ইঙ্গিত করছেন শেষ বাক্যে। যেখানে মেয়েদের জন্য কেবলি নিগড়ের ঝনঝনা।

এইবারে অত্যন্ত জরুরি বিষয়, মেয়েদের শিক্ষা। কৃষ্ণভাবিনী অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন দেখে যে শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেদের মতো মেয়েদের ও বিএ কিম্বা অন্যান্য উপাধির ছড়াছড়ি। মেয়ে শিক্ষয়িত্রীদের অনেক স্কুল আছে যেখানে শিশুরা পড়াশোনা করে। অনেক মেয়েরা লেখালেখি করেন এবং বিশেষত মনে রাখতে হবে, কৃষ্ণভাবিনী যে সময় লন্ডনে সেসময় মহিলা ঔপন্যাসিকদের জয়জয়কার চলছে সাহিত্যক্ষেত্রে। তাঁর নিজের বঙ্কিম বিষয়ক অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছিল যা ব্রিটেনে মেয়েদের লিখতে এবং বেস্টসেলার হতে দেখে খুবই পূর্ণতা পেয়েছিল। সমসাময়িক কবি এমিলি ডিকিনসন [১৮৩০-১৮৮৬] ,ঔপন্যাসিক অগাস্টা লেডি গ্রেগরি [১৮৫২-১৯৩২], কেট চপিন [১৮৫০-১৯০৪] বা লুইজা মে অলকট [১৮৩২-১৮৮৮]- এঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যগগনে ছিলেন। মহিলা ঔপন্যাসিকদের কথা কৃষ্ণভাবিনী বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেটি সবথেকে বেশি তাঁকে মুগ্ধ করেছে তা হল শিক্ষাক্ষেত্রে নারীপুরুষের সমানাধিকার বোধ এবং কর্মজগতে নারীর স্বাধীনতার ধারণা। তিনি লিখছেন,

ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য বিলক্ষণ সুবিধা আছে। লণ্ডনে প্রায় প্রতি পাড়াতেই দুই তিনটা করিয়া ছোট ছোট বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল লন্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমান শিক্ষা পাইয়া থাকে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সহিত সমানে এক কলেজের এক অধ্যাপকের নিকট পাঠ করিয়া এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং সমান উপাধি লাভ করে। বহুসংখ্যক ইংরেজ স্ত্রীলোক পুরুষদের সঙ্গে কঠিনতর পরীক্ষায় আড়াআড়ি করিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হয় এবং ইহাতে বুঝা সম্ভব হয় স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কোনো অংশেই পুরুষদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। যে সকল পরীক্ষা পুরুষ দিতে অগ্রসর হয়না স্ত্রীলোকেরা সেইসকল পরীক্ষায় কোন কুণ্ঠা ছাড়াই উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও জ্ঞান

ও বিদ্যায় পুরুষদের সহিত সমকক্ষতা করা স্ত্রীলোকদের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় বহন করে। শুনিয়াছি উত্তর আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা জজ ব্যারিষ্টার ইত্যাদি হইয়া পুরুষের মতো উচ্চাসনে বসিয়া বিচারাদি করে এবং সেখানকার ভদ্র স্ত্রীলোকেরা অতিশয় সুশিক্ষিতা। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা এখন অধ্যাপনা ও চিকিৎসা অপেক্ষা অধিক উন্নত কর্ম্ম করেনা ; কিন্তু এখানে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইতেছে তাহাতে বোধ হয়, ইংরাজ মহিলারা অনতিবিলম্বে আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগকে অতিক্রম করিয়া উঠিবে। ... বালকদের মতো বালিকাদের দলে দলে স্কুলে যাইতে এবং যুবকদের মতো যুবতীদের কালেজে অধ্যয়ন করিতে যাইতে দেখিয়া আমার মনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হয় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। [পৃঃ ৭৫]

স্বাভাবিক ভাবেই অন্ধকারানিরুদ্ধ দেশ থেকে আলোয় পৌঁছে যেন নিঃশ্বাসবায়ুর সন্ধান পেলেন কৃষ্ণভাবিনী। একে শুধুই ব্রিটিশের দেশের গুণগান বা বিলেত দেশ সম্পর্কে উৎসাহীর অত্যুক্তি না বলাই ভালো হবে। এইক্ষেত্রে নির্বিচারভাবে এই মতামতকে মোহদৃষ্টির ফলশ্রুতি আমরা বলতে একেবারেই রাজী নই। ফলে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সীমন্তী সেনের সঙ্গে একটু মতপার্থক্য হয়ে যাবে। কৃষ্ণভাবিনী সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে এবং ভূমিকায় সূক্ষ্মভাবে মেয়েদের অবস্থানের নির্দ্বিধ তুল্যমূল্য বিচার করেছেন। বাঙালি মেয়ের বহু শতাব্দীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কৃষ্ণভাবিনীর মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল যা এক যুগলক্ষণ কে নির্দেশ করে। এরপর মেয়েরা ক্রমশ বেরিয়ে পড়েছেন, কোনোভাবেই বদ্ধ থাকেননি। আর সামাজিক বাধার প্রচণ্ড প্রকাশ ও ক্রমশ তরলীকৃত হতে শুরু করেছিল হিন্দু বাঙালি মেয়েদের ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত পরিসরে কখনোই জীবন খুব সরলগতিতে চলে না, তাই ব্যক্তিগত বাধার পাহাড় অনুক্তই থাক এই আলোচনায়, মেয়েদের ভ্রমণে তা আজও সমান ভাবে থাবা বসিয়ে চলেছে, কিন্তু মেয়েদের স্বপ্নকে সেই থাবা দমিয়ে রাখতে পারেনা। তাই মেয়েদের সঠিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করতে দেখে কৃষ্ণভাবিনী বাঙালি মেয়েদের জন্যও সেই অমৃতস্বাদের স্বপ্ন বুকে লালন করেন, নিজে অবগাহন করেন। লেখেন,

এখানে স্ত্রীলোকেরাও ছয় সাত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া কুড়ি পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকে। অনেকে শিক্ষিত ইংরেজ পুরুষদের মতো জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যাচর্চ্চায় নিমগ্ন থাকে। এখানে অনেক গ্রন্থকর্ত্রী, পন্ডিতা ও বিজ্ঞানবিৎ আছেন। এখন ইঙ্গরেজীতে সর্বোৎকৃষ্ট নবন্যাসগুলি স্ত্রীলোকদের লেখনী হইতে প্রসূত হইয়া থাকে। [পৃ. ৭৬]

এরপর জানাচ্ছেন, বাড়িতে শিক্ষাদানের সুযোগ ছেলে মেয়ে উভয়কেই দেওয়া হয়। আর শুধু জ্ঞানচর্চা নয়, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন কাজের শিক্ষাও সকলে সমানভাবে পেয়ে থাকেন। কোনো বিভেদনীতি কাজ করেনা। সেলাই, রান্না, পিয়ানো বাজানো, পোষাকের স্টাইল বজায় রাখা, সমস্ত সাংসারিক কাজ এবং তারপর বেড়াতে যাওয়ার মন তৈরি করা এই শিক্ষার এক বড় অবদান। তুলনা করে বলেছেন, ভারতবর্ষের যে শ্রেণীর লোকেরা কন্যাদের শিক্ষার কথা শুনে গেল গেল রব তোলেন, তার চেয়ে নিম্ন শ্রেণীভুক্ত লোকেরাও ইংলণ্ডে কন্যার শিক্ষাকে আবশ্যকীয় জীবনচর্যা হিসেবে গণ্য করেন। শিক্ষার এই আপামর প্রসার এবং লিঙ্গভেদহীন ব্যাপ্তি যে কোনো স্বাধীনতাকামী মানুষের চৈতন্যে ঘা দিতে বদ্ধপরিকর। কৃষ্ণভাবিনী ও প্রভাবিত হয়েছিলেন স্বাভাবিকভাবেই। নিজের দেশের মেয়েদের জীবনে বদল চেয়েছিলেন যেমন, ঠিক তেমনি মনোমতো ছাঁচ পেলেন ইংলণ্ডে গিয়ে।

মেয়েদের শিক্ষায় শরীর পিছিয়ে থাকে না, ঘোমটা ঢাকা বঙ্গমহিলার এ এক অনন্ত পরিসর আবিষ্কার। নারী শরীর বাঙালি সমাজে এক অনন্ত ট্যাবুর উৎস। সে শরীরের অধিকার পাওয়ার জন্য এবং সেই একই শরীরের অধিকার সীমায়িত এবং বিলুপ্ত করার জন্য বাঙালি সমাজের সমাজপতিদের মাথাব্যথার অন্ত ছিল না। নারী শরীর শুধুই সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে কাজ করবে এমনটাই ছিল পুরুষের একান্ত ইচ্ছে। নারীর নিজস্ব চিন্তাপ্রথার বিকাশ যাতে না ঘটে এবং ঘটলেও তা শুধু সাংসারিক জীবনের ভালোমন্দের বেড়ায় নিজেকে আটকে রাখে তেমনি একটা অদৃশ্য ইচ্ছে এবং আদেশের বলে বাঙালি সমাজে নারীর ভূমিকাকে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছিল বিগত বহু শতক ধরে। নব্যধারার শিক্ষা যে সময় থেকে সংযোজিত হল বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে, সেসময় থেকে তাই তাতে কেবল পুরুষের অধিকার হল একচেটিয়া। মেয়েদের মিথ্যে দোষারোপের কেন্দ্রে ঠেলে রাখা হল। এই একপেশে সামাজিক বৈষম্যমূলক আচরণের অন্যথা দেখে স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণভাবিনীর উচ্ছ্বাস বাঁধ না মানারই কথা। এক্ষেত্রে ইংরেজ শুধু ইংরেজ প্রভু নন, ব্রিটিশ এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিগণিত হয় তাঁর লেখায়। আর সেজন্যই শুধুমাত্র তাঁকে বা তাঁর লেখাকে উনিশ শতকীয় নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলে দেওয়া ঠিক হয়না। কৃষ্ণভাবিনী অত্যন্ত নিরপেক্ষ মতামত প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর পুরো বইটি জুড়ে। মেয়েদের শরীর নিয়ে সমস্ত ইংলণ্ডে তিনি কোনো লুকোচুরির অবকাশ দেখতে পাননি। নারীমাংস লোলুপ মানুষ তাঁর স্বদেশেও কম

দেখেননি তিনি, কিন্তু তার জন্য মেয়েটির শরীরের যাবতীয় দোষ এমন অন্যায় নীতি মেনে নিতে স্বাভাবিকভাবেই চায়নি কৃষ্ণভাবিনীর সুশিক্ষিত মন। লন্ডনে তিনি দেখছেন মেয়েরা হেঁটে চলে বেড়ায় আর পাঁচজন স্বাভাবিক মানুষের মতোই। সামাজিক বিধিনিষেধ গুলি সেখানে একেবারেই অপ্রযোজ্য। তারা ছোট থেকে শরীরচর্চা এবং শারীর-শিক্ষায় অভ্যস্ত। জিমনাস্টিক, বিভিন্ন শারীরিক কসরতের খেলা ঘোড়ায় চড়া বা অন্য কোনো কাজ যাতে কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হয় তেমন সমস্ত কাজই মেয়েরা অবলীলায় অক্লেশে করে থাকে। তারা নিজেদের শারীরিক যত্ন নিয়ে থাকে নিয়মিত এবং কষ্টকর পার্বত্যভ্রমণ ইত্যাদিতে রীতিমতো প্রশিক্ষণ লাভ করে জীবনের শুরু দিন গুলি থেকেই। কৃষ্ণভাবিনী লিখছেন,

এখানে প্রায়ই এমন অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে পাই, যাঁহারা শারীরিক বল ও মনের তেজে অধিকাংশ বাঙ্গালী পুরুষদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ভদ্র ইংরাজ স্ত্রীরাযত রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়ায়, সচরাচর ভারতবর্ষীয় পুরুষেরা তত বেড়াইতে পারেন কি না সন্দেহ। আবার ইউরোপের মধ্যে সকল জাতির স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা এই দেশের স্ত্রীরা অধিক বলিষ্ঠ ও কষ্টসহ। ... এইরূপ সবল ও ক্লেশসহ মাতাদের যে সুস্থকায় ও বলবান সন্তান হইবে আর তাহারা পরে সাহসী, তেজীয়ান ও কর্ম্মঠ ইংরাজ পুরুষে পরিণত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য নাই। [পৃ. ৭৫-৭৬]

মেয়েদের কথা আলোচনা করার সময় কৃষ্ণভাবিনী মেয়েদের কোনো সামান্য বা অসামান্য লক্ষণই বাদ রাখেননি। মেয়েদের রূপ মেয়েদের পোষাক এবং পোষাক বিষয়ে অত্যধিক আড়ম্বর তিনি পছন্দ করতে পারেননি। মেয়েদের কৃত্রিম সাজ বিষয়েও একেবারেই ভালো লাগা ছিল না এক বিন্দু। এ নিয়ে কথা বলতে বলতে তিনি আলোকপাত করেছেন ইংরেজ দের একটি মূলগত চারিত্রিক প্রবণতার উপর। সেটি হল ইংরেজদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি, যার ফলস্বরূপ তারা 'হয়' কে 'নয়' বা ঠিক তার উল্টোটা করতে স্বতঃসিদ্ধ। যে কারণে সামান্য পোশাক পরিহিতা ভদ্র ইংরেজ রমণীর চেয়ে ঝলমলে পোষাক পরা 'নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক' ব্রিটিশ বিপণিবাহকদের বেশি চোখ টানে। কৃষ্ণভাবিনীর মনোভাবে প্রকাশিত উপনিবেশ দখলের ক্ষেত্রেও বণিক ইংরেজের এই মানদণ্ড ক্রমশ শাসক ইংরেজ হয়ে উঠতে তাদের সহায়তা করেছে। ইংরেজের এই জটিল এবং সুযোগসন্ধানী অথচ বিপুল উদ্যমী-পরিশ্রমী চরিত্রের দোষ ও গুণ দুটিই কৃষ্ণভাবিনী বিচার করেছেন কোনরকম পোলিটিকাল কারেক্টনেসের তোয়াক্কা না করে। বাঙালি মেয়ের এমন অসমসাহসে সত্যকথনের নিদর্শন ধরা থাকে যে লেখায় সে লেখা যে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি সমাজের ফাঁকফোকোরগুলি তুলে ধরবে অবলীলাক্রমে তাতে কোন সন্দেহই থাকে না পাঠকের। আর সেই স্বরকে দমিয়ে রাখার চেষ্টাও স্বাভাবিকভাবেই সমাজের মধ্যে থেকেই করা হবে সেটাও আমাদের বুঝতে বাকি থাকেনা। ভারতবর্ষে ফেরার পর সেই অবদমনের ছায়া কৃষ্ণভাবিনীর জীবনের উপর পড়েছিল অমোঘ হয়ে, আমরা পরে তা দেখতে পাবো। কৃষ্ণভাবিনী ব্রিটিশ সমাজব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষীয় সমাজের খোলনলচের খুঁটিনাটি আচারের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছিলেন। তা কিন্তু সত্যিই খুব সমাদৃত হয়নি বাঙালি সম্প্রদায়ের কাছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথ অসিচালনা করেছিলেন কৃষ্ণভাবিনীর বিরুদ্ধে। এই ইতিহাসে আসার আগে , সেই বিষয়ের উপর আমরা আলোকপাত করতে চাইব যা শুধু প্রাপ্তমনস্ক কৃষ্ণভাবিনীর বলিষ্ঠ ভাবনাকেই উন্মুক্ত করে না, ঘরের কোণে পড়ে থাকা বাঙালি নারী-পুরুষের সম্পর্ক-রসায়নের উপরেও সমান ভাবে আলো ফেলে।

'ইংরাজ মহিলা' এবং 'ইংরাজী বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবন' শীর্ষক অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজে তৎকালীন নারী-ভাবনার প্রতিটি ডিটেইল তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মন যে কতখানি জাগ্রত এবং উদ্দীপিত ছিল তার প্রমাণ সমস্ত বইটি জুড়ে। দেশীয় ঘোমটার শাসন তাঁর মনকে পরাভূত করতে পারেনি। মেয়েদের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন-কন্যাদের আত্মশাসন প্রণালী তাঁর আগ্রহের একটি বিষয় ছিল, কেননা দেশে গন্ডীবদ্ধ সমাজে কখনোই স্বাধীন পরিসর পাওয়ার সুযোগ কৃষ্ণভাবিনীর হয়নি, তাঁর স্বদেশীয় কোনো নারীরই সেসময় এই অভিজ্ঞতা লাভের অবকাশ ঘটেনি বলাই ভালো। পুরুষের যে মিথ্যে আবরণে মুড়ে নারীকে 'নষ্ট' হওয়ার কল্পিত অভিযোগে আটকে রাখার প্রয়াস তা কৃষ্ণভাবিনীর চোখে খুব বেশিই ধরা পড়েছিল। তাই প্রথম থেকেই বাঙালি সমাজপতিদের বাঙালি মেয়ের প্রতি একতরফা সামাজিক শাসন তাঁর মনে প্রশ্নের উদ্রেক করেছিল, যে , যে সমাজে নারী-পুরুষ স্বাধীনভাবে মিশতেই পারল না কোনোদিন, সেই সমাজে কীভাবে নারীর চরিত্র নির্ধারণ করা পুরুষের পক্ষে সম্ভব? এই চরিত্র নির্ধারণের কোনো মাপকাঠি আছে কী? তাছাড়া চরিত্র নষ্ট হওয়ার গেল গেল রব কেবল নারীকে কেন্দ্র করেই কেন আবর্তিত হবে? পুরুষের চরিত্র নির্ধারক মানদন্ডটি তবে কী? বা আদৌ কিছু প্রামাণ্য মত কি বাঙালি সমাজ মেনে চলে? আর তেমন কিছু প্রকরণ সমাজে না থাকলে নারীর যে কোনো রকম কাজ, যে কোনো রকম ভাবনা বা ইচ্ছে অবাধে নিন্দিত হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। শিক্ষিত বাঙালি শিক্ষার

বড়াই করেন অথচ মেয়েদের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখে সমাজে আঁটিসাঁটি কপাট সামলান, এ সমাজ কোনো সাম্যের কথা বলে না। এ সমাজ নিজেই এক বিভ্রান্ত অসাম্যের ধারক ও বাহক। তাই তিনি প্রস্তাব দেন , আগে বাঙালি মেয়েদের শিক্ষিত করে সচেতন হয়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হোক। তারপর তো স্বামী নির্বাচন বা ভালো বধূ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। যে নারীরা কখনো দিনমানেই তাঁদের স্বামীর মুখদর্শন করতে পারেন না, তাঁদের পক্ষে কীভাবে স্বামীর পছন্দমতো হয়ে ওঠা সম্ভব? উভয়পক্ষেই চাহিদা এবং যোগানের একটা স্বাভাবিক তফাৎ থেকেই যায় এবং বেশিরভাগ সংসারেই মিলের বদলে গরমিলের সুর শোনা যায়। আবার এখানেও আরো এক সমস্যা। হিন্দু বিবাহে কোনো বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া সাব্যস্ত করা নেই। ফলে ভয়ানক সংসারের আবর্তে স্বামী এবং স্ত্রীকে তিক্ততা ঘৃণা নিয়ে সারা জীবন একই ছাদের তলায় কাটিয়ে যেতে হয়। মৃত্যু ছাড়া এর কোনো প্রতিবিধান নেই। মেয়েরা শিক্ষিত হলে, স্বাধীন হলে, নিজের মতো ভাবতে এবং কাজ করতে পারলে যে আত্মসত্তার বিকাশ ঘটবে তা সমস্ত সমাজের জন্যই সামগ্রিক ভাবে মঙ্গলজনক হবে, নচেৎ বাঙালি মেয়ের বিড়ম্বনা ঘোচার নয়। এহেন দৃঢ় চরিত্র এবং মননের অধিকারিণী যে স্বাভাবিক ভাবেই ১৮৮৫তে বাঙালি সমাজে বাঙালি মেয়েদের হয়ে আইনি বিবাহবিচ্ছেদের জন্য সওয়াল করবেন তা ভাবতে একটুও অসম্ভব মনে হয় না। কিন্তু অবাক লাগে যখন দেখি ভ্রমণকাহিনীটি হয়ে উঠেছে সেই সওয়ালের আধার। আমি এখনো পর্যন্ত এমন অন্য কোনো ভ্রমণকাহিনী পাইনি, যেখানে নিজের সমাজের প্রতিটি গুণ এবং দোষ এতো তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। কৃষ্ণভাবিনী লিখছেন, ইংরেজদের বিবাহ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে থাকা স্বাধীনতার ভাবনার কথা। এখানে বিবাহেচ্ছু দুটি নরনারীর সম্মতিই আসল। এবং বিবাহের পর কেবলমাত্র সংসারের ঘানি টানা ছাড়াও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন বিবিধ কর্মের এবং শিক্ষার আবর্তে। তাছাড়া সামাজিক মেলামেশার পরিধিও নরনারী উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত সুবিস্তৃত হওয়ায় সতীত্ব ইত্যাদি বিষয়ের বায়বীয় চর্চা বহিরঙ্গে কম। আর একনিষ্ঠার মতো গুণগুলির কদর পুরুষের জন্যও সমানভাবে প্রযুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন,

আমাদের দেশে স্ত্রীত্যাগের ব্যবস্থা আছে। স্বামীত্যাগের মোকদ্দমা কখন শুনিতে পাওয়া যায় না। পতিব্রতা হিন্দুমহিলারা স্বামীর শত দোষ থাকিলেও এবং স্বামী ব্যাভিচার করিলেও , গোপনে সমস্ত সহ্য করেন, আর স্বামীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করাকে অতিশয় লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় বলিয়া ভাবেন। এদেশে বিবাহের পর ব্যাভিচার করাকে উভয়পক্ষেই ভয়ঙ্কর দোষ ও পাপ বলিয়া স্বীকার করেন। স্বামী যে কেবল নিজেরি ইচ্ছামতো কাজ করিবেন তাহা এদেশে কখন খাটে না। (পৃ. ৯৫-৯৬)

বলা বাহুল্য এহেন বৈষম্যহীনতা কৃষ্ণভাবিনীর মন কেড়ে নিয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে মেধাবী এই নারীর সঙ্গে সেসময় বাগযুদ্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নেমেছিলেন সমাজরক্ষার দায়ে এবং ভারতীয় কুলনারীর গৌরব বজায় রাখতে। সেই ইতিহাস সামান্য একটু ছুঁয়ে যাওয়া প্রয়োজন বঙ্গীয় সমাজের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। 'সাহিত্য' পত্রিকার আশ্বিন ১২৯৮ সংখ্যায় 'শিক্ষিতা নারী' প্রবন্ধে কৃষ্ণভাবিনী দাস আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের মেয়েদের তুলনা এবং উদাহরণ দিয়ে লিখেছিলেন কেন মেয়েদের শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন এবং তা কীভাবে নারীকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সমাজে। রীতিমতো সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছিল এই প্রবন্ধে। যার একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, 'সাধনা' পত্রিকার অগ্রহায়ণ,১২৯৮ সংখ্যায়। এসময় সাধনার দায়িত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সমালোচনাটি ছিল নামবিহীন (অস্বাক্ষরিত), কিন্তু সেটি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না লেখার এবং বক্তব্যের উপস্থাপন ভঙ্গী থেকে। লেখাটির বক্তব্য আজকের দিনে যতটাই গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট, ততটাই বিদ্রূপাত্মক, আক্রমণাত্মক এর প্রকাশ। বাক্য শুরু হয় এভাবে,

" "শিক্ষিতা নারী" প্রবন্ধে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী বিস্তর গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। ..." এরপর কৃষ্ণভাবিনীর মূল বক্তব্যকে নানাভাবে খন্ডন করার জন্য বলা হয়, "যিনি প্রকৃতির নির্দেশানুসারে সংসারে মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তিনি যে শিক্ষালাভ করিবেন তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নহে, বিতরণ করিবার জন্য। অতএব আমেরিকায় যে দোকানদারি আরম্ভ হইয়াছে সে কথা না উত্থাপন করাই ভাল, তাহার ফলাফল এখনো পরীক্ষা হয় নাই।" ১৩

এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধে লেখক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নন, তবে নারীর কর্মজগতের ঐকান্তিক বিচ্ছিন্নতার ঘোর বিরোধী। ঘরের আগল ভেঙে বেরিয়ে গেলে নারীকে কেরাণিই হতে হবে আসলে এমন একটা ভাবনায় লেখকের মন আচ্ছন্ন ছিলই। যদিও তিনি প্রবন্ধের শেষে স্ববিরোধী ভাবেই লিখেছেন,

"... তাহারা (মেয়েরা) স্তনদান এবং রান্না বাড়্না করুক, আমরা সে কাজগুলাকে আধ্যাত্মিক আখ্যা দিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিব এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সুখ সম্মানের পরিবর্তে দেবী উপাধি দিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে ক্রয় করিয়া রাখিব।" [কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বচিত প্রবন্ধ]

বোঝা সম্ভব রবীন্দ্রনাথ তখন ও যুগন্ধর কবিঋষিতে পরিণত হননি এবং সাংসারিক সীমায় নারীর মূল্যায়ন হিসেবে প্রচলিত সামাজিক ধারণাগুলির বশবর্তী ছিলেন। তখনো বাঙালি নারীর মতো তাঁর ও আত্মসত্তার বিকাশ সেভাবে হয়ে উঠতে পারেনি। কম বয়সের ঝোঁকে রবীন্দ্রনাথ যত সহজে নারীর ভূমিকা নির্ধারণ করেছিলেন, বেশ কয়েক দশক পর সেই বিন্দু থেকে অনেকটাই সরণ ঘটেছিল তাঁর। নারীকে কর্মজগতের, শিল্পজগতের আঙিনায় নিয়ে আসতে তাঁর আগ্রহ ছিল অসাধারণ। বাঙালি মেয়েদের নাচ বিষয়ে তাঁর কাজ এবং মতামত সেই ধারণাকেই পোক্ত করে। এর আগেও ঠাকুরবাড়ির মানসিক চলিষ্ণুতা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি, স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথ ও সেই প্রসাদগুণে বঞ্চিত হননি এবং পরবর্তী প্রজন্মের বাঙালি পুরুষের কাছে অনুসরণযোগ্য আদর্শও হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আমরা অন্য অধ্যায়ে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকে কীভাবে ক্রমশ মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণের পথ সুপ্রশস্ত করেছিলেন। তাই উনবিংশের রবীন্দ্রভাবনার এক ঝলক আমরা এই মেয়েদের ভ্রমণকথা সূত্রে দেখে নিতে চাইলাম বাঙালি সমাজের একটি বহুকৌণিক বিশ্লেষণের জন্য।

এবারে ফিরে আসি কৃষ্ণভাবিনীর 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলায়' | উনবিংশ শতকে এই একটি মাত্র টেক্সট আমরা পাই, যেখানে নারীশিক্ষা এবং স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি বিলেতের ভ্রমণকাহিনীতে বারে বারে ফিরে এসেছে। কৃষ্ণভাবিনীর বইয়ের সর্বত্রই প্রযুক্তিবিদ্যার জয়গান, আধুনিক জীবনের সুবিধা-অসুবিধা, বিদেশী চরিত্রের দোষ-গুণের সামাজিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তা সবসময়েই স্বদেশের পরিস্থিতি এবং সমস্যার ভিত্তিতে। বারে বারে তিনি নির্দেশ করেছেন আমাদের পরাধীন দেশের মানুষদের এবং বিশেষত মেয়েদের ঠিক কী কী মননগত এবং অবস্থানগত পরিবর্তন ব্যক্তিজীবনে এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুসরণ করে নিজেদের উন্নততর করে তোলা প্রয়োজন। কোনো সাধারণ ভ্রমণকাহিনী কখনোই সামাজিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এতোখানি গভীর , জটিল এবং বহুমাত্রিক বক্তব্য রাখেনা। এটা এক ও একমাত্র কৃষ্ণভাবিনী দাসের মেধাবী মন আর ভাবনার ফসল। অন্যান্য দেশের মেয়েদের দেখে নিজেদের দেশের মেয়েদের জন্য উৎকৃষ্টতর মডেল তৈরি করার ইচ্ছে অনেকেই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কোনোভাবেই সেইসব ভ্রমণকাহিনীতে একের পর এক সমস্যার সমাধানের পন্থাগুলি এতো নির্দিষ্ট ভাবে আলোচিত হয়নি। উনিশ শতকেই জগৎমোহিনী চৌধুরী ও ইংল্যান্ডে যান এবং একটি বই লেখেন, 'ইংলণ্ডে সাত মাস' | দুর্ভাগ্যক্রমে বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেই বইটি আমরা আমাদের কাজের জন্য সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। "ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা" বইয়ে কেবলি মেয়েদের যন্ত্রণা নয়, ভারতবর্ষীয় সমাজব্যবস্থার বিন্যাস এবং অভ্যাসের ফলে বাবা-মা এবং সন্তানের মধ্যবর্তী যে আদানপ্রদান, যা কখনো বিষাক্ত হয়ে উঠে সমস্ত সম্পর্ক নষ্ট করা ছাড়া কিছুই করে না তা নিয়েও কিছু বক্তব্য রেখেছেন কৃষ্ণভাবিনী। ইউরোপীয় দেশগুলিতে অভিভাবক এবং সন্তান সন্ততির সম্পর্কের মধ্যে যেন একটি খোলা আকাশ পুরে দেওয়া থাকে, আর তাতে কোনোভাবেই কোনোপক্ষেরই স্বাধীনতাস্পৃহা কিম্বা সম্মান কিছুই নষ্ট হয় না। হয়তো ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্কের দ্বন্দ্বগুলি কৃষ্ণভাবিনীকে এইভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল। তাছাড়াও কৃষ্ণভাবিনী ইংল্যান্ডের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পানদোষের উল্লেখ করেছেন, যা বাঙালি সমাজে সেসময় মূলত পুরুষদের মধ্যে এবং বারবনিতাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বিপুলভাবে। কৃষ্ণভাবিনী পানদোষের বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু আজকের সেক্যুলার বাঙালি সমাজের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পানীয়ের বৈষম্যহীন লিবারেটেড বিপণনের ছবি দুঃস্বপ্নেও তিনি ভেবে উঠতে পারেননি।

এবার চলে আসব বিংশ শতাব্দীতে।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মেয়েদের বিলেতযাত্রার আগল পুরোপুরি খুলে না গেলেও অনেকটাই প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল ভ্রমণের পথ। মেয়েরা নিজেদের গড়ে তুলতে চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে পড়ার যে সমষ্টিগত সাধনা করছিলেন, তা যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল নব্য-জনমানস কে। সেই সময়ের সামাজিক উদারতা-অনুদারতার ছবি স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েদের ভ্রমণকথায় ধরা পড়েছে। বিশেষত বিধর্মী

শাসকের দেশে পদচারণার ক্ষেত্রে, যেখানে তখনোও সামাজিক শাস্তির ভয় কার্যকর ছিল। তবে এক্ষেত্রে একটা একপেশে সামাজিক ব্যবহার লক্ষণীয়। পুরুষ দের ক্ষেত্রে বিশ শতকের প্রথম দিকে আর বিলেত বা অন্যান্য দেশে কালাপানি পেরিয়ে যাত্রা করার মাশুল হিসেবে প্রায়শ্চিত্তের কোনো বালাই প্রায় রইল না, তা পর্যবসিত হল পারিবারিক মান-অভিমান পালায়। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এমনকি বিদ্যালয় পেরিয়ে মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের বিরোধিতাও তখনো পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ফলে সেই মেয়েদের বিলেত বা অন্যান্য দেশভ্রমণকে পুরুষ-দৃষ্টির (মেল গেজ) সমাজ ভালো চোখে দেখেনি; কালাচার হিসেবে মেনে নিতে চেষ্টা করলেও তখনো পর্যন্ত মন থেকে মেনে নেওয়া সার্বিকভাবে শুরু হয়নি। তাছাড়া মেয়েরা তাদের পরিবার বা স্বামীর সঙ্গে যাবেন এটাই ছিল রীতি। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশকের শেষে বিমলা দাসগুপ্তা এই রীতি ভাঙলেন। বিমলা দাসগুপ্তা সেই সময়েই পারিবারিক ভাবে একাধিকবার বিলেত গিয়েছিলেন। তার একটি প্রধান কারণ তাঁর দাদা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত কাউন্সিল মেম্বার হওয়ায় লন্ডন নিবাসী ছিলেন। কিন্তু লন্ডন থেকে যেবার নরওয়ে এবং সুইডেন ভ্রমণ করলেন, সেটা ১৯১০-১১। তাঁর লেখাগুলি কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ, চৈত্র ১৩২০ (ইং ১৯১৩) এবং জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক ও পৌষ ১৩২১ (ইং ১৯১৪) সংখ্যায়। এসময় তাঁর স্বামীর কোনো উল্লেখ নেই ( সীমন্তী সেন মনে করেছেন বিমলার স্বামীর প্রয়াণের পর তাঁর এই ভ্রমণ এবং আমরাও এই মতটিই অনুসরণ করছি, কারণ সমস্ত লেখাতেই একবারের জন্যও স্বামীর কথা উল্লিখিত হয় না, অথচ বড়োদাদার কথা বহু সময়েই এসেছে| তাছাড়া নিজের শ্বেতশুভ্র পোষাকের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন সুইডেন ভ্রমণের কথা বলার সময়) এবং একটি লক্ষণীয় বিষয় বিমলা একা যাচ্ছেন কুক কোম্পানির টিকিটে। একই জাহাজে কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু যাচ্ছেন বটে তবে কলকাতা থেকে লন্ডন ১৯১০-এ এক বাঙালিনীর একেবারে একা যাওয়াও খুব জরুরি একটি ঘটনা এতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং স্বদেশের এতো স্থানমাহাত্ম বাকি থাকতে বিদেশ কেন যাচ্ছেন, এ বিষয়ে মনস্বিনী বিমলা সরাসরি জানাচ্ছেন,

অনেকে বলিতে পারেন যে স্বদেশে এত দেখিবার স্থান থাকিতে বিদেশ, বিশেষতঃ সাত সমুদ্র তের নদী পারে যাওয়ার আবশ্যকতা কি? কথাটা খুবই সত্য ... তবে কথাটা তলাইয়া দেখিলে অনেকেই হয়তো বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের দেশে আজও স্ত্রীলোকের পক্ষে, সকল জায়গায় যাতায়াত তত সহজ ও সুবিধাজনক হয় নাই। অনেক স্থলে ত এক রকম অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এজন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকের কোথাও যাওয়া ঘটে না। কিন্তু য়ুরোপের প্রায় সকল স্থানেই সকল রকম যাত্রীদের সুখ ও সুবিধার জন্য বেশ সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। এমন কি একজন প্রাপ্তবয়স্কা রমণীও নির্ভয়ে একাকিনী দূরদেশে যাতায়াত করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোনরূপ অবমানিত বা লাঞ্ছিত হওয়ার কোনোই আশঙ্কা নাই। এইসব কারণেই নানা দিক্ চিন্তা করিয়া স্বদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা আপাততঃ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।[১৩] [ পৃ. ১৯]

স্পষ্টভাবে নিজেদের দেশের এবং সমাজের মানসিকতা তুলে ধরেছেন বিমলা অল্প কথায়। এই সমস্ত লেখাটিতে বিমলার ব্যক্তিগত উন্নত-উদার শিক্ষিত কবিমনের অবিরল প্রকাশ। সংস্কৃত সাহিত্যে ডুবে থাকা বিমলার উপমা তুলনা একেবারে ক্লাসিকাল। নরওয়ের ফিয়র্ড, সমুদ্র আর বরফ মোড়া পাহাড়ের রূপ দেখে বারে বারে তাঁর শিব-শক্তির পরম রূপের তুলনা মনে এসেছে। ক্রমশ কয়েকটি উদাহরণ দেবো কারণ এমতো কবিচিত্ত অন্য কোনো ভ্রমণকাহিনীতে কখনো এর আগে প্রকাশ পায়নি। বাঙালি মেয়ের শিক্ষার ধারা যে নারীশিক্ষা প্রচলনের অর্ধশতক পেরিয়ে ক্রমোন্নত হচ্ছিল তার নিভৃত বয়ান বিমলা দাসগুপ্তার ভ্রমণকাহিনী।

তবে প্রথমেই যাত্রাকালীন আনন্দের ছবিটি তুলে ধরব লেখকের কলমে। নির্বিঘ্নে টিকিট কাটা সমাধা হওয়ার পর রসোচ্ছল ভঙ্গীতে লেখেন,

মনে মনে ভাবিতাম একটা সখের খাতিরে এতো অর্থ ব্যয় করা সঙ্গত কি না! ... তারপর আরেক ভাবনা হইল যে, আমার খাওয়া –দাওয়ার ব্যবস্থা মোটেই পাশ্চাত্য দেশ-ভ্রমণের উপযোগী নয়, এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য জানিবার জন্য মনকে তাগিদ্ করাতে, সে এ সকল তুচ্ছ বিষয় গ্রাহ্য করিবে না এবং সম্ভবত সকল অসুবিধা ভোগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না বলিয়া কথা দিল। দৈব দুর্বিপাক ব্যতীত আপনার স্ফূর্ত্তি রক্ষায় কখনও বীতস্পৃহা দেখাইবে না এরূপ স্থির-সংকল্প জানাইল। তখন আমি আশ্বস্ত হইয়া যাত্রার দিন ধার্য করিলাম, এবং "City of London" নামক জাহাজে টিকিট্ কিনিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইলাম। [ পৃ. ১৯]

বিমলার লেখায় জাহাজ-পথের ছবি খুব বেশি আসেনি, কিন্তু মূলত নরওয়ে যাত্রার ছবিই তাতে মুখ্য। যেহেতু জাহাজেই লম্বা সময় নরওয়ে যাত্রীদের কাটাতে হয় তাই স্বাভাবিক ভাবে জাহাজ বিষয়ক বিবিধ চিত্র দেখা যায়, যার একটি অন্যতম সাধারণ চিত্র কালা আদমির প্রতি এবং

তাদের পোষাকের প্রতি ইয়ুরোপীয় মানুষের তির্যক আচরণ। আর তারই মধ্যে দিয়ে ক্রমশ উদ্ভাসিত হয় বিমলার নিজের এবং বাঙালি সমাজের সমষ্টিগত আঁতের কথাটি। সেটিতে যাওয়ার আগে সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভারে ডুবে থাকা বিমলার নিজের ভাবনার গড়ণ টি জেনে নেব। তিনি বিদেশে গিয়েছেন কিছু দেখতে জানতে শুনতে, আবার তারই মধ্যে অনেক কিছুই তিনি দেখতে চাননি, জানতে চাননি, বিশ্বাস করেননি। ইয়ুরোপীয় দ্রষ্টব্য বলেই যে তার সমস্তটুকু নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে এই ভাবনা একেবারেই রদ করেছেন বিমলা। যে কারণে কখনও কখনও সুইডেনের আর্ট গ্যালারি বা ম্যুজিয়ম দেখতে তাঁর পা সরেনি, জানিয়েছেন,

লন্ডনেই তো আর্টের চূড়ান্ত দেখা হইয়াছে।

আবার কখনও এমনকি নরওয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখেও ততখানি বিগলিত হতে পারেননি, ঠিক যেমনটি তিনি হিমালয়ের সামনে বোধ করেন। এবং নির্দ্বিধ ভাষায় এইটি জানাতেও তিনি পিছপা নন। ফেরার পথে ডেনমার্কে হ্যামলেটের সমাধি দেখে অবিশ্বাস করার যে প্রবল স্পৃহা, তা কোনো সাদা বা কালো চামড়ার ভেদ মানেনি। আবার জাহাজে সহযাত্রী-যাত্রিণীদের নৃত্যানুষ্ঠান বিষয়ে কিম্বা বিশেষত নারীদের পানাভ্যাস বিষয়ের তির্যক মন্তব্য ও খুবই সাধারণ ভারতীয় নারীর অভিজ্ঞান বহন করে। তবে একটি কথা আবারো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, হয়তো ইচ্ছাকৃত ভাবেই। নারীর সম্মান রক্ষা। লিখছেন সামান্য একটি বাক্যে,

সভ্যদেশের—কি ধনী কি দরিদ্র, কি শিক্ষিত কি মূর্খ, সকলেই শিশুকাল হইতে নারীজাতির সম্মান করিতে শিখে। কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই; [পৃ. ৩২]

বিভিন্ন নারীর বারে বারে বিলেত এবং য়ুরোপ ভ্রমণে এই কথাটি এতোভাবে লিখিত হয়েছে যে তার থেকে বোঝা সম্ভব অন্তত বাঙালি মেয়েরা নিজেদেরকে যেমন উন্নত, নব্য বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তথাকথিত 'সভ্য' সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছিলেন তেমনি চোখে আঙুল দিয়ে সর্বসাধারণ্যে বাঙালি পুরুষের কী কৃত্য তাও বারে বারে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। ক্লাস এবং মাস উভয় ক্ষেত্রেই বাঙালি পুরুষকেও যে নারীর সঙ্গে সমাজ গড়ার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে তার আভাস বিমলা দাসগুপ্তার লেখায় ও নানাভাবে আমরা পেয়ে থাকি।

জাহাজ থেকে নেমে নরওয়ের বিভিন্ন স্থান পর্যটনের সময় একবার ঘোমটার প্রসঙ্গ এসেছে। প্রয়োজনে দেশাচার এবং কালাচার বজায় রেখেও বাঙালি নারী যে সমস্তরকম শীল এবং শালীনতা বজায় রাখতে পারেন তারই প্রসঙ্গে। রসময় লেখনীতে বলছেন,

বঙ্গরমণীদের উপযুক্ত শীত-বস্ত্রের কোনও অভাব আমাদের ছিল না, কিন্তু শিরস্ত্রাণ লইয়াই যত গোলযোগ! –অবগুণ্ঠনই আমাদের চিরাভ্যস্ত দেশাচার-সম্মত সর্ব্বদা-সর্ব্বত্র-ব্যবহার্য শিরস্ত্রাণ; সুতরাং ইহা গুরুভার হইলে চলে না, তাই সম্ভবমত লঘুভার বস্ত্রই তদুদ্দেশ্যে আমরা ব্যবহার করি। ... এক্ষেত্রেও আমরা সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনাচ্ছদনে মস্তক আবৃত করিয়াই গিয়াছিলাম। এজন্য অপরজাতীয় সহযাত্রীগণ আমাদের জন্য নিয়ত বিশেষ উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন। যাহা হউক, সহযাত্রীদিগের এতো আশঙ্কা-উদ্বেগ সত্ত্বেও আমরা যে একদিনের তরেও অসুস্থ হই নাই, সেটা কেবল আমাদের প্রতি বিধাতার অশেষ করুণার পরিচায়ক বলিতে হইবে! [পৃ. ২৭]

বিমলার মনের মধ্যে জাতীয়তাবাদের স্পষ্ট প্রকাশ নানাভাবে। বিভিন্নরকম মানুষকে দেখে তাঁর অভিব্যক্তি,

এদেশের লোকেরাও কি সেই 'শস্যশ্যামলাং মাতরম্' কে দেখিতে পায়? এদের মা ও কি তেমনি সন্তান বৎসলা? এরা কি মায়ের সুসন্তান না কুসন্তান? মায়ের দেওয়া খাবার কাপড়েই এরা মানুষ? –না আমাদের মতো পরমুখাপেক্ষী দীনদুঃখী নিতান্ত বেহুঁস্। [পৃ. ৪২]

কোনো সহযাত্রী ভারতবর্ষ কেবলি বাঘ ভালুকের বর্বর মুলুক কিনা জানতে চাইলে বিমলা জানান,

হ্যাঁ, আমাদের দেশে বাঘ ভাল্লুক বাস করে বটে, কিন্তু তা বলিয়া তাদের মুল্লুক এ কথা মানিতে পারিনা। ইন্ডিয়াটা কত বড় এর উত্তরে এক কথায় বলিতে পারি, তোমাদের মতো কত নরওয়ে তার মধ্যে অনায়াসে পুরিয়া রাখিতে পারে কেউ টের ও পাবে না! এতো যে তোমরা পাহাড়ের বড়াই করো, তোমাদের

পাহাড়ের উচ্চতা দেখিলে আমাদের হাসি পায়। তবে দুই-চার হাজার ফিট উঁচুতেই বরফ জমে বলিয়া তার একটা বিশেষ বাহার আছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা , ধবলগিরির ইত্যাদির বিপুলতা ও উচ্চতা তোমরা ধারণাই করিতে পারনা। [পৃ. ৪৭]

আবার কোন একটি দ্বীপের সামান্য অধিবাসীদের কুটিরে আগুন লেগে গেলে জার্মানীর রাজা যেভাবে পারেন দলবল নিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচান কিন্তু নরওয়ে গামী বিমলাদের জাহাজের কুমিল্লানিবাসী খালাসীরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধারণ ইয়ুরোপিয়ান মানুষের জীবন বাঁচিয়ে আসার পর নতুন বোধে নিষিক্ত বিমলা লেখেন,

এতোদিন যে কালো কালো কমিল্লাজিলার খালাসিগুলোর দিকে তাকাইবারও কারো প্রবৃত্তি হয় নাই আজ তাহাদের সৎসাহস ও কার্য্যকারিতা অজানিত দেশের লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম! এই গরীদুঃখীদের গৌরবে আপনাদেরকে মহাগৌরবান্বিত মনে করিলাম। আজ ইহাদের সঙ্গে একীভূতভাবে ''ইন্ডিয়ান্'' বলিতে স্পর্দ্ধা অনুভব করিলাম। বিদেশে আসিলে দেশের যে কোনো লোকের প্রতি যে আপনার ভাব হয়, দেশে থাকিলে তেমনটী হয় না, আজ তাহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। [পৃ. ৪৯]

বারে বারে নানা ভাবে স্বদেশের পরাধীনতার খেদ প্রকাশিত হয়েছে এই লেখায়। হাসির ছলে লেখা বার বার নিজেদের কালা আদমি বা নরোইজিয়ান পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে লাঞ্চে বসে নিজেদের এই সম্মিলনকে সাদা-কালোর জটলা বলে অভিহিত করার মধ্যে দুঃখজনক শ্লেষ লুকিয়ে আছে।

আর একটা জিনিস এই লেখায় নতুন পাওয়া যায়, কোনো রবীন্দ্রগানের উদ্ধৃতি! এর আগে কোন নারীর কোন ভ্রমণকথায় আজকালকার মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতের উদ্ধৃতি পাওয়া স্বাভাবিক ভাবেই অসম্ভব ছিল। এখানে বিমলা নরওয়ের তুষারাবৃত পর্বতমালার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দুটি লাইন মন থেকে উদ্ধৃত করেছেন, ''বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো/ সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো''

এখানে যে কথাটি বলার, বিমলা দাসগুপ্তা সর্বপ্রথম বঙ্গরমণী যিনি নরওয়ে পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। আবার সেই বিমলারই লেখার মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির যে পরিবর্তমান রেখাচিত্র তার একটি স্পষ্ট আভাস পাওয়া সম্ভব। বাঙালির সাংস্কৃতিক মানচিত্রে এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাঁই করে নিতে শুরু করেছেন, এই রাবীন্দ্রিক সূচনাপর্বের আভাস বাঙালিনির ভ্রমণ বৃত্তান্তকে এবং তাঁদের সামাজিক ইতিহাসকে অবশ্যই সমৃদ্ধ করেছে।

পরবর্তী পূর্ণায়তন ভ্রমণকাহিনীতে যাওয়ার আগে ১৯২৪ এবং ১৯২৮ সালে শোভনাসুন্দরী দেবীর (১৮৭৭-১৯৩৭) তিনটি ছোট ভ্রমণকাহিনীর সমাহার পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি একটি ভ্রমণকে কেন্দ্র করেই তিনটি বিভিন্ন পত্রিকায় পরবর্তীকালে লিখিত হয়েছিল। শোভনাসুন্দরী দেবী রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম কন্যা। এই পরিচয় টি দেওয়া জরুরি বোধ হল কারণ শোভনাসুন্দরীর লেখা থেকেই বিংশ শতকের ব্যক্তিনির্ভর ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটল বাঙালি মেয়ের ভ্রমণলেখায়। এখানে সমাজের কথার চেয়েও বেশি করে এসেছে দুই কিংবদন্তী বাঙালি কথা এবং সমস্ত ভ্রমণকথাটুকু পড়লে বোঝা সম্ভব কেমন ভাবে শোভনাসুন্দরীর ভ্রমণ একটুকরো ছোট্ট মৌক্তিক হয়ে উঠেছে যেখানে ক্রমশ একক মানুষ উঠে আসছে সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রে। ব্যক্তির ভালোলাগা,মন্দ লাগা, ব্যক্তির শিক্ষা, দেশ এবং জাতি গঠনে ব্যক্তির ভূমিকা এবং সর্বোপরি দেখার চোখে ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগততার প্রকাশ।

শোভনাসুন্দরী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর য়ুরোপ গিয়েছিলেন ১৯২০তে। তাঁর লেখাগুলি প্রকাশিত হয় ক্রমানুসারে,

''য়ুরোপে মহাসমরের পরে'', 'সারদা', আষাঢ় ১৩৩১ (ইং.১৯২৪)

''রণক্ষেত্রে বঙ্গমহিলা (মহাযুদ্ধের পর)'', 'চতুরঙ্গ', ফাল্গুন ১৩৩৫ (ইং.১৯২৮) এবং ''মহাযুদ্ধের পর প্যারী নগরীতে'', 'চতুরঙ্গ', ফাল্গুন ১৩৩৫ (ইং.১৯২৮)। [১৫]

শোভনাসুন্দরী বহুকাল ধরেই রাজস্থানের জয়পুর প্রবাসী ছিলেন। লোরেটো স্কুলে শিক্ষিতা শোভনাসুন্দরীর ইংরিজির সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ভাষাজ্ঞানও মন্দ ছিল না। ১৯২০ সালে তিনি একাই য়ুরোপ ভ্রমণে যান থমাস কুক সংস্থার সঙ্গে। আমাদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণের ইতিহাসে এইটিই সর্বপ্রথম একা ভ্রমণের নিদর্শন আমরা পাচ্ছি। খুবই পরিতাপের কথা দেশের মধ্যে মেয়েদের একাকী ঘোরার আয়োজন হয়ে উঠতে আরো অন্তত দু দশক লেগে যাবে এবং তাও শুরু হবে জেলভ্রমণের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। অথচ এরপর আমরা আরো একাধিক একক নারীর যাত্রা পাই যা দেশীয় সীমার বাইরে। আর এই সমস্ত ভ্রমণেই মেয়েরা সমাজের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করেছেন। কারণ তাঁরা ক্রমশ পরিণত বয়স্ক এবং মনস্ক দুইই হয়েছেন। তবু কি দ্বিধা ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। ক্রমশ দেখবো।

ফিরে আসি শোভনাসুন্দরীতে। এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণকথাগুলিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের আঁচ পাওয়া যায়। লন্ডন ঘুরতে যাওয়ার আগেই তিনি বলছেন লন্ডন সম্পর্কে,

আমি সেই কোলাহলময় কলকারখানার দেশে চল্লাম, যেখানে বসন্তে পিক ডাকে না। ট্যাক্সির বাঁশীতে কর্ণ বিদীর্ণ হয়, যেখানে কৌমুদীর পরিবর্তে বিজলির আলো রাজপথ আলো করে … যেখান হতে কী ছুঁচ কী লজ্জা নিবারণের বস্ত্র জাহাজ ভরে ভরে এদেশে চালান করা হয় আমি সেই কোলাহলময় কলকারখানার কেন্দ্র ভারতের ভাগ্যবিধাতার ভূবৈকুণ্ঠ লন্ডন নগরে চল্লাম। [পৃ. ২০৫]

চাপা শ্লেষে উদ্দীপ্ত এই আলাপ পরিচয়ের মুখবন্ধেই শোভনাসুন্দরী বলেছেন লণ্ডনে যেহেতু সূর্যালোকের মুখ দেখা যায় না তাই ভারতবর্ষ থেকে সূয্যিরশ্মি বিলেতে বোতলবন্দী করে বিক্রি করলে সে ব্যবসা বেশ চলবে। সব পেয়েছির দেশ বিলেতকে এভাবেই বারে বারে মাটির দেশ বলে দেগে দেওয়ার কাজটি বঙ্গললনারা করেছেন প্রয়োজনবোধে।

শোভনাসুন্দরীর লেখায় দুজন প্রখ্যাত বাঙালির কথা এসেছে, যাঁরা তাঁদের সমকালে নিন্দিতও হয়েছিলেন সমাজসংস্কারের অগ্রপথিক হওয়ায়। প্রথমজন রাজা রামমোহন রায় এবং দ্বিতীয়জন দ্বারকানাথ ঠাকুর। এর মধ্যে স্বয়ং দ্বারকানাথেরই প্রপৌত্রী শোভনাসুন্দরী। তিনি তাঁর লেখায় যেন নিজের কালের মানুষকে স্মরণ করাতে চেয়েছেন এই দুই পূর্বপুরুষকে যাঁরা একাকী নির্জনে সমাধিস্থ হয়ে রয়েছেন বিদেশের মাটিতে। রামমোহন রায়কে শোভনাসুন্দরী উল্লেখ করেছেন, ভারতের ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি এবং শিক্ষার আদি সংস্কারক বলে। তাঁর সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর প্রায় একশো বছর পর বলছেন, ভারতে এখন স্বাধীনতার মলয় সঞ্চার হতে আরম্ভ হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় জীবিত থাকলে আজ তাঁর কী আনন্দ হত। রাজা পরীক্ষিত যেমন মৃত সর্পকে উত্তোলন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও তেমনি এই মৃত জাতিকে উত্তোলন করে গেছেন। তাঁহার আত্মা আজ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে ভারতের ভাগ্য সংরক্ষণ করছেন।

শোভনা লিখছেন দ্বারকানাথের বিলেত আসার কথা। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর দশ বছর পরেই তিনি বিলেত এলেন। সেসময় দ্বারকানাথ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এর সর্বেসর্বা ডিরেক্টর ছিলেন। বিলেতে এসে অসামান্য বিপুল অভ্যর্থনা পেতে থাকলেন। সম্পূর্ণ ইংরেজি কায়দায় আমোদ-প্রমোদে মত্ত দ্বারকানাথের সমাধিস্থল কেনসাল গ্রিনে আজ সামান্য দীপ জ্বালাবার ও কেউ নেই, এই চরম সত্য এবং অবিনাশী নশ্বরতা শোভনাসুন্দরীকে অত্যন্ত আঘাত করেছিল।

অদ্ভুতভাবে শোভনাসুন্দরী মনে করেছেন ভারতবর্ষের সেইসব বীর সন্তানকে যাঁরা ইংরেজের হয়ে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছেন অকালে দলে দলে, ইংরেজেরই স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হয়ে। দেশীয় সৈনিকদের প্রতি এমন শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এর আগে কোনো ভ্রমণকথায় দেখা যায়নি। বোঝা সম্ভব অসহযোগ আন্দলনের প্রভাব শোভনাসুন্দরীকে ভাবতে বাধ্য করেছিল সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া , ইংরেজের হয়ে নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করা ভারত সেনানীর কথা।

শোভনাসুন্দরী একাই ঘুরেছেন লন্ডন , প্যারিস এবং আয়ার্ল্যাণ্ড। একই সময়ে সস্ত্রীক জগদিশ চন্দ্র বসু ফ্রান্সে ছিলেন এবং প্যারিসে একই হোটেলে উঠেছিলেন তাঁরা। সেই সাক্ষাতের কথাও জানা যায় শোভনাসুন্দরীর লেখায়। সদ্যবিগত বিশ্বযুদ্ধের পরিণতির ছবি ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, ইংলণ্ডের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি তুলে ধরেছেন কয়েকটি কথায় আর ডাবলিনে তখনো কিছু ধ্বংসলীলা চালাচ্ছিল জার্মানরা, সেই

ভয়াবহতার কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। এছাড়াও শোভনাসুন্দরী যে সময়ে য়ুরোপ ভ্রমণ করছেন, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির পর অনেকগুলি বছর কেটে গিয়েছে এবং তিনি তখন য়ুরোপে অত্যন্ত পরিচিত এক বিশ্বমণীষার নাম। তাই শোভনা যখন প্যারিসে কোন এক ফরাসী সভায় গান গাইবার সময় ‘‘শুধু যাওয়া আসা’’ রবীন্দ্রসঙ্গীত গান তখন আমাদের এযুগের জন্মাবধি রবীন্দ্রসঙ্গীতে অভ্যস্ত মানুষের ততোটা অবাক লাগে না। শোভনাসুন্দরীর লেখায় আরো একটি তথ্য আমাদের চমৎকৃত করে, তা হল শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর [১৬] লেখা গানে ফরাসী সুর দিয়ে গাওয়ার বিবরণ। ভারতীয় সঙ্গীতের মেলোডির চেয়ে বলাই বাহুল্য পাশ্চাত্য সঙ্গীতের হারমনির প্রভাবই সেখানে বেশি। প্রবাসী হলেও সরোজিনীর বাঙালিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা অসম্ভব আর এহেন বঙ্গললনার কবিতায় ফ্রেঞ্চ সুরে গান গাওয়া খোদ প্যারিসে সেইটি আরোই দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

শোভনাসুন্দরীর এই লেখা থেকে বুঝতে পারি ক্রমশ বাঙালি কন্যারা নিজেদের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করছেন নারী হিসেবেই নয়, একজন মানুষ হিসেবেও। ঠাকুরবাড়ির কন্যা হিসেবে শোভনা বা অন্যান্যদের যে সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁচের শিক্ষা, দীক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে বড়ো করা হত তার সহায়তা অনেকেই পেয়েছেন। ঠাকুরবাড়ির আরেক কন্যা মনীষা দেবী ইয়ুরোপ ভ্রমণের উল্লেখ পেলেও তাঁর কোনো লেখার সন্ধান আমরা পেতে পারিনি। জানা যায় পিয়ানোয় তিনি অসামান্য পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁর পিয়ানোয় হিন্দুস্তানি মার্গসঙ্গীত শুনে মণীষী ম্যাক্সমুলার চিঠি লিখে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। [১৭]

এর পরবর্তী দশকের বাঙালি কন্যাদের ইয়ুরোপ ভ্রমণে বর্ণাঢ্যতার ছোঁওয়া লেগেছে। এবং একটি ক্ষেত্রে তা অকল্পনীয় হয়ে উঠেছে। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের দুটি লেখা। দুটিই বিশিষ্টতায় পরিপূর্ণ। দুটি লেখাই সমসাময়িক। এমনকি দুই নারীর ভ্রমণকাল ও প্রায় একই। এঁরা যদিও গিয়েছিলেন আলাদা ভাবে এবং কেউ কাউকে না চিনলেও দেশে ফিরেছিলেন ইতালি থেকে একই জাহাজে।

পরে এঁদের একজন জগৎ বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী হয়েছেন। শ্রীমতী অমলা শঙ্কর। যখন তিনি বাবা শ্রী অক্ষয় নন্দীর সঙ্গে ইয়ুরোপ ভ্রমণে যান তখন তাঁর বয়স বারো বছর এবং তিনি কুমারী অমলা নন্দী। অপরজন শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ। তাঁর বাবা ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম এবং খ্যাতনামা মনোসমীক্ষক শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বোস। দুর্গাবতী শিক্ষিত এবং প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন এবং প্রথম বার ইয়ুরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলে স্বামী শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। সেইবারই লিখেছেন ভ্রমণকথা ‘পশ্চিমযাত্রিকী’। পরেও দুর্গাবতী দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার গিয়েছেন , অমলা গিয়েছেন অসংখ্যবার ইয়ুরোপ বেড়াতে, কিন্তু দুজনের কেউই আর নতুন কিছু লেখেননি।

অমলা নন্দীর (১৯১৯-২০২০) বইয়ের নাম ‘সাত সাগরের পারে’ [১৮]। বইটির রচনাকাল ১৯৩১-১৯৩৩, আর অমলার ভ্রমণকাল ছিল এপ্রিল ১৯৩১ - অক্টোবর ১৯৩২। প্যারিসে ‘ইন্টারন্যশনাল কলোনিয়াল এক্সপোজিশন’-এ যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ অলঙ্কার নির্মাতা এবং ইকনমিক জুয়েলারি ওয়ার্কসের কর্ণধার ব্যবসায়ী অক্ষয় নন্দী। কুমারী অমলা এঁরই কনিষ্ঠা কন্যা। অমলার লেখায় দেশের ছবির চেয়েও বেশি পাওয়া সম্ভব হয় বিদেশে গিয়ে স্বাধীন বাঙালি মেয়ের ভাবধারা এবং মনোজগতের সন্ধান, যাঁর জীবন এই বেড়ানো উপলক্ষেই উত্তরিত হয়েছে অনবদ্য এবং অবর্ণনীয় ইতিহাসে। তবে বইটির শুরুতেই অমলার বাবার হ্রস্ব মুখবন্ধে পাওয়া সম্ভব হয় দেশীয় বাঙালির ভাবধারাটুকু। তিনি বলছেন, ‘বিদেশে বাণিজ্য-যাত্রায় দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা অমলাকে সঙ্গে লইলাম কেন—সপ্তমবর্ষীয় পুত্রটিকে লইলে বোধহয় কোনো কথা ছিল না।’ [‘গ্রন্থসূত্র’, শ্রী অক্ষয় কুমার নন্দী, সাত সাগরের পারে]

বিশ শতকের সাধারণ বাঙালি মেয়েদের জন্য শিক্ষার পথ খুলে গেলেও সমাজমানসের বাধা খুব বেশি দূরীভূত হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ ঠাকুরবাড়ির যে পারিবারিক রিফর্মেশন তা সাধারণ বাঙালি পরিবারে এমনকি আজও ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। অক্ষয় নন্দীর মতো বাবা না থাকলে অমলার এমন একটি অসামান্য ভ্রমণকথা এবং নারীজীবন আমরা পেতে পারতাম না এ কথা বলতেই হয়। অমলারা দুই বোন বাংলাদেশের বাটাজোড়ে থাকলেও বেশির ভাগ সময় কলকাতায় থাকতেন এবং লোরেটো স্কুলে পড়তেন। সমস্তটাই তাঁদের বাবার অদম্য ইচ্ছের ফল। তবু

বাবা অক্ষয় নন্দী সামান্য হলেও সমাজ-সংস্কার মেনেছেন তা বোঝা যায় যখন মুখবন্ধে অমলা যে শুধু বিদ্যাশিক্ষা বা দেশভ্রমণ এবং নাচেই পটু নন, বরং সংসারে হাতে হাতে মায়ের সঙ্গেও কাজ করেন ঘরের এবং তারপর সময় করে বই লিখেছেন এই তথ্য সরবরাহ করেন।

বারো বছর বয়সে কুমারী অমলা বাবার সঙ্গে প্যারিস গেলেন। যাওয়ার সময় মা গ্রামে থাকায় তাঁর সঙ্গে দেখা হল না, কিন্তু অমলা লিখেছেন তার জন্য সামান্য মনখারাপ হল কি হল না নতুন দেশ দেখার আনন্দ ছোট্ট বালিকার মনে উপচে উঠতে লাগল। যাওয়ার আগে তিনি জানতেন প্যারিস মানে পারস্য দেশ। আর ছয় মাস প্যারিসে বসবাস করে, ইয়ুরোপের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে তিনি বুঝেছিলেন, সমস্ত পৃথিবী তিনি একা চষে ফেলতে পারেন। বাঙালি মেয়ের ভেতরে এই যে দৃঢ়তা দীপ্তি এনে দিল ভ্রমণ তা অতুলনীয়। লক্ষ্য করা যায় এই বিশ শতকের মেয়েরা সকলেই ইংরেজি শিক্ষিত। তবু দেশীয় ছাঁদে চলন তাঁরা ত্যাগ করেননি। এতে বিদেশের মাটিতে বঙ্গললনা তথা ভারতীয়কন্যার মাধুর্য বেড়েছে বই কমেনি। আর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তখন দেশমাতৃকার পরাধীনতা বিষয়টি ক্রমশই পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। সে কথা অমলাশঙ্করের লেখায় যেমন পাওয়া যায় দুর্গাবতী ঘোষের লেখাতেও পাওয়া যায়। তখন আর কেবল ইংরেজের সদ্-গুণগুলি খোঁজা এবং বাঙালি জীবনে ও জাতিগঠনের জন্য প্রয়োগের কারণে ইয়ুরোপ ভ্রমণের আর কোনো প্রয়োজন ছিল না।

অমলা নন্দী বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে নিজে লিখেছেন কন্যাদের প্রতি পিতার সমর্থনসুচক মনোভাবের কথা। তাই যাওয়ার ঠিক পাঁচ দিন আগে কন্যার বায়না সযত্নে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে এই ইচ্ছেও পোষণ করেছিলেন অক্ষয় নন্দী যে অমলাকে কোনো বিদেশী শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি করে দিয়ে আসবেন। সমকালের তুলনায় কেমন প্রাগ্রসর বাবার ভূমিকা। এ থেকে আন্দাজ করা যায় সামাজিক খোলনলচে বদলের আয়োজন বাঙালি করতে শুরু করেছিল। অমলার লেখায় ভারতীয় ছাত্রদের পাশাপাশি জার্মানীতে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নরত এক বাঙালি ছাত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও সেই ছাত্রী সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বা অবলা বসুদের ধারা লুপ্ত না হয়ে বরং ক্রমশ বিস্তীর্ণ হয়েছে দেখতে পেলে যে কোনো যুগেরই বাঙালি মেয়ের আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়াও কিছু বাঙালি মানুষের সম্পর্কে (সকলেই পুরুষ) অবগত হওয়া যায় যাঁরা সেসময় প্যারিসে ছিলেন এবং এঁদের ফরাসী শিক্ষায় ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে সহযোগিতা করেছিলেন।

তবে অমলার নিজের জীবন কিন্তু প্যারিসে গিয়েই কিছুদিনের মধ্যে অন্য খাতে বয়ে গেল। দর্শনীয় যা কিছু তা তো দেখলেনই বাবার সঙ্গে, বিপুল কলোনিয়াল এক্সপোজিশনেও দারুণ দায়িত্ব সহকারে কাজ করতে শুরু করলেন অমলা নিজেদের স্টলে। ক্রমশ ফরাসী অভ্যাগতদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এই লক্ষ্মী (lucky) বাঙালি মেয়েটির কদর। আর এমন সময় একদিন প্রখ্যাত নৃত্যবিৎ উদয়শঙ্কর সদলবলে এলেন তাঁদের স্টলে। তারপরের ঘটনাবলী স্বপ্নকে হার মানায়। অমলাকে উদয়শঙ্কর মনোনীত করলেন তাঁর নাচের দলের এক সদস্য হিসেবে, যদিও অমলা আগে কখনও নাচ শেখেননি, নাচ করেননি। বাঙালি মেয়েদের নাচ নিয়ে কি সাংঘাতিক সামাজিক দ্বিধার ছবি ছড়িয়ে ছিল এইসময় বাঙালি সমাজের সর্বত্র। অথচ অমলা ঠিক তার পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই এক নৃত্যবিৎ হয়ে উঠছেন, এক বিপরীত লিঙ্গের নৃত্যশিল্পীর সাহচর্য পাচ্ছেন এবং অদ্ভুত ভাবে সবটাই বিদেশে, বাবার ছত্রছায়ায় থেকে। অমলা জানিয়েছেন উদয়শঙ্কর সপরিবারে ইয়ুরোপ ভ্রমণ করছিলেন নাচ নিয়ে। তাঁর মা ছিলেন সঙ্গে, যঁকে অমলা বলতেন মাসিমা। আর ভাইরা ছাড়াও নাচের দলে ছিলেন সিমকি বা সিমোন (ফরাসিকন্যা) এবং উদয়শঙ্করের খুড়তুতো বোন মীনা বা কনকলতা। অমলার মঞ্চনাম হয়েছিল অপরাজিতা এবং উদয়শঙ্করের পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁদের এই পারিবারিক সখ্য ছিল বিদেশে দুই বাঙালি পরিবারের মিলনের আনন্দ। উদয়শঙ্করের মা অমলার বাবাকে বলেছিলেন, আপনার এই মেয়েটিকে আমায় দিন।

আর বাবাও অরাজী ছিলেন না। কন্যার মেধার প্রকাশ তাঁকে অত্যন্ত আনন্দিত করে তুলেছিল। তিনি উদয়শঙ্করের দলের সঙ্গে কন্যাকে রেখে এসেছিলেন সুদূর ইয়ুরোপ প্রবাসে পরবর্তী প্রায় এক বছরের জন্য। নিজে ফিরে এসেছিলেন। এই ব্যবস্থা দেশের মধ্যে থাকলে কখনোই করা সম্ভব হত না।

অমলা জানিয়েছেন তিনি উদয়শঙ্কর কে বড়দা বলে সম্বোধন করতেন। এবং পরবর্তী এক বছর অর্থাৎ সমস্ত ১৯৩২ সাল তিনি এই নৃতদলের সঙ্গী হয়ে সমস্ত ইয়ুরোপ সফর করেছেন। আশাতীত সাফল্য এবং অভিনন্দন পেয়েছেন নৃত্যশিল্পী হিসেবে। বহু কিছু শিক্ষা করেছেন ইয়ুরোপীয়ান দের থেকে আবার বহু কিছু নিজেরাও শিখিয়েছেন দীর্ঘ প্রবাসে সেখানকার মানুষকে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দেশের মধ্যে প্রাচ্যভাবাপন্নতা

খুবই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। দেশীয় ইতিহাস চর্চা, দেশীয় শিল্পের কদর, দেশীয় সঙ্গীত এবং নৃত্যকলার নবজাগরণ এবং পৃষ্ঠপোষণা নানাভাবে প্রদেশগুলিতে রাজন্যবর্গের সহায়তায় শুরু হয়েছিল। কিন্তু সব প্রয়াসই ভদ্র সমাজে প্রশ্নবিহীন ভাবে সমাদৃত হয়নি। জার্মানি, ফ্রান্স, স্যুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ফিনল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালি, গ্রিস, সুইডেন, দক্ষিণ য়ুরোপ হয়ে দেশে ফেরার আগে অমলা জানান তাঁরা কেবলমাত্র ভারতীয় পোশাকে সজ্জিত হয়েই চলাফেরা করতেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন নিজেদের দেশীয় সংস্কারগুলির দেশজ রীতিতে পালন করার দিকে। এযুগের মতো ইয়ুরোপের অকারণ এবং অক্ষম অনুকরণ তাঁরা একেবারেই পছন্দ করে উঠতে পারেননি। লাটভিয়া যাওয়ার সময় আলোচনা করেছেন ট্রেনে দাঁড়ানো কৃষকদের মুখের হাসি নিয়ে। গরীব অথচ স্বাধীন দেশ আর পরাধীন দেশের পার্থক্য নিয়ে। ডেনমার্কের একটি হোটেলের মালিক ইংরেজ হওয়ায় সেই হোটেলে বিশ্ববরেণ্য এই শিল্পীদলের আশ্রয় জুটছিল না। কিন্তু ডেনমার্কবাসী একেবারেই এই বৈষম্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে যে অপূর্ব ব্যবহার অমলাদের সঙ্গে করেছিলেন তার বর্ণনা দেওয়ার সময় জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে অমলার লেখনী। আরো জানা যায় দেশ থেকে ফেরার তাড়া দিয়ে অমলার মা চিঠি লিখেছিলেন। এক ঝলক রোদ্দুরের সঙ্গে হঠাৎ বাঙালি জীবনের বাস্তবচিত্র ধরা পড়ে। অমলা লেখেন,

প্রায় পৌণে দুই বৎসর কাল য়ুরোপ দেখছি। আজ এদেশ কাল ওদেশ, দেখার পর দেখা। প্রচুর আনন্দ পেয়ে আসছি। সকল বিষয়েরই একটা পূর্ণতা আছে—একটা সীমা আছে। এমন সময় কলকাতা থেকে মায়ের চিঠি পেলাম। দেখলাম, তিনিও আমাকে দেশে ফিরবার উপদেশ দিয়েছেন। [পৃষ্ঠা. ১৪৯, সাত সাগরের পারে] ।।

এই ফেরার সময়েই দুর্গাবতীর সঙ্গে একই জাহাজে ফেরেন অমলারা। এখানেই দুই বাঙালিনীর সম্পূর্ণ আলাদা দুই পটভূমিকায় ইয়ুরোপ ভ্রমণের যুক্তবেণী রচিত হয়। দুর্গাবতীর ভ্রমণকাহিনী 'পশ্চিমযাত্রিকী' [১৯] তে তার উল্লেখ পাই দুর্গাবতী নৃত্যশিল্পী অমলা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। দুর্গাবতীর কথা শুরু করব এইবার। ১৯৩২ এর জুনে দুর্গাবতী জাহাজে রওনা হলেন আগেই বলেছি। বাড়ি থেকে বাইরে পা রাখার পরেই নিজস্ব বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে দুর্গাবতী পৃথিবীকে দেখতে থাকেন। তাই জাহাজের ইতালিয়ান স্টুয়ার্ড হয়ে যায় ইতালিয় বামুন। সমস্ত ভ্রমণকালেই সব রকম ওয়েটার এবং স্টুয়ার্ডকে তিনি বামুন বলেই সম্বোধন করেছেন তা সে সুইডিশই হোক কিম্বা নরোইজিয়ান।

এ যেন এক সামাজিক নির্জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি। দুর্গাবতীর লেখায় বাঙালি মেয়ের বিশেষত বাঙালি ঘরের বউয়ের ভাবনার চলন কেমন তার একটা আভাস পাওয়া যায়। অমলার ক্ষেত্রে প্রতিমুহূর্তে ছড়িয়ে ছিল কুমারী জীবনের সরল এবং অপেক্ষাকৃত লঘু আনন্দ। দুর্গাবতীর জীবনের অনুশাসন গুলি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করেছিল। দুর্গাবতীর নিজস্বতা দুর্গাবতীর লেখায় খুবই পরিস্ফুট। তার প্রথম প্রমাণ টি পাওয়া যায় যখন ইয়ুরোপ যাত্রাপথে মিশরে নেমে পিরামিড দেখতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী যুগলের ছবি তোলার জন্য গাইড অনুরোধ জানায় দুর্গাবতীকে উটের পিঠে চড়া স্বামীর উটের লাগাম ধরে দাঁড়াবার জন্য! এই ভাবনার বিরোধিতায় দুর্গাবতী লেখেন,

ফটো তুলতে গিয়ে সে এক হাসির ব্যাপার, আমরাও চড়ব না আর গাইড ও ছাড়বে না। বলে কি, ছবি তোলবার সময় অন্তত একবার উটের পিঠে চড়তেই হবে। তাকে বোঝানো গেল আমরা মাটিতে দাঁড়িয়েই ছবি তোলাতে ভালোবাসি। সে নাছোড়বান্দা, বললে, উটের পিঠে নিতান্তই যদি না ওঠো তো, উটের লাগামটি হাতে ধ'রে তোমাদের 'হাস্ব্যাণ্ড্'দের ঠিক পাশেই দাঁড়াও, তা'হলে কায়দা মন্দ হবে না।– কি করি, পড়েছি যবনের হাতে, একবার ধরতে চেষ্টা করলুম, পোড়া উট এমন বিকট সুরে ডেকে উঠল যে লাগাম ছেড়ে ব'লে ফেললুম, না বাপু , কাজ নেই এসব কায়দায়। বাঙ্গালীর মেয়ে সকাল হলেই ভাঁড়ার বের করে বঁটি পেতে কুটনোয় বসা অভ্যাস, এ হেন মনিষ্যি চোখে পিরামিড দেখছি তাই যথেষ্ট। স্বামীর অন্যান্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখব এখন, তাঁর উটের লাগাম না ধরলেও চলবে। [পৃ. ৩৩-৩৪]

দুর্গাবতীর লেখায় যাত্রাপথের চেয়েও গুরুত্ব পেয়েছে বিভিন্ন স্থানে যাত্রাবিরতি এবং স্থানমাহাত্ম্য উপভোগের বর্ণনা। সমস্ত ইয়ুরোপে তাঁর বাঙালি শাড়ি পরার ধরণটি অসম্ভব কৌতূহল উদ্রেক করেছিল নারী পুরুষ নির্বিশেষে জনগণের মধ্যে। সেইটি দুর্গাবতী কখনও ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি এবং তাঁর জাতিয়তাবাদী চেতনায় আঘাত লেগেছিল। পরাধীন দেশের মানুষ যেন খাঁচায় বাঁধা বুনোজন্তু যাকে দর্শন করে ওইভাবে আলোচনা করা যায় এবং কিছু ক্ষেত্রে অভব্য আচরণ ও করা যায়, এটাই মনে হয়েছিল ইয়ুরোপিয়ানদের আচরণে দুর্গাবতীর। কোনোভাবেই

নির্বিচারে য়ুরোপের সমস্ত কিছুকে ভালো বলতে পারেননি তিনি। মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে থুতুর ব্যবহার এমনকি ছোটছেলের মুখ পরিষ্কারের জন্য ও এইটা খুবই বিবমিষাজনক ছিল দুর্গাবতীর ক্ষেত্রে। এভাবে স্বাস্থ্যবিধি লঙঘন তাঁর মতে পরাধীন এবং দরিদ্র দেশের মানুষ ও করেন না।

বারে বারে দুর্গাবতী এই পরাধীন এবং দরিদ্র দেশের মানুষ অর্থাৎ নিজেদের কথা বলেছেন। এটি অবশ্যই দেশীয় অভিজাতবর্গের মূলধারায় প্রাচ্যভাবনার ফলশ্রুতি। বিশ শতকের শুরুর দিক থেকেই নেশন হিসেবে ভারতবাসীকে পরিচিত করতে শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য মণীষীরা। ভারতীয় চিত্রকলা, শিল্পের কদর বাড়তে থাকে। এবং নিজেদের আদর্শ হিসেবে ক্রমশ প্রাচ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে বাঙালি সমাজ। অবশ্যই রুচিগত একটা মিল এক্ষেত্রে কাজ করেছিল আর কাজ করেছিল ব্রিটিশের প্রতি প্রতিস্পর্ধী মনোভাব। যে কারণে অবলা বসু বা সরোজনলিনী দত্ত জাপানের সামাজিক মডেলকে বাঙালি নারীর সামাজিক মডেলের ছাঁচে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁদের লেখায়।

দুর্গাবতী সেই প্রথম বাঙালি নারী যিনি লণ্ডনে বিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক  আর্নেস্ট জোনস্[২০] এবং ভিয়েনায় ডক্টর ফ্রয়েডের  সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাঁর বাবা গিরীন্দ্রশেখর বোসের প্রতিভূ হয়ে। ডক্টর ফ্রয়েডের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় প্রথামাফিক সাক্ষাতের বাইরেও বহু সময় দুর্গাবতী কাটিয়েছেন ফ্রয়েডের কন্যা আনা ফ্রয়েডের সঙ্গে, যেখানে দুর্গাবতীকে শাড়ি খুলে আবারো দেখাতে হয়েছে বঙ্গললনার শাড়ি পরার কায়দা। ভিনদেশীয় নারীর এই উদগ্র কৌতূহল যথারীতি দুর্গাবতীকে বিরক্ত করে তুলেছিল।

নিজের সমাজের আর ইয়ুরোপিয়ান মেয়েদের কাজের পরিধির তফাৎ বোঝাতে গিয়ে দুর্গাবতী চমৎকার শাণিত বিশ্লেষণ করেছেন পারিপার্শ্বিক এবং সামাজিক অবস্থানসূচক তুলনাবিন্দু গুলিতে। বিলেতের মেয়েরা অসামান্য কর্মপটিয়সী এইকথা দুর্গাবতী বহু শুনেছেন বিলেত-প্রত্যাগত নারীপুরুষের বয়ানে। তাই এই বিষয়টি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে যা লিখেছেন তাতে বাঙালি মেয়ের আঁতের খবর ধরা পড়ে।

এখানে এসে দেখলুম এরা খুব খাটতে পারে সে কথা সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের মতন ক'রে কাজ করতে হ'লে কিছুতেই পেরে উঠত না। কেন পারত না তার গোটাকয়েক কারণ বলব।

প্রথম কারণ, এটি শীতপ্রধান দেশ, ঠান্ডায় পরিশ্রম যেমন সহজসাধ্য, গরমে তা চলে না। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে সাধারণত একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে থাকতে হয়। নিজের মত অনুযায়ী কাজ করতে পারলে কাজ যতটা শীঘ্র সম্ভব হয়, পাঁচজনের সঙ্গে থেকে তাঁদের সুখ সুবিধা দেখে ও গুরুজনের মতের অপেক্ষা ক'রে কাজ করতে একটু দেরি হবেই। আর আমাদের খাওয়াদাওয়ার কোন নিয়ম নেই। বাড়ির বাবুরা রোজই হয়তো এক নিয়মে খেয়ে ছুটির দিন এমন বেলায় নাওয়া খাওয়া করেন যে হাঁড়ি হেঁসেল তুলতেই বেলা কাবার। ওদের ওখানে সেসব হবার জো নেই, যে রান্না ও পরিবেশন করবে তার সুবিধা ও সময়মতো খেতেই হবে। তাছাড়া রান্নার সময় রকমারি তরকারি কোটা ও তার রকমারি মশলা পেষার হাঙ্গামা নেই। তার জন্য তাই আলাদা লোকের দরকার হয় না। একটু সুপ পুডিং কিম্বা সামান্য মাছ মাংসেই কাজ চলে যায়। তারপর সকড়ি বাছবিচার নেই। রান্না করতে করতে চোদ্দবার হাত ধুতে হয় না। আঁশ নিরামিষের বিচার নেই, যা রান্না হল সধবা, বিধবা ও কুমারী সব ছেলে মেয়ে একসঙ্গে বসে খেয়ে নিলে, আর যারা মাছ মাংস খায় না তাদের জন্য বিচার ক'রে হাত ধুয়ে আলাদা বাসনে যে খেতে দিতে হবে সে নিয়ম নেই। আমাদের দেশের সব নিয়মগুলিকেই খারাপ বলার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা নয়, কেন আমাদের সব কাজ সারতে বেশি সময় লাগে সেটা বলবার উদ্দেশ্যে এর অবতারণা করছি।

বিলাতে বাড়ির কর্তা অফিস গেলেন, গিন্নী সংসারের কাজকর্ম্মের ভেতর বাড়ির নীচের তলার জন্য ভাড়াটে জোটাচ্ছেন, বাগানের ফুল বিক্রী করতে পাঠাচ্ছেন, তার জন্য তাঁর কাছে বাইরের পাঁচটা লোক আসছে। এতে অবরোধ-প্রথা নেই, কর্তা এসব ব্যাপারে কিছুই নজর দেন না, সারাদিন পরে অফিস থেকে এসে স্ত্রী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন হাওয়া খাবার জন্য। মেয়ে পুরুষ শরীরের যত্ন ঠিক বোঝে। স্বাস্থ্যের জন্য যতটুকু পরিশ্রম দরকার, সেই অনুযায়ী আমোদ-প্রমোদে যোগ দেওয়াতেও আপত্তি নেই। [পৃ. ৫৫]

বাঙালি  সমাজে এবং পরিবারে পুরুষ কর্তৃক নির্দিষ্ট  নারীর চিরায়ত ভূমিকাটির সম্পর্কে যে প্রশ্ন এবং ভাবনা দুর্গাবতীর ছিল তা এই ভ্রমণকথার আশ্রয়ে ব্যক্ত করেছেন অসংকোচে। আরো অসংকোচে লিখেছেন প্যারিসে পড়তে যাওয়া বাঙালি ছাত্রদের নাইটক্লাবে বিহার, নৃত্য এবং মদ্যপান বিষয়ক তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব। বাবা মায়ের পরিশ্রম এবং দেশের পরাধীনতা ঘোচানোর কথা না ভেবে পড়তে এসে কেবল আমোদ আহ্লাদে দিন কাটিয়ে টাকা নষ্ট করার বিরোধী ছিলেন দুর্গাবতী; হয়তো অনুচ্চারে এই অভিযোগই জানাতে চেয়েছেন, একই দেশের

মেয়েরা কিন্তু এই সুযোগ পাননা। স্বাধীনতা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তখনো মেয়েদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব মেয়েদের বিলেতযাত্রাকে মূলস্রোতের অঙ্গ করে তুলতে পারেনি।

নৈশজীবনের নর্তকীদের দেখে অসামান্য মন্তব্য করেছেন ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী দুর্গাবতী।

কয়েকটি নৃত্যপরা অপ্সরার অর্দ্ধনগ্ন পরিচ্ছদ ও ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'ল এরা বোধহয় জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জা সরম জলাঞ্জলি দিয়েছে। এসব নাচে বোধহয় প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধার অধিকার নেই। কেননা দেখলুম তারা আমাদেরই মতো দর্শক মাত্র। সুদক্ষ নর্ত্তকের হাতে সুন্দরী নর্ত্তকীরা যেন খেলার পুতুল, তাদের নিয়ে লোফালুফি করা এবং কাঁধে ও মাথায় বসিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করা দেখে মনে হল এদের শরীর যেন পালকের তৈরি। খুব ছোটবেলায় আমাদের বাড়ির এক পুরাতন ঝিয়ের মুখে গল্প শুনেছিলাম , পেরথম পক্ষের ইস্তিরি সোয়ামীর পাতে বসে খায়, দ্বিতীয় পক্ষের সাথে বসে খায় আর তৃতীয়পক্ষের হলে একেবারে কাঁধে চড়ে খায়। এখন এই নাচ দেখে মনে হল যে কোনো পক্ষের স্ত্রী হোক, এদের মত শরীর সুগঠিত হলে বোধহয় কাঁধে চড়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতেও পারা যায়। [পৃ.৫১]

দুর্গাবতীর ভাবার এবং প্রকাশ করার ক্ষমতা অত্যন্ত বিশিষ্ট। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় সেসময় গান্ধীকে নিয়ে ইতালিয়ান জনমানসে চর্চার সংবাদ। গান্ধী এবং টেগোর দুজনেই এই তিনের দশকে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন। ইতালির রাস্তায় নিজেদের সম্পর্কে বার বার শুনেছেন, 'গান্ধী-টেগরে-ইন্ডিয়ানো'। গত শতকে এই নামগুলির একটি অশ্রুত এবং আরেকটি সদ্য প্রস্ফুটিত ছিল। দিনবদলের ইতিহাসে এভাবেই মেয়েদের ভ্রমণকাহিনী পরম্পরাসূত্র বহন করে চলেছে।

এরপর ক্রমশ স্বাধীনতার যুদ্ধ ভয়াল হয়ে উঠেছে। আর মেয়েরাও দামাল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সেই মহাযজ্ঞে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অগণিত কন্যা গিয়েছেন ইয়ুরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় শিক্ষার্থে। পুরুষের বন্ধন মুক্ত ভাবে, স্বেচ্ছায়। আজকের দিনে এই পড়তে যাওয়া বা চাকরির জন্য বিদেশে থাকা খুবই সাধারণ হয়ে পড়েছে এমনকি অতি সামান্য পরিবারগুলির ক্ষেত্রেও। সুদীপ্তা সেনগুপ্ত আমন্ত্রিত হলেন দক্ষিণ মেরু অভিযানে। সেই একই পথে অভিযান করে এলেন আরো কত বাঙালিনী তার পরে। এছাড়াও অনেকে প্রবাসী হয়ে গেলেন পাশ্চাত্যের কানায় কানায়। সমস্ত চিন্তা চেতনার জগত পরিবর্তিত হয়ে গেল তবু এতো বিপুল স্রোতের মধ্যেও স্বদেশে স্বসমাজে বিখ্যাত এক নারী রয়ে গেলেন চার দেওয়ালের অন্দরে যতদিন জীবিত রইলেন স্বামী। এ যেন স্বামীত্বের প্রভুত্বে পরিণত হওয়ার সমীকরণ, প্রতিদিনের সাধারণ মেয়ের কাহিনী। সেই স্বামীর মৃত্যুর পর সমস্ত যুরোপ চূড়ান্ত শিল্পরসিক এবং শিল্পীর চোখে ভ্রমণ করলেন প্রখ্যাত ভাস্কর উমা সিদ্ধান্ত (জ.১৯৩৩)। সঙ্গে রইলেন তাঁর ছাত্রীজীবনের সতীর্থ, বন্ধু বিখ্যাত এবং বিশ্ববিশ্রুত আর্ট রেস্টোরার ইয়ুরোপ প্রবাসী বিশ্বরাজ মেহরা। এই ভ্রমণে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে অনন্ত রচনার আনন্দপ্রয়াস ছাড়া অন্য কোন প্রণোদনা কাজ করেনি। মনোজগতের আবরণ উন্মোচনের এই বিবরণ উমা লিপিবদ্ধ করেন 'ইউরোপের ডায়েরি' [২১] নামক ভ্রমণকথায় (প্রথম প্রকাশঃ অগাস্ট ২০১২)। মূল লেখা শুরুর আগে ভূমিকায় বিখ্যাত ভাস্কর এবং প্রথম বাঙালি মহিলা ভাস্কর উমা সিদ্ধান্ত বলছেন,

নিজের দেশের শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, আসল কাজগুলি কোনও কোনও সময় দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে। কিন্তু ঐ পাশ্চাত্যের বিখ্যাত কাজগুলি কি কোনও দিন সচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হবে? দেখার এক তীব্র বাসনা। একবার সুযোগ এল। ফ্রেঞ্চ সরকারের স্কলারশিপে বাইরে যাওয়ার। কিন্তু বাড়ীর থেকে আপত্তি এল। ছেলে তখনও খুব একটা বড়ো হয়নি। তাকে ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। ভাবলাম, সত্যিই তো মায়ের কাছে সন্তান সবার আগে। তাই তো সেবার যাওয়া হল না। [ইউরোপের ডায়েরি, ভূমিকা]

বোঝা যায় কতরকম ভাবেই না বাধাগুলি মেয়েদের জীবনকে বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে!

পরিণতবয়সে উমার যুরোপ ভ্রমণ বাঙালি নারীর মন আর মননের স্তরকে মেলে ধরে পাঠকের চোখের সামনে। অন্তরের সুপ্রাচীন এবং বহুযুগ-লালিত সংস্কারের নিগড় গুলি কেমন ভাবে ভেঙে গেলে এমন নির্মোহ দৃষ্টি তৈরি হতে পারে জীবন এবং শিল্পভাবনার প্রতি তা ভাবলে চমৎকৃত হতে হয়। সমস্ত যুরোপের প্রবহমান শিল্পধারার কালানুক্রমিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে এবং দর্শন করে উমার মনে হয়েছে, আর্ট ফর আর্ট'স সেক

নয়, হওয়া উচিত আর্ট ফর লাইফ'স সেক। মানবজীবনের এক স্বপ্ন-সম্ভব আশ্রয় হয়ে ওঠে শিল্প কালে কালে। তাতে বাস্তবের ছাঁচ এবং বাস্তবধর্মিতার আঁচ থাকলেও কোন এক বিন্দুতে তাকে লোকোত্তর এবং কালোত্তরতার ছায়াপথের যাত্রী হতেই হয়, নয়তো সেই শিল্প এবং শিল্পী দুইই কালগ্রাসের কৃষ্ণগহ্বরে এক সময়ে তলিয়ে যান।

উমার ক্ষেত্রে যাত্রাপথ ততখানি গুরুত্বপূর্ণ আর নয়, কারণ এসময় দলে দলে বাঙালি পারিবারিক ভাবে কিংবা একাকী, দলবদ্ধ হয়ে বা না হয়ে নিত্যদিন য়ুরোপ ভ্রমণ করছেন নানা উপায়ে। লিখছেনও প্রচুর মানুষ। ভ্রমণের পত্রিকাগুলির পাতা উপচে পড়া কাটতির এই যুগে যদিও এই ভ্রমণকাহিনীগুলির সঙ্গে যে দেশ থেকে যাওয়া হচ্ছে আর যে গন্তব্যে যাওয়া হচ্ছে এই দু'পক্ষেরই ইতিহাস বা সংস্কৃতির কোনো নাড়ির যোগ নেই। নতুন শতাব্দীর মুক্তচিন্তার যুগে য়ুরোপ ভ্রমণ বাঙালির কাছে এক ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। মূলস্রোতের পর্যটকরা বেশিরভাগই নিজের দেশ দেখা থেকে বিরত থেকে য়ুরোপে মধুশালার দিকে ছুটে যান , কারণ তা নির্ধারণ করে সামাজিক সিঁড়ির উচ্চধাপের সূচকটি। এই সামূহিক আবহের মধ্যেই উমার চলন বড় কোমল। স্বচ্ছন্দ অথচ মধুর। তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায় নেমে এসেছে পিয়েত্রা সান্তা আর মিকেলাঞ্জেলোর যুগলবন্দী বড় অনায়াসে। নেমে এসেছে এক একটি রোদেলা দুপুর আর নিটোল আঙুরগুচ্ছের সমস্ত উষ্ণতা এবং মাধুর্য নিয়ে। একই সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে য়ুরোপীয় ফ্যাশনের রূপ, নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রাপ্তমনস্কতা এবং আশঙ্কাদীর্ণ শূন্যতা। সভ্যদেশ আর অসভ্যদেশের ঋণাত্মক মিলগুলি, আধুনিক শিল্পের যন্ত্রণার স্বরূপ এবং প্রাচীন শিল্পরূপের শ্বাশ্বত আহ্বান।

উমা লিখছেন মিলান পৌঁছে,

> শহর টা দেখলাম। মজা লাগল পুরনো ঝরঝরে ট্রাম। খোলা জায়গায় অসংখ্য পায়রা। বাচ্চারা হাতে খাওয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন ট্রাম ও বাস দেখলাম। খুব সুন্দর আধুনিক ব্যবস্থা। পুরনো ও নতুনের সমন্বয় দেখলাম। মিলান পোশাকের ফ্যাশনের জন্য বিখ্যাত। রাস্তার ধারে ধারে পোশাকের শোরুম। নতুন নতুন ডিজাইনের জামাকাপড়। সুন্দর করে সাজানো শোকেস। শোকেসের পাশেই দেওয়ালে দেওয়াল লিখন। আমরা ভাবি আমাদের তৃতীয় বিশ্বের মানুষ দেওয়াল লিখে নোংরা করে, পাশ্চাত্যের সভ্য দেশের নাগরিকরাও দেওয়াল লিখে নোংরা করে। [পৃ. ১৫]

ভ্রমণের শুরুতেই পিয়েত্রা সান্ত্রা মাতাল করে তুলেছে প্রথম বঙালিনী ভাস্করকে। বার মিকেলাঞ্জেলো থেকে মর্মর পাহাড়ের প্রাকৃতিক শোভা, পথপার্শ্বের ক্যাফে থেকে কাস্টিং ফাউন্ড্রি দর্শনের সৌভাগ্য রোমকূপের গোড়ায় আনন্দের হিল্লোল তুলেছে উমার। সঙ্গে চলেছে ইয়ুরোপ ঘোরার প্রথম পর্যায়ের ইতালির বিখ্যাত স্থাপত্য এবং ম্যুজিয়ম দর্শনের আকুল তৃষ্ণার শান্তিবারি সেচন। এরই মধ্যে শিল্পীবন্ধুর ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া ভোজসভায় অভিজ্ঞ নারীদৃষ্টি সঞ্চালনের ফলে অর্জিত আধুনিক নারীর সংকট নিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভূতি,

> এখানে দেখলাম অনেকগুলো মেয়ে যাদের বয়স চল্লিশের কাছে, বা তার ওপরে, তারা সবাই নিজেদের জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত হতাশ। তাদের অনেকেরই সঙ্গী আছে। হয়তো তারা বিয়ে করে ঘর ও বাঁধতে চায়। কেউ বা একত্রে বসবাস করছে এবং সন্তান ও হয়েছে। কিন্তু এরা সবাই বিয়ে করতে ভয় পায়। নবীন প্রজন্মের মূল্যবোধ যে পালটে গেছে। এরা কিছু গড়তে ভয় পায়, পাছে ভেঙে যায়। [পৃ. ১৭]

পিয়েত্রা সান্ত্রার এই কটা দিন অতীতের সঙ্গে সহবাস করেছেন উমা। ধ্যানবোধিতার কলমে উঠে এসেছে তার ভাষ্য,

> এই ক্যাফেতে বসে রোজই কফি খেতাম। আর ভাবতাম কতযুগ আগের কথা। এই 'বার মিকেলাঞ্জেলো'-র ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে, মহান শিল্পীকে আমি অনুভব করতে পারি সাহিত্যের গল্পগাথার মধ্যে দিয়ে। সেই ইতিহাসে গল্প কতটা সত্য কতটা কাল্পনিক জানিনা। তবে সত্যোপলব্ধি করতে পারি তাঁর অমর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে । তাঁর সব কিছু যন্ত্রণা , বেদনা, দুঃখ –অপমানের গরল থেকে উঠেছে এই অমৃতের ধারা। কন্টেসিনা ও ক্লারিসার পবিত্র ভালোবাসা না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে রচিত হল দুটি নারীমূর্তি উষা ও রাত্রি। পবিত্রকন্যা মূর্ত হল তাঁর ছেনি হাতুড়ি মর্মরের প্রতিকৃতিতে। তরুণী কন্যা পরিণত- পরিশ্রান্তা জননী, স্নিগ্ধ ও শুদ্ধ—সেই হল রাত্রি। উষা গড়ে উঠল অর্ধচেতনার এক স্বপ্নময় সত্তার মধ্যে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ দিনের আলো ফোটার অপেক্ষায়। [পৃ.১৩]

শুধু এইই নয়, লেখকের শিল্পী স্বরূপের অভিজ্ঞান, সমস্ত বই, পাতার পর পাতা জুড়ে নবীন কিশোরী মেঘের মতোই লীলাচঞ্চল। অনাদ্যন্ত কালের গিয়ামবোলগ্নার [২২] দ্য রেপ অব দ্য সাবিন ওমেন থেকে শুরু করে আধুনিক ভাস্কর ইগর মিটোরাজের[২৩] কাজের শিল্প সৌকর্য মোহিত

করেছে ভাবিত করেছে উমাকে। তাঁর মনে হয়েছে, মিটোরাজের কাজের মধ্যে প্রবহমান আবহমানের ছন্দ, তবু তা আধুনিক, বলা ভালো সমসাময়িক। ভ্রমণকথার অন্দরে অন্দরে বুনে দিয়েছেন উমা , রসবেত্তার হৃদয়সঞ্চার। এই সমস্ত  ভ্রমণকথাটি হয়ে উঠেছে ভাস্কর উমা সিদ্ধান্তের বিশ্বশিল্প এবং যুগভাবনার সঙ্গে একান্ত এক আলাপচারী। ব্যক্তি উমার ভাবনার স্বাতন্ত্র্যময় একটি ডিসকোর্স। উমা একটি ভাস্কর্য সম্পর্কে বলেছেন,

অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি সুঠাম সৌন্দর্যময়ী নারীমূর্তি , পরী ও বলা যায় কারণ পিঠে দুটি ডানা আছে। মাথাটি কেটে তারই পায়ের কাছে অতি সন্তর্পণে রাখা আছে। অত্যন্ত সুন্দর মনোমোহিনী মুখখানি। এক পুরুষের বলিষ্ঠ হাত কব্জী পর্যন্ত মেয়েটির পা পিছন থেকে ধরে রেখেছে—যেন , যেতে নাহি দিব। মেয়েটির গোপন অঙ্গ এক পুরুষের মুখ। সর্বশেষ তার ডানাটির মধ্যে কাটা একটি জানালা এবং জানালার মধ্যে জ্বলজ্বলে এক পুরুষের মুখ। যেন কল্পনায়ও তোমাকে মুক্ত হতে দেবো না। [পৃ.৫০]

এ বিষয়ে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সভ্যজীবনের কালি বার বার ছিটে এসে লেগেছে মেয়েদের ডানায়। উমার ভ্রমণকাহিনীর ছত্রে ছত্রে এই খেদ প্রকাশিত। মেগালোম্যানিয়াক সামাজিক এক পুরুষসত্তার নির্মানে ব্যস্ত আধুনিক পৃথিবী, সেখানে প্রথম বা তৃতীয় বিশ্বের কোনো তফাৎ নেই ভাবনায়, কাজে, রূপায়ণে।

সমস্তক্ষণ চরকি পায়ে চক্কর দিচ্ছেন উমা শুধু শিল্পের সান্নিধ্যে দিনগুলিকে কুসুমের মাসে পর্যবসিত করার জন্য। ইতালি-সুইটজারল্যাণ্ড-নেদারল্যাণ্ড-প্যারিস-ক্রয়ডন-নিউকাসল্ সর্বত্রই উমার ভ্রমণের টান শিল্পকলা এবং ভাস্কর্যের টানে। সঙ্গে প্রখর সচেতন এক মন। আর আছে বন্ধুত্বের উষ্ণ নিদর্শন। আছে ইতালির ছোট্ট গ্রাম জোভানে থাকার সবুজ স্মৃতি।  এই ভ্রমণের সমস্ত স্মৃতি এবং বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ আসলে এক সর্বার্থে স্বাধীন বাঙালি নারীর জীবনের উড্ডীণ জয়পতাকা।

ইতালির কাস্টিং স্টুডিয়ো আর তাতে শিল্পীদের কজের সুবিধা দেখে, ভাস্কর উমার সে কী উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা! আবার রোদ পোড়া চামড়ায় বাদামী কালো রং, যা উমার নিজের নিতান্তই না-পসন্দ, তাইই কিনা ইউরোপীয় রমণীর মনে উদ্রেক করে পরম শ্লাঘা। মহাদেশ ভেদে রুচির এই পার্থক্য, বাঙালি উমার কাছে খুবই অর্থবহ এবং মজাদার। কেননা কালা আদমীর দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বদ অভ্যাসে ভরা এককালীন উপনিবেশের প্রতি সাদা চামড়ার অসূয়া বিদ্বেষ কিছুই ভারতবর্ষীয়া উমার চোখ থেকে মুছে যায়নি। তাই উমা যে কোনো বেমানান বিচ্যুতি থেকে উদ্ভূত তাঁর প্রশ্ন লুকিয়ে রাখেননি **|**     ম্যুজিয়াম বাইজম্যান্স্ এ বিখ্যাত আমেরিকান শিল্পী কিথ হারিং [২৪] -এর কাজের প্রদর্শনী দেখে উমার প্রশ্ন জাগে,

শিশুদের নিয়েই বেশিরভাগ কাজ। আফ্রিকার লোকশিল্পের আভাস মেলে কাজের মধ্যে। এক একটা ছবির মাপ ২০ ফুট x ৩০ ফুট। একটা জিনিস আমার কাছে অবাক লাগল। শিশুদের নিয়েই যখন বেশিরভাগ কাজ,  শিশুরা ত ফুলের মতো পবিত্র।  কিন্তু এইসব শিশুদের ছবির মধ্যে যৌনতার ইঙ্গিত কেন? [পৃ. ৮১]

শিল্পী তো একজন সমকালীন মানুষ ও। তাই রেমব্রান্টের বাড়ি দেখা থেকে সমকামিতা সবরকম প্রসঙ্গেই তাঁর ভ্রমণকাহিনী ভরপুর। তিনি নারীকে দেখেছেন জীবনে শিল্প-ভাস্কর্য এবং ইতিহাসের প্রেক্ষিতে দেশকালাতীত এক পূর্ণায়ত সত্তা হিসেবে। আমস্টারডম টাউন হলে অনেক পুরনো ছবির ভিড়ে একটি ছবিকে তিনি বলেছেন ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাস। একটি বিচারসভার দৃশ্য, একটি মেয়ে পাবলিক পানশালায় উপস্থিত হওয়ায় তাকে অপরাধী হিসেবে বিচার করা হচ্ছে। কারণ সেই যুগে মেয়েদের পানশালায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

পম্পিদু ম্যুজিয়মের মর্ডান আর্ট দেখে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন,

মডার্ন আর্টের নামে বর্তমানে কিছু ম্যাডনেস বা চূড়ান্ত পাগলামো চলছে সে  ধরনের  কাজও এখানে অনেক আছে**|** আস্ত একটা পিয়ানোকে চট দিয়ে মুড়ে তার গায়ে একটা রেডক্রসের চিহ্ন লাগানো বা আমাদের দেশে গড়িয়াহাটের মোড়ে ফুটপাথের দেওয়ালে যেমন অনেক রং বেরং-এর বিভিন্ন জামাকাপড় ঝোলানো থাকে বিক্রির জন্য ঠিক তেমনি ওখানে একটা ঘরের মধ্যে আলোর হেরফের করে কোথাও অল্প আলো কোথাও বেশি আলোর মধ্যে একইভাবে

বিভিন্ন রং –এর জামাকাপড় টাঙানো। এটাই একটা ইনস্টলেশন বা শিল্পীর ক্রিয়েশন। একটা দরজা তার অর্ধেকটা পর্দা টাঙানো, মাথা নিচু করে ঢুকে দেখলাম আমাদের দেশে পর্দার কাপড়ের যে নাম করা বড় বড় দোকান আছে তেমনি দোকানের মতো ঘরভর্তি মোটা মোটা কাপড়ের বান্ডিল গুলি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে রাখা আছে। এই হল আরেক শিল্পীর সৃজন। [পৃ. ৯২]

তুলনা করছেন একই সংগ্রহশালায় রাখা বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী শিল্পীদের কাজের সঙ্গে,

আলেকজান্ডার ক্যালডারের[২৫] কাজ 'বাগেনভেলিয়া' মোবাইল স্কাল্পচার রয়েছে। অ্যানটন পেভসনার[২৬]-এর কাজ ভালো লাগে, কারণ এইসময়টা যারা নতুন কিছু করবো বা পরিবর্তন প্রয়োজন--- এই মানসিকতার জন্য ছিলো তাদের কঠোর সাধনা।কর্মে নিপুণতা ছিল।রিয়ালিস্টিক কাজ তারা জানতেন তাই তারা গড়তে যেমন পারতেন সুন্দরভাবে, তেমনি ভেঙেও আবার গড়তে পেরেছেন সুন্দর ভাবে। সেখানে ক্রাফটস্‌ম্যানশিপ যে কতখানি উন্নত, সেটাই লক্ষণীয়।

উমা নিজের কথাগুলি অকপটে ব্যক্ত করেছেন, নিজের মনোভাব এবং মতামত। উনিশ এবং বিশ শতকের মেয়েরা কিন্তু কালি কলমেই মন ডুবিয়েছিলেন, যাঁরা ঠিক সংসারের মাপে, নিয়মে আর অভ্যস্ততায় নিজেদের ঠিক আঁটিয়ে নিতে চাননি। সেই ধারা আজও বলবৎ রয়েছে। আর ইয়ুরোপ এখনও পর্যন্ত বাঙালির জীবনে সোনার পাথরবাটির হাতছানি হয়েই রয়ে গিয়েছে। তারই সঙ্গে রয়েছে বাঙালি মেয়েদের বিবিধ আঙ্গিকে বিবিধ ভাবে ইয়ুরোপের সঙ্গে চেনা পরিচয়ের, জয়যাত্রার খতিয়ান। সমকালের কাছে করা প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য ভ্রমণের আয়োজন আর পূর্বকালের নারী-ইতিহাসের (হার-স্টোরি) শুভযাত্রাপথটি একালের মেয়েদের মধ্যে জাঁকিয়ে বসেছে আরো পাকাপোক্তভাবে, যা আগামীর জন্য রেখে যাচ্ছে ক্রমেই এক আলোকিত অধ্যায়।

তথ্যসূত্রঃ


***1.*** Simonti Sen, Travels to Europe Self and Other in Bengali Travel Narratives 1870-1910, First Published 2005, Orient Longman Private Limited, New Delhi

২. শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র), ১৯১৫, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা

৩. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্ত্রীর প্রতি পত্র, পুরাতনী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সম্পাঃ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৯ শকাব্দ (ইং. ১৯৫৬), প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৪. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পুরাতনী, তদেব

৫. কৃষ্ণভাবিনী দাসের ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা, সম্পাদনা ও ভূমিকা সীমন্তী সেন, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, স্ত্রী, কলকাতা

৬. দেবেন্দ্রনাথ দাস, পাগলের কথা, ১৩১৭, ইং ১৯১০, কলিকাতা, 8 নং উইলিয়ামস লেন, দাস যন্ত্রে শ্রী অমৃতলাল ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৭. উপেন্দ্রনাথ দাস , পিতা শ্রীনাথ দাস। উপেন্দ্রনাথ কৃষ্ণভবিনী দাসের ভাশুর। 'উপেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা নাট্যরচনায় বিপ্লব ঘটাইলেন দেশোদ্ধারের প্রচেষ্টায় খুন-জখম লাঠালাঠি ও ইংরেজ বিদ্বেষের মশলা যোগাইয়া।' [সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, খন্ড ৩, সপ্তম সংস্করণ ১৩৮৬,

মুদ্রণ ১৪১০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা ] উপেন্দ্রনাথের শরৎ সরোজিনী (১৮৭৪) নাটক খুবই সমাদৃত হয়, কিন্তু উপেন্দ্রনাথ নিজে পরিবারের অমতে বিধবাবিবাহ করায় পিতার রোষভাজন হন এবং তাঁকে উপেন্দ্র-সরোজিনী নামে ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। পরে তিনি পারিবারিক প্রয়াসে বিলেতে চলে যান কিছুদিনের জন্য।

৮. Modern Review, Founded and edited by Ramananda Chatterjee in 1907

৯. 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা , ১৩৬৯, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা

১০. শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরী, ১৯৫৭, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১১. 'শিবের ভূত', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১৩৬৯, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা

১২. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিলেতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি, ১৯৬১, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, কলকাতা

১৩. 'পরিশিষ্ট ২', কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ, ভূমিকা ও সম্পাদনা অরুণা চট্টোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৪১১, অগাস্ট ২০০৪ , দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেন্স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

১৪. বিমলা দাসগুপ্তা, নরওয়ে ভ্রমণ এবং কাশ্মীরে ক'দিন, ভূমিকা সীমন্তী সেন, সংকলন অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৭, পৌষ ১৪১৪, দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেন্স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

১৫. 'শোভনাসুন্দরী দেবীর ভ্রমনকথা', ঠাকুরবাড়ির ভ্রমণকথা, সম্পাঃ প্রত্যুষকুমার রীত, প্রথম প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৪১৯, মে ২০১২ , পত্রলেখা, কলকাতা, পৃ. ২০৪-২১৭

১৬. সরোজিনী (চট্টোপাধ্যায়) নাইডু ১৮৭৯-১৯৪৯, কংগ্রেস নেত্রী, গান্ধীর সঙ্গে সত্যাগ্রহে যোগ দেন, জেলে যান এবং পরে ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা গভর্নর হন ইউনাইটেড প্রভিন্স বা বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের। সুলেখিকা এবং সুকবি ছিলেন।

১৭. মনীষা দেবী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। অভিজ্ঞাসুন্দরীর বোন। মনীষা স্বামী দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলেতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর পিয়ানো শুনে ম্যাক্সমুলার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ চিঠি পাঠান তা রক্ষিত আছে রবীন্দ্রভারতী ম্যুজিয়মে। চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, প্রথম সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৩৮৭, তৃতীয় পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণের সপ্তম মুদ্রণ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১৮. অমলাশঙ্কর, সাত সাগরের পারে, য়ুরোপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রথম প্রকাশ মহালয়া আশ্বিন ১৩৪২, দ্বিতীয় প্রকাশ কলকাতা বইমেলা মাঘ ১৪১৩, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১৯. দুর্গাবতী ঘোষ, পশ্চিমযাত্রিকী, সম্পাদনাঃ অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩, দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেন্স্ স্টাডিজ, কলকাতা

২০. আলফ্রেড আর্নেস্ট জোন্স্ (১৮৭৯-১৯৫৮) ছিলেন একজন নিউরোলজিস্ট এবং মনোসমীক্ষক, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের আজীবনের বন্ধু এবং তাঁর মান্য জীবনীকার।

২১. উমা সিদ্ধান্ত, ইউরোপের ডায়েরি, প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ২০১২, রক্তকরবী, কলকাতা

২২. গিয়ামবোলগ্না – Giambologna (1529-1608) was a Flemish sculptor, based in Italy, celebrated for his marble and bronze statuary in late Renaissance, or Mannerist style.

২৩. ইগর মিটোরাজ – Igor Mitoraj (1944-2014) was the most internationally recognized Polish artist and sculptor.

২৪. কিথ হারিং- Keith Allen Haring ( 1958-1990) was an American artist whose pop art and graffitti-like work grew out of New York City street culture of the 1980s. Much of his work inclueds sexual allusions that turned into social activism.

২৫. আলেকজান্ডার ক্যালডার- Alexander Calder (1898-1976) was an American sculptor know for his Mobile art.

২৬. আন্তন পেভসনার- Antonie Pevsner (1884-1962) was a Russian born sculptor who is considered the pioneer of tweentieth-century sculpture

## [ ২ ]

### মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ

শরৎরেণু দেবী [রায়] বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গিয়েছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে। মূলত তিনি ইরান গিয়েছিলেন স্বামীর অফিস 'পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানি'র কর্মসূত্রে, স্বামীর সঙ্গে। সেখানে অতিবাহিত করেছেন কয়েকটি বছর; সাধারণ বাঙালি মেয়ের এই মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের দুর্লভ সুযোগ তিনি উপভোগ করেছিলেন এবং বাঙালি পাঠকের দরবারে সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিলেন তাঁর 'পারস্যে বঙ্গরমণী' শীর্ষক ভ্রমণকথায়, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার আষাঢ় ও কার্তিক ১৩২৩ সংখ্যায় [ইং.১৯১৬] ।[১] এর আগে বা পরে য়ুরোপগামী বহু ভ্রামণিকই যাত্রাপথে মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে বা না ঘুরে গন্তব্যে পৌঁছেছেন। কিন্তু শরৎরেণু মধ্যপ্রাচ্যে থেকেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা।

একটি প্রয়োজনীয়তা পূরণের (পারপাস সার্ভিং) স্থানান্তর কেমন করে হয়ে ওঠে আনন্দময় ভ্রমণবৃত্তান্ত তার উদাহরণ শরৎরেণুর এই লেখা। শরৎরেণু ইরানে বেড়াবার উদ্দেশ্য নিয়েই বেড়াতে যাননি, গিয়েছিলেন জীবনের ও তৎসাময়িক পরিস্থিতির দাবি মেনে। কিন্তু নিজের জীবনের এই ঘটনা শরৎরেণুর কাছে অত্যন্ত স্মরণীয় এবং বরণীয় অভিজ্ঞতা। যে সময় শরৎরেণু বেরোতে পারছেন দেশ ছেড়ে সমুদ্র পেরিয়ে অজানা দেশের আহ্বানে তার কয়েক দশক আগে থেকেই মেয়েরা ঘরের গন্ডি ছেড়ে বেরোতে এবং বেড়াতে আরম্ভ করেছেন। তবু এখনকার মতো তখন বেড়ানো বা ভ্রমণ ইন-থিং হয়ে ওঠেনি বাঙালির জীবনে; আর বাঙালি মেয়েদের জীবনে তো তা আরো অনেক পরের ঘটনা। তাই যাওয়ার আগের বিবরণ হিসেবে শরৎরেণু লিখেছেন,

> প্রথমে এইরূপ স্থির ছিল যে, আমার স্বামী একাকীই যাইবেন; কিন্তু পরে, আমারও তাঁহার সঙ্গে যাওয়া স্থির হইল শুনিয়া, অতিশয় আনন্দিত হইলাম; কারণ, কখন সাগরের জাহাজে চড়ি নাই। তারপর বাঙ্গালীর মেয়ের পারস্য-দেশ-ভ্রমণ, ইহাও সচরাচর ঘটে না। [পৃ. ১২০, 'পথের কথা' ]

স্বামীর সঙ্গে এই বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ পাওয়াকে শরৎরেণু স্বামীসেবার এক অভূতপুর্ব সুযোগ হিসেবে দেখছেন; স্বামীর সুখদুঃখের অংশভাগিনী হওয়ার সৌভাগ্য তাঁকে বেশ আনন্দিত করে তুলছে! কি অদ্ভুত কালাচার। যেন স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার জন্য, পায়ের বেড়ি খোলার জন্য একটা ভ্যালিড কারণ বেশ বুদ্ধি করে লিখে দিচ্ছেন শরৎরেণু তাঁর ভ্রমণলেখে। তাঁকে বাঙালি সমাজের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল বলে খুব বেশি মনে হয়না কেননা তিনি বোম্বে নিবাসিনীই ছিলেন বেশ কিছুকাল ধরে এবং সেখানে গুজরাতি পরিবারের স্ত্রীলোকদের সমর্থনসূচক মনোভাবের কথাই তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন। আর বাঙালি সমাজে বা পরিবারের মধ্যেই এই ভ্রমণ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন উঠলেও আজ আর তা জানার কোনো উপায় নেই। মনে রাখতে হবে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জাতীয়তাবাদের নির্মিতি বাংলায় তথা সমস্ত দেশে জুড়েই বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সেসময় ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং সমাজে সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ আলাদা (এমনকি 'অপর' বললেও ভুল হয় না যদি বঙ্গভঙ্গ ইত্যাদি প্রসঙ্গ মনে রাখা হয়) একটি দেশে যেন কত অনায়াসে চলে যেতে, বৈরি প্রতিবেশে (শরৎরেণুর লেখা বলছে দিনে রাতে সর্বদা সর্বত্র পার্শিয়ান কিম্বা আরবী লোকেরা সেসময়ও বন্দুক নিয়ে চলাফেরা করত অবলীলাক্রমে)

দিন অতিবাহিত করতে পেরেছেন শরৎরেণু। তা কি তবে আসলেই বাঙালির হাত ছাড়িয়ে ক্রমে পশ্চিম থেকে আরো পশ্চিমে যাওয়ার ফল? বেশ কয়েকবছর তিনি ছিলেন ইরানের আভাজ শহরে এবং বেড়ানোর আনন্দ উপভোগ করেছিলেন শত অসুবিধা সত্ত্বেও। তাঁর লেখায় প্রকাশিত তাঁর স্বামী সাধারণ সামান্য কর্মচারী ছিলেন কোনো এক তেল সংস্থার; এবং শরৎরেণু ও তাঁর স্বামীর বোম্বে থেকে মেহমেরা [বর্তমানে ইরানের খুররমশাহর] এবং মেহমেরা থেকে আভাজ পৌঁছনোর পথ একেবারেই মসৃণ ছিল না। বরং ছিল আতঙ্কের হিমশীতল ছিটে মাখানো। শরৎরেণুর যাত্রাপথ ছিল বোম্বে থেকে করাচি , মাস্কাট , বুশায়ার হয়ে মেহোমেরা এবং এই মেহোমেরা থেকে কারুণ নদীর তীরবর্তী আভাজ শহর। কিন্তু শরৎরেণু বাংলা থেকে আগেই বোম্বে (বর্তমান মুম্বই) গিয়েছিলেন, কিছুদিন বাসও করেছিলেন, এই লেখায় সেই পর্বের সামান্য উল্লেখ ছাড়া আর বোম্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে আর কোনো ভ্রমণলেখা পাওয়া যায়না তাঁর কলমে।

শরৎরেণুর যাত্রাপথ বলে দিচ্ছে তৎকালের মূলস্রোত ভ্রমণের চেয়ে অনেকটাই আলাদা ছিল তাঁর ভ্রমণ। কেননা আগেই বলা হয়েছে মূলস্রোত কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ইংল্যান্ড এবং ইউরোপকে লক্ষ্য করে। ১৯১৬-র ভারতবর্ষের পাতায় এই কাহিনী প্রকাশিত হলেও তাঁর লেখা থেকে বোঝা সম্ভব আরো অন্তত বছর চারেক কিম্বা তারও কিছু বেশি আগে তিনি এই পারস্য যাত্রা করেন। তাছাড়া বাঙালিনীদের ভ্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে মূলত যে বর্গের মহিলারা ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা উচ্চবিত্ত, বেশিরভাগই শিক্ষিত এবং প্রায় ক্ষেত্রেই সমাজের উচ্চবর্গীয় বিশিষ্ট পরিবারের নারী। শরৎরেণুর নামের সঙ্গে তেমন কোনো অভিজাত বংশগরিমার পরিচয়পত্র সংযুক্ত ছিল না। এমনকি তাঁর কোন ব্যক্তি-পরিচয়ই জানা সম্ভব হয়নি। যদিও লক্ষণীয় শরৎরেণু শিক্ষিত ছিলেন এবং পত্রিকায় লেখা পাঠানোর কথা ভেবেছিলেন (ভাগ্যিস, নইলে এমন ঝরঝরে নতুন রকম লেখাটি কিভাবে পড়ার সৌভাগ্য হত?!) কেবলমাত্র তাঁর লেখায় পিত্রালয় ‘আক্রিগঞ্জ’-এর উল্লেখ আছে, যা থেকে মনে হয় আধুনিকমনস্ক বাঙালি মেয়ের ভ্রমণের প্রগাঢ় পিতামহী কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতো তিনিও মুর্শিদাবাদের মেয়ে। আক্রিগঞ্জ বর্তমান মুর্শিদাবাদের এক মফস্বল এলাকা, যার সামান্য হদিশ পাওয়া যাচ্ছে ১৮৭৪ এর অগাস্ট এ প্রকাশিত ‘সাপল্মেন্ট টু দ্য ক্যালকাটা গেজেট’ -এ।[২]

এবারে আসি দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়ার পথের রুক্ষ এবং ভয়মিশ্রিত অভিজ্ঞতার কথায়। যেহেতু শরৎরেণু এলিট গোত্রীয়া ছিলেন না, তাই তাঁর ‘ভ্রমণের’ ব্যবস্থাপনাতেও খুব বেশি সুবিধা এবং আরামের আয়োজন আশা করা অন্যায়। আর সত্যিতেই তার কোন চিহ্নমাত্রও যে ছিল না তা শরৎরেণুর লেখায় স্পষ্ট। পথে ঘাটে বাঙালি মেয়ের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত দেশীয় রীতি বজায় রাখছেন শরৎরেণু। তিনি জাহাজের পাচকের হাতে খাবেন না, ফলে যথেষ্ট ফলমূল-মিষ্টান্নাদি সঙ্গী হচ্ছে তাঁর। ৬ অগাস্ট [বছর বলা নেই, অনুমিত হয় ১৯১১/১২ সাল ইং.] শরৎরেণুদের ছিল জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট। জাহাজের নাম “এস্ এস্ -- চাকলা”। খাওয়ার ছাড়া টিকিটের দাম সেই সময়ে ৯৬ টাকা এবং জাহাজে ওঠার পর থেকে শরৎরেণুদের জন্য রিজার্ভ করা দ্বিতীয় শ্রেণির কেবিনের কোন হদিশ নেই। একই কোম্পানির অন্য চাকুরেরা অনেক আগে থেকেই এসে তা দখল করে নিয়েছে এবং এই হল ভোগান্তির সবে মাত্র শুরু। এক তো দ্বিতীয় শ্রেণির কেবিন গুলি এঞ্জিনঘরের পিছনে হওয়ায় এবং কোনো ডেকেরই কাছাকাছি না হওয়ায় তা বায়ুলেশশূন্য জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডবৎ গরম ছিল এবং শরৎরেণুরা শুক্রবার দুপুরে জাহাজে উঠে রবিবার দুপুরের আগে কোন কেবিন পাননি থাকার জন্য, পুরো সময়টাই

ডেকে কাটিয়েছেন। শনিবার দুপুর থেকেই শুরু হয়েছে শরৎরেণুর উপর সমুদ্রপীড়ার দাপট। গা বমি, বমনোদ্রেক, মাথা ঘোরা ইত্যাদি নিয়েই ডেকের বিছানায় দিন কাটিয়ে রবিবার কিছু পার্শি এঞ্জিনিয়ারদের হস্তক্ষেপে নিজেদের জন্য বার্থ সংগ্রহ করছেন শরৎরেণুর স্বামী। এক একটি দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় তিনটি করে বার্থ, কোনো জানালা নেই; একটি করে পোর্ট-হোল, সমুদ্রের জল ঢুকে যাওয়ার কারণে সর্বদাই বন্ধ করা। ফলে শরৎরেণু সমস্ত পথই প্রায় অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। জাহাজ ক্রমশ করাচি, মাস্কাট হয়ে বুশায়ারে পৌঁছোয় চৌদ্দ অগাস্ট আর মাস্কাটেই শরৎরেণু আগের চাইতে অনেকখানি শারীরিক সুস্থতা লাভ করেন। তারপরদিন অর্থাৎ পনেরো অগাস্ট জাহাজ মেহমেরায় নোঙর করে। শরৎরেণুর এই সমস্ত অসুস্থতাটুকু জ্ঞাপন করার কারণ, এই অসুস্থতার ফলে তি্নি এবং তাঁর স্বামী পার্শি এবং খৃষ্টান এঞ্জিনিয়ারদের থেকে নানাবিধ সহায়তা পাচ্ছেন। বাঙালি মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেকদিন থেকেই নিজের স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্য দিবালোকে কথা বলাই ছিল মস্ত অপরাধ। রাসসুন্দরী দেবীর ৩ আত্মকথায় স্বামীকে এমনকি দিনমানে স্বামীর ঘোড়াকে দেখে অধোবদন ভয়ে ঘোমটা দেবার প্রসঙ্গ সবচেয়ে বেশি মনে আসে। আর শরৎরেণু বলছেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অচেনা সহযাত্রী পুরুষের কথা; যাঁরা তাঁর অসুস্থতার সময় অন্তত দিনে চার-পাঁচবার করে খবর নিয়ে গিয়েছেন, তাঁকে খাইয়েছেন, তাঁর স্বাস্থ্যের সর্ববিধ তদারক করেছেন এবং কুশলাদি বিনিময় করেছেন আন্তরিক ভাবে। এই সহযাত্রীদের পরপুরুষ বলে নিশ্চয় দেগে দিত বাছবিচারে শিরোমণি বঙ্গসমাজের নিয়ম-কানুন। কিন্তু শরৎরেণুর সৌভাগ্য এহেন সহায়তা মানুষে মানুষে সামাজিক প্রীতিবলেই তিনি গ্রহণ করতে পেরেছেন; এরপর ক্রমশ আরো আরো সহায়ক রূপে প্রতিপন্ন হয়েছেন এঞ্জিনিয়র মিস্টার অ্যানড্রুজ, মিস্টার বুদার এবং এক নাম না জানা ব্যবসায়ী সিন্ধ্রী যুবক প্রভৃতিরা। শুধু তাইই নয় মেহমেরা পৌঁছানোর সময় শরৎরেণুর স্বামী যখন জ্বরে আচ্ছন্ন তখন এমনকি তাঁদের বাক্স-প্যাঁটরা নামিয়েও সহায়তা করেছেন ভিন্নভাষী, ভিন্নধর্মাবলম্বী এই পুরুষ যাত্রীরাই। আর তারপর তো সেই সাংঘাতিক অসহনীয় সমস্যার উদয়। মেহমারায় পৌঁছে,হোগলা ছাওয়া বেড়ার কাস্টমস হাউসে বালির মধ্যে শরৎরেণুর ভাষায় একটি ''হ্যাটোকোট''ধারী জীবের 'দাক্ষিণ্যে' বাক্সের ভিতরকার জিনিসপত্র অপরিবর্তিত অবস্থায় এবং কিছু শুল্ক দিয়ে রওয়ানা হওয়া গেল পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানির বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করার লক্ষ্যে; এবং জানা গেল কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে তাঁদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা; যা আসলে অব্যবস্থারই নামান্তর। সেখানে পাকা ঘর থাকলেও আরব প্রহরীরা তা খুলে দিতে অরাজী এবং ফলস্বরূপ জ্বোরো স্বামী নিয়ে গাছের তলায় রাত কাটানো। সহজেই অনুমেয় স্বামী-নির্ভর বাঙালি মেয়ের বিপদপাতের গুরুত্ব। তারপর বহু চেষ্টা করে যদি বা ঘর খোলানো গেল তখন সঙ্গে কোন খাবার নেই। এবং শরৎরেণু আবার অসুস্থা। এমতাবস্থায় আবারো সেই এঞ্জিনিয়াররাই ত্রাতা। তাঁরা রান্না করে খাইয়ে গেলেন এই ভারতীয়া বাঙালিনীকে, ওষুধ আর পথ্যের ব্যবস্থা করলেই তাঁরাই এই বাঙালি দম্পতির জন্য। আর লেখিকার মন হয়ে উঠল কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সেসময় উঠে এলো দেশের কথা। ভারতবর্ষ নয়, বাংলাদেশের কথা। আত্মীয়পরিজন কিম্বা চিরচেনা প্রতিবেশীরাও যে মানুষের পাশে দাঁড়াতে কত দ্বিধাভিন্ন সেই অভিব্যক্তি,

> দেশে আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত প্রতিবেশীরাও প্রতিবেশীর জন্য এরূপ যত্ন ও সহানুভূতি প্রকাশ করে না। ... আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত এই ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রলোকগণের যত্ন ও সহানুভূতি আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না। [পৃ. ১৩০]

সাধারণ বাঙালি নারীর জীবনে বিদেশ বিভুঁইয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, কেবল মানুষ হিসেবে অবাধ সামাজিক মেলামেশার সুযোগ এনে দিল পারস্য ভ্রমণ; এই বোধহয় প্রথম বার।

এর আটদিন পর আবার জাহাজের নানাবিধ অসুবিধা সমস্যা এবং সাময়িক শারীরিক অসুস্থতা সঙ্গী করে ইরানের আভাজ নগরে চলে আসেন স্বামীর কর্মসূত্রে শরৎরেণু। সেখানে অন্তত চার বছর ছিলেন তা জানা যায় লেখা থেকে। শরৎরেণুর ব্যক্তিগত দেখার ধরণ উল্লেখের দাবি রাখে। একদম প্রথমেই বোম্বে থেকে জাহাজ ছাড়ার সময়ে কালো চামড়ার সাহেবদের কথা এসেছে। তিনি শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'মসীবর্ণ'। গৌরাঙ্গ সাহেব সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করতে দেশীয় কালো মানুষ নিজের জীবন বাজি রেখে আরব সাগরের জলে সাঁতার দিয়ে অর্জন করছে আধুলিমাত্র, তিক্ত শ্লেষের সঙ্গে লিখেছেন শরৎরেণু, যার সঙ্গে কিছু বা ব্যথাবোধ ও জড়িয়ে আছে। আভাজের ব্রিটিশ কনসালের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি, যার কাজ ভারতবসীদের পারস্যে বিবিধ উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করা। যদিও তার পরের বাক্যেই জানিয়েছেন, কিন্তু প্রতিকার করবার মত কোন ব্যবস্থার পরিচয়ই এঁদের সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি অনুভব করেছিলেন আরব দেশে নারীর সম্মান আরও কতটা ভূলুণ্ঠিত। পারস্যদেশে প্রথমরাত্রে অসহায়া নিজের গাছতলাবাসের অভিজ্ঞতালাভের আগেই শরৎরেণু দেখেছেন, মেহোমেরা পৌঁছকালে তিনজন পাঞ্জাবি মহিলা-- যাঁদের একজন সদ্যবিবাহিতা, বছর ষোলো বয়স; অব্যবস্থার দরুণ ইউফ্রেটিস এবং কারুণের সংগমস্থলে জনপূর্ণ 'বালাম' বা নৌকাডুবী হয়ে সলিলসমাধিস্থ হন। নিজেদের ডুবন্ত স্বামীরা ছাড়া কোনো পুরুষ এগিয়ে আসেনি তাদের সহায়তা করতে, করলে হয়তো তারা বেঁচেও ফিরতে পারতেন। আর এই ''হতভাগিনী''দের মৃত্যু তাঁকে 'মমেতি ন মমেতি চ' [৪] জনিত অব্যক্ত ভয়ে বিহ্বল করে দিয়েছিল। বহুমূল্যের এবং বহু ওজনের স্বর্ণালংকার যদি তাদের গায়ে না থাকতো অর্থাৎ ঘরের বাইরে এসেও দেশীয় আচার প্রথা এমন অন্ধভাবে যদি না মানতেন ওই মহিলারা তবু তাঁরা নিজেদের বাঁচাবার উদ্যোগ নিতে পারতেন বলে শরৎরেণুর অভিমত। এবং দেশ ছেড়ে সুদূরে আসার শাস্তিই যেন নিয়তি তাঁদের প্রতি বিধান করেছেন এমন একটা আশংকার ছায়া শরৎরেণুর লেখনীতে বিদ্যমান।

এই লেখার পরবর্তী পর্ব লেখার প্রতিশ্রুতি দিলেও শরৎরেণু দেবী [রায়]-এর আর কোনো লেখার সন্ধান পাওয়া যায়নি। উনিশ শতকের শেষদিকে বা বিশ শতকে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এমন ধারার আরো লেখা অন্যান্য বাঙালিনীর কলমেও উঠে আসেনি। ফলে পূর্বাপরবিহীন এবং সুখপাঠ্য এই লেখাটি আমাদের কাজকে পূর্ণতর করে তুলেছে।

তথ্যসূত্রঃ


১. অভিজিৎ সেন, উজ্জ্বল রায় (সম্পা), 'পারস্যে বঙ্গ-রমনী। বম্বে হইতে পারস্য উপসাগর (এস্ এস্ --চাকলা)', পথের কথা। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ, অগাস্ট ১৯৯৯, স্ত্রী, কলকাতা।

২. ১৮৭৪ জানুয়ারী-জুন , ক্যালকাটা গেজেট এর ক্রোড়পত্র,

https:// indianculture.gov.in/gazettes/index-supplement-calcutta-gazette-january-june-1874

৩. রাসসুন্দরী দেবী, আমার জীবন, দ্বিতীয় কলেজস্ট্রিট সংস্করণ—বইমেলা ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ—অক্টোবর ২০০২, কলেজস্ট্রিট পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৪. ‘ পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।/ তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।।’ (৩/১২) বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণ, বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনাঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, পুস্তক, কলিকাতা

[৩]

## পূর্বদেশ ভ্রমণঃ জাপানে বাঙালিনীর পদচিহ্নঃ অধ্যায়-জাপান

প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক আদান-প্রদান বহু যুগ ধরে প্রচলিত। সুপ্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধিক জ্ঞানতাপসদের এদেশে আগমন এবং বিদ্যাচর্চার দিন গুলি থেকে হাল আমলের ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাপানের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙালি মেয়েরা কিন্তু দেশের বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় নানাভাবে জাপান গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জাপান যাত্রারও [১] আগে জাপান বেড়াতে গিয়েছিলেন শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা। আর তাঁর লেখা থেকে জানা যায় ব্যবসায়িক সম্পর্কেও বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল জাপানের নাম। তাছাড়া আরো দুই মহিয়সী বঙ্গললনা জাপান ঘুরে এসে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা। লেডি অবলা বসু এবং সরোজনলিনী দেবী [দত্ত]। এঁদের দুজনের লেখাতেই জানা যায় বিশ শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে এঁরা জাপান যাচ্ছেন কারণ ভারতবর্ষের মতোই অন্য একটি পূর্বদেশে কিভাবে এসেছে এত শিক্ষা সভ্যতার জোয়ার যা নাকি তাবৎ বিশ্বকে করে তুলছে তার দ্যুতিতে মোহিত! সে দেশের মাটি কেমন? সে দেশের সমাজ ব্যবস্থা কেমন, সামাজিক ধারাগুলি কতটা মানবিক? সে দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে গার্হস্থ্যের চিত্র দেখার শোনার জানার আগ্রহ দুই নারীর মধ্যেই ছিল খুব বেশি। আর মূল আগ্রহের কেন্দ্রে ছিলেন জাপানী রমণীরা। কেমন ভাবে তাঁরা এক উন্নত দেশের অধিকারী হলেন এই ভাবনার প্রতিফলন জাপান ভ্রমণলেখগুলির পাতায় পাতায়। আর এই সমস্ত ভাবনাকে মন্ডিত করে শিরোমণির মতো বিরাজ করছিল নিজের দেশের দুর্মদ পরাধীনতার চিত্রকে কিভাবে কোন কৌশলে বদলে দেওয়া যায় তার এক দুঃসাধ্য ইচ্ছে। আমাদের আলোচ্য প্রতিটি লেখায় তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। নিজের সমাজের ভালো খারাপ গুণগুলির সঙ্গে জাপানি আধুনিক সমাজের তুলনা এবং সেই প্রামাণ্য মাপকাঠিতে নিজেদের উন্নততর করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার উপদেশে ভ্রমণকথাগুলি পূর্ণ। দেশ গড়তে জাতির শক্তিশালী বন্ধন গড়ে তুলতে জাপানের উদাহরণ বার বার দিয়েছেন এই মেয়েরা।

প্রথমেই বলব হরিপ্রভার কথা। হরিপ্রভা তাকেদা (১৮৯০-১৯৭২)। জন্মসূত্রে হরিপ্রভা মল্লিক। বিবাহসূত্রে হরিপ্রভা মল্লিক তাকেদা।হরিপ্রভার বাবা মা ক্রমান্বয়ে শশিভূষণ মল্লিক এবং নগেন্দ্রবালা দেবী। এঁরা দুজনেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক এবং সমাজ-সংস্কারক হিসেবে কাজ করতেন। অত্যন্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে এই কাজ তাঁদের করতে হত এবং অনাথ কন্যাদের জন্য তাঁরা একটি আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে মেয়েদের লেখাপড়া এবং গৃহকর্ম দুইই শেখানোর ব্যবস্থা হত। এই মেয়েরা মল্লিক পরিবারের সন্তানের মতোই প্রতিপালিত হতেন। অনেকক্ষেত্রে শশিভূষণ এই মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা হলে বিয়ের পরেও মেয়ে পড়াশোনা করবে এবং নিজের সন্তানরা সামান্য কিছু মাসোহারা পাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এমন শর্ত রাখতেন হবু জামাতাদের কাছে। তাঁরা বহু সময় সরকারী অর্থসাহায্যের আবেদনও করতেন। বোঝা যায় হরিপ্রভা বেশ অন্যধারার একটি পরিবারের শিক্ষা রক্তে নিয়ে বড়ো হয়েছেন। ১৯০৩ এ ওয়েমন তাকেদা বিখ্যাত বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরীতে রসায়নবিদ হিসেবে যোগ দেন । এই সাবান উৎপাদক কারখানাটি জাপানি মালিকানাধীন ছিল। ক্রমশ তিনি নিজে একটি সাবান উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ইন্দো-জাপানিজ সোপ ফ্যাক্টরি গড়ে তোলেন। ওয়েমন ছিলেন ঢাকায় প্রথমদিকের জাপানি পরিযায়ী। ১৯০৭ এ হরিপ্রভার সঙ্গে তাঁর বিয়ের সময় হরিপ্রভার বয়স ছিল সতেরো এবং তিনি স্কুলের পড়া শেষ করে এন্ট্রান্স পাশ করেছিলেন। সেযুগের এক বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা ব্রাহ্মকন্যা ছিলেন হরিপ্রভা মল্লিক।

ওয়েমন তাকেদার সঙ্গে ১৯১২ সালের ৩ নভেম্বর হরিপ্রভা জাহাজে জাপান রওনা দিলেন। এই পথ য়ুরোপের পথ নয়। এবং তিনিই প্রথম বঙ্গমহিলা যিনি শুধু একাধিকবার জাপান বেড়াতে এবং থাকতে গিয়েছেন তাইই নয়, তিনি প্রথম বঙ্গবালা যিনি জাপানের বধূ। ১৯১২ তে প্রথমবার, ১৯২৪ এ দ্বিতীয়বার এবং ১৯৪১ সালে তৃতীয়বারের জন্য তাঁরা জাপানে যান। মনস্বিনী হরিপ্রভা তাঁর শ্বশুরবাড়ির দেশের ছবি ধরে রেখেছেন "বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা"[২] নামক ভ্রমণকথায়।

প্রাথমিকভাবে বাঙালির চিরচেনা বাধা এসেছে হরিপ্রভার যাত্রার আগেও। তিনি শুরুতেই লিখেছেন,

আমার যখন বিবাহ হয় তখন কেহ মনে করে নাই যে আমি জাপান যাইব। কাহারও ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু আমার বড়ই ইচ্ছা হইত আমি একবার যাই। সে ইচ্ছা স্বপ্নেই পর্যবসিত হইত। বিবাহের পর

শ্বশুর-শাশুড়ির আশীর্বাদ লাভ করিতে ইচ্ছা হইত, তাঁহাদের নিকট পত্র লিখিয়া যখন তাঁহাদের ফোটো সহ আশীর্বাদপূর্ণ একখানি পত্র পাইলাম ও তাঁহারা আমাদের দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া পত্র লিখিলেন, আমার প্রাণ তখন আনন্দে ভরিয়া গেল। তাঁহাদিগকে ও তাঁদের দেশ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিল। ... যখন জাপান হইতে পুনঃপুনঃ পত্র পাইয়া যাওয়া মনস্থ করিলাম তখন চারিদিকের অবস্থা ভারি প্রতিকূল। অর্থবল সামান্য, সম্মুখে শীতকাল, আত্মীয়গণের অনিচ্ছা, অনেকের নানা ভয়প্রদর্শন। [পৃ.১৯, বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা]

সব কটি কারণের মধ্যে শেষের দুটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় আমাদের থিসিসের পক্ষে। বাঙালির মানসিক বাধার সামূহিক প্রকাশ।এই প্রয়াস অবশ্যই আজও জারি থেকে কিছু কিছু মেয়ের কক্ষপথ বিচ্ছিন্ন করে দেয় জীবনের থেকে। পুরুষের জন্য এই বাধা অতি নমনীয়, বিবিধ সামাজিক প্রশ্রয়দুষ্ট। হরিপ্রভা কিন্তু জাপান গেলেন এবং প্রথমবার চার মাস রইলেন। জাপানের যাত্রাপথ অবশ্যই আপামর বাঙালির কাছে সেসময় নতুন। আজও জাপান বাঙালি পর্যটনের মূলস্রোতে এসে মেশেনি। তাকেদা দম্পতি যে জাহাজে উঠেছিলেন তাতে প্রথম শ্রেণীর কেবিন তাঁরা পাননি। ওয়েমন তাকেদার শরীর অশক্ত ছিল। আর এরই মধ্যে প্রায় ৬০০ ছাগল ভেড়া একই জাহাজে সিঙ্গাপুরের যাত্রী। ফলে হরিপ্রভাদের যন্ত্রণা দুর্ভোগ কিছু বেশিই হয়েছিল। জাহাজে থাকতেই হরিপ্রভা চামচে খাওয়া অভ্যাস করেছেন জানা যায়। রেঙ্গুন থেকে সিঙ্গাপুর (পেনাং বন্দর) হয়ে হংকং। হংকং থেকে জাপানের পোর্ট মোজিতে প্রবেশ। সেখান থেকে কোবে হয়ে তাকেদাসানের বাড়ি পৌঁছলেন। এরমধ্যেই ঘটে গিয়েছে বাঙালি মেয়ের জীবনের অদ্ভুত ঘটনা। জাপানের সমস্ত সংবাদপত্রে জাপানি পুরুষের ভারতীয় কন্যা বিবাহের খবর এবং তাকেদা দম্পতির ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে কন্যার পিতার পরিচয় এবং প্রভূত সুখ্যাতি। উপনিবেশের অত্যাচারিত মানুষের কাছে এ এক অনাবিল আশার আলো হয়ে দেখা দেয়।

জাপান দর্শনের দিনগুলিতে হরিপ্রভাকে টেনেছিল মেয়েদের স্কুলের শিক্ষার পদ্ধতি। হরিপ্রভা চমৎকৃত হচ্ছেন এবং লিখছেন (পরে অবলা বসু এবং সরোজনলিনী দত্তের লেখাতেও এই উল্লেখ আবারো পাবো),

স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রী আমাদের সব দেখাইলেন। ইনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সুশিক্ষিতা, ইংরাজী বেশ জানেন। ... সংসারে উন্নত জীবন লাভ করিয়া প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে ও সন্তানসন্ততি এবং দেশবাসীদের মানুষ করিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন তার বুঝি কোনোটিরই এখানে অভাব নাই।

স্কুলটিতে রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা, সাধারণ শরীরতত্ত্ব ইত্যাদি কলেজের পাঠ্য উন্নত বিষয় হইতে রন্ধনকার্য, ধোপার কাজ, গৃহাদি পরিষ্কার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যানের কাজ, সেলাই, গান বাজনা, শিল্পকাজ, ড্রইং, নীতিশিক্ষা, ইংরাজী ভাষা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। ... মেয়েরা কখনও কেমিস্ট্রি আলোচনা করে এবং কাচের পাইপের ভেতর নানাবিধ গ্যাসের সংযোজন বিয়োজন ইত্যাদি শিক্ষালাভ করিতেছে। আবার মেয়েদিগকে আদব কায়দা, পরস্পর সম্মান রাখার জন্য যে সকল কথা বলিতে হয়, বিনম্রতা, গুরুজনে ভক্তি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। [পৃ. ৩৬-৩৭]

শুধু তাই নয়, হরিপ্রভার ভালো লেগেছিল মানুষকে সম্মান দেওয়ার জাপানি প্রক্রিয়া। নমস্কারের সময় উভয়পক্ষের মাথা নত করা। সেখানে কোনো লিঙ্গ বা বয়সের ভেদ নেই। ঠিক যেমন শিক্ষা এবং ভ্রমণের ক্ষেত্রে নেই স্ত্রী-পুরুষ ভেদ। নিরক্ষর মানুষ জাপানে দুর্লভ, এই গুণটিকে হরিপ্রভা ঈশ্বর জ্ঞানে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। কারণ নিজের দেশের মেয়েদের অমানবিক দুর্দশা তিনি ভুলতে পারেননি। ঠিক সেই কারণেই লেডি বসু এবং সরোজনলিনী দত্ত দেশের মেয়েদের উন্নতিকল্পে জাপানি পদ্ধতি গ্রহণ করার, দেশীয় ছাঁদে অনুসরণ করার কথা তাঁদের ভ্রমণকাহিনীতে বার বার বলেছেন।

হরিপ্রভা জানাচ্ছেন জাপানের মেয়েদের জীবন অনেক রঙিন। শুধুমাত্র 'রন্ধন ও ভোজন' কার্যই তাঁদের একমাত্র কাজ নয়। আমাদের দেশে যেমন স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারতেন কিন্তু উলটো রীতির প্রচলন তখনো ছিল না, জাপানে কিন্তু মেয়েদের স্বামীত্যাগের অধিকার ছিল যদিও আমাদেরি দেশের মতো মেয়েটির বিবাহসম্বন্ধ করার সময় অভিভাবকেরা তার মতকেই কোনো গুরুত্ব দিতেন না। তবে বয়স্থ যুবক-যুবতীর পারস্পরিক পছন্দের বিরোধিতা করা হত না, যা আমাদের দেশে অসম্ভব ছিল এমনকি বিংশ শতকের প্রথমার্ধে।

অবলা বসু ( ১৮৬৫-১৯৫১) ১৯১৪-১৫ তে জাপান যান। [৩] অবলার সমস্ত ভ্রমণকথাই প্রায় শিশু কিশোরদের কেন্দ্র করে লেখা। সেইসব ভ্রমণকথায় উপদেশাত্মক ভাবটি বেশ পরিস্ফুট। আমরা আপাতত অবলা এবং তারপর সরোজনলিনীর জাপান ভ্রমণ সমাপ্ত করে আবারো ফিরবো হরিপ্রভা তাকেদায়। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জাপানে ছিলেন এবং ভারতবর্ষের তরফে বিশেষ কিছু কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ জরুরি।

জাপান গেলে সকলেই মূলত কোবে, ওসাকা, কিয়োটো মন্দির ও শহর, নাগোয়া, মিকিসাতো মুক্তাসেচন কেন্দ্র, ইসে মন্দির ইত্যাদি অঞ্চল ভ্রমণ করতেন। অবলা যেখানেই গিয়েছেন সেই দেশের মেয়েদের কথা শিশুদের কথা, সেই দেশের মানুষের ভালো ভালো অভ্যাসের কথা তুলে ধরেছেন। জাপানে গিয়েও মেয়েদের দেখে লিখছেন,

ইয়ুরোপীয় প্রথার অনুরূপ না হইলেও জাপানে নারীগণের স্বাধীনতা আছে, তাঁহারা প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া অবাধে যাতায়াত করেন, তাহাতে লজ্জা নাই। চাকরাণী না থাকিলে সন্তানগুলি লইয়া বাহিরে বেড়াইয়া আনা গৃহিনীরই কর্ত্তব্য। কিন্তু গৃহে সকল পুরুষের সঙ্গে ইঁহারা মিশেন না। গৃহস্বামীর বন্ধুগণ তাঁহার নিকট আসেন , গৃহিণীর বন্ধুরা গৃহিণীর নিকট আসেন কিন্তু বাটীর বাহির হইবার সময় স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা একত্র বাহির হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা না থাকাতে সেখানে সকলের শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও সবল। রেলগাড়ী ও ট্রামে নারী ও পুরুষ অসঙ্কোচে যাতায়াত করিতেছে দেখা যায়। [পৃ. ১০৬, অবলা বসুর ভ্রমণকথা]

অবলাও মেয়েদের শিক্ষাদানপ্রণালী সম্পর্কে লিখেছেন,

বালিকা বিদ্যালয়ে লিখিতে পড়িতে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নারীর দৈনন্দিন জীবনের করণীয় সমুদয় কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। রন্ধন, বস্ত্র পরিষ্কার, হিসাব রক্ষা, সামাজিক সৌজন্য প্রকাশের সমুদয় রীতিনীতি, ফুল সাজাইবার প্রণালী, চা পানে নিমন্ত্রণ করিবার সমুদয় নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়। [পৃ.১০৮ ]

অবলা বসুর মতোই সরোজনলিনীও বিভিন্ন গৃহস্থ পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করে সমাজে মেয়েদের ভূমিকা এবং অবস্থান বুঝতে চেয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই শুধু য়ুরোপ নয় অন্যান্য প্রাচ্যদেশেও নারীর আদর্শমূর্তির সন্ধান করছিলেন, যাতে ভারতীয় নারীর নবরূপটি সর্বতোভাবে চিরন্তনী এবং কল্যণকারী হয়ে ওঠে। তারই সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা এবং রীতিনীতির প্রয়োগকেও তাঁরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেছিলেন। বাঙালি মেয়েদের ভাবনা-চিন্তার প্রসার এবং জীবনযাপনের মানোন্নয়নের জন্য এই খোঁজ খুবই যথার্থ ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের মতো পিছিয়ে থাকা মানসিকতার বহু মানুষ শুরুতেই আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন। মেয়েদের এবি শিখে বিবি হয়ে থাকার আতঙ্কে তাঁরা নির্ঘুম রাত

কাটিয়েছেন কিন্তু কিভাবে সঠিক ভারসাম্য মেনে শিক্ষার ধারা বজায় রাখা সম্ভব তার খোঁজ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় মেয়েরা পেলেন জাপানে গিয়ে!

১৯২০ সালের ১৭ এপ্রিল স্বামী গুরুসদয় দত্ত এবং ছেলের সঙ্গে সরোজনলিনী দেবী (দত্ত) (১৮৮৭-১৯২৪) জাপান বেড়াতে যান। যাত্রাপথ হরিপ্রভা তাকেদারই মতো। কিন্তু যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই উচ্চমানের। জাপানে গিয়ে দেশীয় বিশেষত বঙ্গীয় সমাজের বিভিন্ন দুর্দশার অনুভব সম্যক অনুভূত হয়েছে সরোজনলিনীর চোখে। বঙ্গীয় চাষীদের দুরবস্থা, দেশীয় মন্দির গুলির দুর্দশা এবং দেশের সর্বত্র একটা অব্যবস্থা, পরাধীন জাতির অগৌরবের প্রসঙ্গ বারে বারে এসেছে 'জাপানে বঙ্গনারী' [৪] শীর্ষক ভ্রমণকথায়। যেমন,

> সিঙ্গাপুর, হংকং ও বিশেষ ভাবে সাংহাইতে অনেক শিখ ও পাঠান পাহারাওয়ালা আছে। এরা প্রত্যেকেই খুব লম্বা ও বলিষ্ঠকায় পুরুষ। খর্ব্বাকৃতি চিনেদের মধ্যে এদের আরো লম্বা ও বলবান দেখায়। এদের দেখলে আনন্দ হয় কি দুঃখ হয় তা বলা শক্ত। ... যখন মনে পড়ে যে এত বল এত সতেজ শরীর নিয়েও এরা সামান্য বেতনে দাসত্ব কর্‌ছে তখন লজ্জায় মরে যেতে হয়। আমরা ভারতমাতার কত অযোগ্য সন্তান দেশের বাইরে এসে মনে তা আরও বেশি রকমে উপলব্ধি করা যায়। ... ভারতের লোক দাসত্ব ছাড়া বুঝি আর কিছু জানেনা। [ পৃষ্ঠা. ৬৫-৬৬, জাপানে বঙ্গনারী]

সরোজনলিনীর লেখায় কেবল বাঙালির কথাই নয়, সামগ্রিক ভাবে দেশীয় বা জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত বহু সময়ে উঠে এসেছে।

এই লেখাগুলি বই হিসেবে যতদিনে প্রকাশ পেয়েছিল , সরোজনলিনী তারই মধ্যে ১৯২৪ সালে অকস্মাৎ প্রয়াত হন। ১৯২৮ এ 'জাপানে বঙ্গনারী' প্রথম প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় গুরুসদয় দত্ত লিখেছেন দেশবাসীর উপকারার্থে সরোজনলিনী এই ভ্রমণকথা লিখেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই প্রবণতা ভারতীয় নারীদের মধ্যে খুবই ক্রিয়াশীল ছিল।

চিনে এবং জাপানে মেয়েদের পর্দা বা অবরোধ প্রথা না থাকা সরোজনলিনীকে খুবই মুগ্ধ করেছে। আর যা তাঁকে সবচেয়ে স্পর্শ করেছে তা হল শৃঙ্খলা বোধ। একটি কনসার্টে গিয়ে বিভিন্ন বয়সী মেয়েদের দেখে তিনি স্বামীর বন্ধু জাপানি ভদ্রলোক মিস্টার কাঁগাওয়ার থেকে তাদের সম্পর্কে জেনেছেন এবং লিখছেন,

ওদের মহিলারা প্রায় সবাই শিক্ষিতা। অবশ্য আমাদের দেশের ধারণায় ইংরাজি না জান্‌লে শিক্ষা হয় না, কিন্তু এঁদের সে ধারণা নেই। খালি জাপানি ভাষাতেই এঁরা বেশ শিক্ষিতা হতে পারেন। আজকাল শিক্ষা সম্পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত অনেকেই বিবাহ করে না। সেজন্যে বাইশ তেইশ বৎসরের আগে জাপানি মেয়েদের বিবাহ হয় না। ... এঁদের ভদ্রতায় মুগ্ধ হতে হয়। কনসার্টে এতোগুলি মহিলা এসে আমার কাছে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বিদেশী লোক বা বিদেশী পোষাক দেখে কেউ বিদ্রূপ, হাসি ঠাট্টা বা কানাকানি করলে না। আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এই কুঅভ্যাসটি খুবই আছে। জাপানিদের মধ্যে আজ এমন অনেক গুণ দেখা গেল যেগুলি আমাদের শিক্ষা করা উচিত। তারা কৃত্রিমতা মোটেই জানেনা। চলা-ফেরা কথাবার্ত্তাতে এমন একটা স্বাভাবিকতা আছে, যা আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে আদপেই দেখা যায় না। অনর্থক লজ্জা বা জড়তা এদের মধ্যে একেবারেই নেই, অথচ ব্যবহারে ওদের বেশ নম্রতা থাকে। এদের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের তুলনা কর্‌লে আমাদের যে কত শিক্ষার অভাব তা স্পষ্ট বুঝা যায়। [পৃ. ১৭৫]

শিক্ষা বিষয়ে সরোজনলিনীর অসামান্য অনুভব। আমাদের দেশীয় মেয়েদের অভিভাবকেরা পড়াতে চান না, তার বদলে সংসারের কাজ শিখিয়ে অশিক্ষিত রাখেন। জাপানে কিন্তু নারী-পুরুষের শিক্ষায় সমান আগ্রহ, সমান অধিকার। জাপানি স্কুল গুলো দেখে তিনি লিখতে বাধ্য হন,

স্কুলের বাড়ি ঘর জাপানিরা যে রকম করেছে আমাদের দেশের স্কুলগুলি তার তুলনায় গোয়াল-ঘর মাত্র। যতদিন শিক্ষার মর্য্যাদা আমরা না বুঝ্‌ব ততদিন আমাদের এই হীন পরাধীন অবস্থায় থাকতে হবে। [পৃ. ২০৬]

লক্ষণীয় য়ুরোপ চীন বা জাপান যে দেশেই বাঙালি মেয়েরা গিয়েছেন একইরকম ভাবে নারী স্বাধীনতা ও শিক্ষার পক্ষে সওয়াল করেছেন।

আবারো ফিরবো হরিপ্রভায়। অদ্‌ভুতকর্মা বাঙালি মেয়ের জীবনের বিস্তার বোঝাবার জন্য আগেই বলা হয়েছে এ প্রসঙ্গ অত্যন্ত জরুরি। হরিপ্রভা শেষবারের জন্য জাপানে যান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যে ১৯৪১-এ। লিখেছেন,

কলিকাতার নিষ্প্রদীপ সন্ধ্যার অন্ধকারেরাজপথ বেয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখি কলিকাতা থেকে অনেক জাপানি চলেছেন।... ভাই বন্ধু দেশের কাছে বিদায় নিলাম। চোখের জল শুকিয়ে গেছে।গাড়ি আমাদের নিয়ে ছুটল। ... জাপানে খাদ্যাভাব। যব মিশ্রিত চাল রেশনে খেতে হয়। [পৃঃ৬৪ , বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা]

মোগলসরাই থেকে বম্বে ঘুরে জাপান পৌঁছতে পারলেন তাকেদা দম্পতি বহুতর প্রয়াসে। পথে অভিজ্ঞতা করলেন সিঙ্গাপুরে জাহাজের সন্তর্পণ গতি সমুদ্রে ভাসমান ছিন্ন মাইনের সংযোগ ভয়ে। যেন যুদ্ধের সঙ্গে লুকোচুরি। কিন্তু লুকোচুরি আর রইল না জাপান পৌঁছে। কোবে থেকে ওসাকা হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখতে দেখতে নানা পথে নাগোয়া শহরে বাড়ি এলেন। তার কিছুদিন পর ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ থেকে জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর ১৯৪২-এ হরিপ্রভা টোকিয়ো চলে আসেন এবং হোঙ্গানজি মন্দিরে এক স্মরণসভায় জেনারেল তোজোর সঙ্গে পরিচিত হন। এরপর,

> রাসবিহারী বসু মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। ভারত স্বাধীনতা চেষ্টায় এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি ব্যস্ত। ... ১৯৪৩ সনের নভেম্বরে নেতাজী সুভাষ বসুর টোকিয়ো আসার সংবাদে আবারো টোকিয়ো যাই। কিন্তু তাঁর সাথে সাক্ষাতের কোন উপায় করতে না পেরে আবার রাসবিহারী বসুর সঙ্গে দেখা করি। এখানেই বসু মহাশয়ের সঙ্গে রেডিও ব্রডকাস্টের ব্যবস্থার কথা হয় এবং তিনি নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাদের Imperial হোটেলে যেতে বলেন। ১৯৩০ সনে ২৬শে জানুয়ারী কল্‌কাতায় স্বাধীনতা পতাকা উত্তোলনের দিন গোরা সৈন্যের লাঠির প্রহারে রক্তাক্ত দেহের উপর যে মহিলাগণ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমি সুভাষ বসুর পাশে দাঁড়াবার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। ... আজ তাঁর পাশে বসে আহার ও আলাপ হল। [পৃঃ ৭১-৭২, তদেব]

এর পরের অংশ গায়ে কাঁটা দেওয়া। টোকিয়ো ব্রডকাস্টিং স্টেশনে বাঙালি কন্যা হরিপ্রভা প্রতি রাতে যেতেন সংবাদ পাঠের উদ্দেশ্যে, গায়ে থাকতো সমস্ত পোষাকের উপর রেইনকোট। সমস্ত গয়না এবং পাসপোর্ট পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে অন্ধকারে, বেশিরভাগ দিনই এয়ার রেইডের মধ্যে দিয়ে হরিপ্রভা যেতেন রেডিও অফিসে আজাদ হিন্দ বাহিনীর খবর ঘোষণা করতে। এর মধ্যেই তিনি বহুবার নিজে অসুস্থ হয়েছেন, অসুস্থ হয়েছেন তাঁর স্বামী ওয়েমন। তখন তিনি বৃদ্ধপ্রায়। এভাবে ১৯৪৪ পর্যন্ত নেতাজির সঙ্গে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকায় ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলেন হরিপ্রভা। নেতাজীর থেকে যে সম্মান পেয়েছেন তা অসীম এবং আজীবন মনে রেখেছেন। সরাসরি সেনাবাহিনীতে কাজ না করলেও নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে এবং নিজের ও পরিবারের জীবন বিপন্ন করে এক বাঙালি মেয়ের এই অবদান অবিস্মরণীয়।

দুঃখের বিষয় নিজের দেশের গন্ডির বাইরে বেরিয়ে বাঙালি মেয়েরা শতভুজা হয়ে উঠেছেন, শতধায় চালিত , বিস্তৃত হয়েছে তাঁদের কর্মশক্তি, ভাবনা শক্তি, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার শক্তি। দেশের মধ্যে বাঙালি সমাজের ছোট্ট সংসারের ঘেরাটোপের মধ্যে যার সর্পিল প্রকাশ মানসিক বৈক্লব্যের দিকে চালিত করত মেয়েদের মূলত ঋণাত্মকতার দিকে। এই মহিয়সীরা সর্বক্ষেত্রে আমাদের বন্ধন মুক্ত করে চিরপ্রণত করে গিয়েছেন।

তথ্যসূত্রঃ

১. রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাপান যাত্রা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৯ মে। নোবেল পাওয়ার পর জাপান থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল ১৯১৫ তে। পরে আরো চারবার জাপান যান, যথাক্রমে, ১৯১৭, ১৯২৪ এবং ১৯২৯ এ কানাডা যাওয়া এবং দেশে ফেরার পথে দু'বার। তাঁর জাপান ভ্রমণকথা জাপান যাত্রী প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩২৬ (ইং. ১৯১৯)

২. প্রথম প্রকাশ অধুনা পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে। পরে ঢাকা থেকেই ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয় সাহিত্যপ্রকাশ সংস্করণ, মনজরুল হকের সম্পাদনায়। আমরা ব্যবহার করেছি,

হরিপ্রভা তাকেদা, বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা, সম্পাঃ ড. মঞ্জুশ্রী সিংহ, প্রথম ডি. এম. কলকাতা সংস্করণ পৌষ ১৪১৫, জানুয়ারি, ২০০৯ , ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা

৩. অবলা বসু, জাপান ভ্রমণ, 'মুকুল', চৈত্র, ১৩২২ এ প্রকাশিত । আমরা ব্যবহার করেছি,

অবলা বসুর ভ্রমণকথা, সংকলন ও সম্পাঃ দময়ন্তী দাশগুপ্ত, পৌষ ১৪২১, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা -৭৩

৪. সরোজনলিনী দত্তর জাপানে বঙ্গনারী 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় ভাদ্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা থেকে দ্বাদশ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। আমরা বর্তমানে ব্যবহার করেছি,

ইন্দুমাধবের চীন ভ্রমণ সরোজনলিনীর জাপানে বঙ্গনারী, সম্পাঃ সীমন্তী সেন , প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১০, ছাতিম বুকস্, পরিবেশকঃ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা-৭০০০১৬

[ ৪ ]

## চীন ভ্রমণ

একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ভ্রমণের উদাহরণ মৈত্রেয়ী দেবীর (১৯১৪-১৯৯০) চীন ভ্রমণ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর, ১৯৭৭ সালে। রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হয়েও বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধান প্রসাশকের কাছের মানুষ হওয়ায় ইন্দো-চৈনিক সম্ভ্রান্ত ডেলিগেশনের তালিকায় নাম ওঠে মৈত্রেয়ী দেবীর । আর মৈত্রেয়ী দেশে ফিরেই লেখেন, 'অচেনা চীন', যা প্রকাশ পায় এপ্রিল ১৯৭৮ এ। সেই একই বছরে তাঁর প্রখ্যাত উপন্যাস 'ন হণ্যতে' আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। মৈত্রেয়ী দেবী নিজে বিখ্যাত সাহিত্যিক, তাছাড়াও তাঁর বাবা ভারতীয় দর্শনের খ্যাতনামা অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। মৈত্রেয়ী ছোট থেকে রবীন্দ্রঘনিষ্ঠ এবং অনুরাগী হিসেবে বাঙালি সমাজে বিপুল পরিচিতা। এহেন নারীর শিক্ষাও বলা বাহুল্য বিপুল বিস্তারে বিস্তৃত। যে সময়ের কথা বলছি, এ সময় দেশ স্বাধীন হয়ে আরো তিন দশক কেটে গিয়েছে। ইংরেজ শাসন লাঞ্ছিত দেশ স্বাধীনতার পরে পরেই দেখেছে প্রদেশে প্রদেশে বিক্ষিপ্ত আন্দোলন এবং বেশ কিছু লজ্জাজনক বিশৃঙ্খলার ইতিহাস। এ সময় সমাজে মেয়েদের শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, কর্মজগতেও ছাড়পত্র মিলেছে। মূলত স্বাধীনতার পর থেকেই পেশাগতভাবে নারী পুরুষের ভেদ ঘুচে যেতে শুরু করেছিল। জওহরলাল নেহরুর উত্তরসূরী হিসেবে কন্যা ইন্দিরা দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় সাধারণ-অসাধারণ সব মেয়েদেরই ভাবনা পক্ষ বিস্তার করেছিল বিবিধ ভাবে। চিন ভারত যুদ্ধের পর থেকেই দুই দেশের আন্তঃসম্পর্কের অবনমন রাজনৈতিক ভাবে প্রভাব ফেলেছিল, এমনকি সাধারণ নাগরিক জীবনেও। আর ছয় দশকের শেষ ভাগের নকশাল আন্দোলনের সময় দেওয়াল ছেয়ে গিয়েছিল "চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান" শ্লোগানে। এসময় রবীন্দ্রনাথ কম্যিউনিস্টদের মধ্যে অভিহিত হয়েছেন বুর্জোয়া কবি হিসেবে। রাশিয়ায় ক্যামিউনিজম আর চিনের ক্যামিউনিজম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। চিনের কালচারাল রেভলিউশন বা সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানোত্তর পর্বে ভারতবর্ষ থেকে এবং চিন থেকে দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্বের হাত প্রসারণ করার ভাবনা যাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁদের মধ্যে

একজন মৈত্রেয়ী। বোঝা সম্ভব এই সময়ে মেয়েদের অবস্থানের খোলনলচে বদলের ইঙ্গিত সময়ের ভাঁজে ভাঁজে পরিস্‌ফুট হচ্ছে।

চিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রসারণের এই প্রস্তাব মৈত্রেয়ীর তরফে এসেছিল বিশুদ্ধ রবীন্দ্রভাবনা থেকে। আরো কিছুও ছিল সামাজিক কর্তব্যের দায়, তবে রবীন্দ্রপ্রয়াণের প্রায় চার দশকের মধ্যেই রবীন্দ্রভাবনা যেভাবে বিস্মৃত হয়ে ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে দাঁড়িয়েছিল ইয়ুরোপ, আমেরিকায় মৈত্রেয়ী চেয়েছিলেন চিনের মাধ্যমে তার এক বৌদ্ধিক পর্যালোচনা করতে। খুব সম্ভবত এও ভেবেছিলেন উচ্চতর রাজনৈতিক মহলের হস্তক্ষেপে এ বিষয়ে ক্রমশ য়ুরোপ এবং আমেরিকায় ক্রমেই নতুন করে রবীন্দ্র-পরিচয়ের অভিজ্ঞান গড়ে তোলা যাবে।

আমরা বাঙালি মেয়েদের লেখা ভ্রমণকাহিনীর মধ্যেই দেখেছি রবীন্দ্রপূর্ব যুগ এবং কবির সমকালের বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থানগত রেখাচিত্রের উচ্চাবচতা। যার সমান্তরালে প্রকাশিত হয়েছে কবিমানসের বিবর্তনের রেখাচিত্রও। ১৯৬১তে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চিনের বিবিধ অনুষ্ঠান এবং কার্যসূচীর পরিচয় ভারতবর্ষ পেয়েছিল। অথচ তার কিছুদিনের মধ্যেই দুদেশের যুদ্ধের দামামায় মুখরিত হয়েছিল বিশ্বের বাতাস। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতকের প্রথমার্ধে জাপানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চিনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্রত্যক্ষভাবে। তার খেসার রবীন্দ্রনাথকেই দিতে হয়েছিল জাপানে গিয়ে। তাঁর সমস্ত জনসমর্থন হারিয়ে গিয়েছিল।[১] সেই চিন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কিভাবে ভাবছে তার একটা তৎসাম্প্রতিক ছবি মৈত্রেয়ী খুঁজতে চাইছিলেন চিনে পৌঁছে গিয়ে। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই বারে বারে উদ্ঘাটিত হয়েছে মৈত্রেয়ীর লেখায় বঙ্গীয় এবং দেশজ সমকাল, ভাবনা। স্বাধীনতা-উত্তর বিবর্তিত বাঙালি সমাজের ক্লেদাক্ত রূপ, যেখানে আধুনিকতা থাকলেও শাশ্বত ভাবনার এবং জীবনবোধের একান্ত অভাব সমাজের গর্তগুলিকে প্রকট করে তুলেছে। বাঙালি মেয়েরা যুগে যুগে আত্মসমালোচনার চাবুক চালিয়ে নিজের এবং সমাজমানসের গোড়ায় ঘনীভূত অন্ধকার দূর করার প্রয়াস করেছেন, যা তাঁদের তো আলোকিত করেইছে, বহুযুগ পরের কন্যাদের ও কঠিন সময়ের সঙ্গে চলার পথ দেখাচ্ছে।

মৈত্রেয়ীর লেখায় বাংলার বিস্রস্ত অবস্থার সঙ্গে একই সুতোয় ধরা পড়েছে দেশীয় রাজনীতির স্বার্থান্ধ রূপটি। স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরেও দেশের বিশৃঙ্খল রূপটি পীড়াদায়ক ভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে প্রায় সমসময়ে স্বাধীন হওয়া চিনের সুশৃঙ্খল রূপের সামনে। এই ভ্রমণে ভ্রমণপথ বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেনি। বরং কর্মকুশল বাঙালি মেয়ের উজ্জ্বল ভাবনার নিদর্শনে এই ভ্রমণকথা মন্ডিত।

চিনে কিন্তু মৈত্রেয়ী একা যাননি। এক ঝাঁক ভারত-প্রতিনিধির সঙ্গে গিয়েছিলেন। মূলত ডাক্তার দ্বারকানাথ কোটনিসের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন দু দেশের সরকারের বিবেচনায়। এই দলে ছিলেন দ্বারকানাথ কোটনিসের ভাই বোন, মঙ্গেশ এবং বৎসলা কোটনিস, ডাক্তার বিজয় বসু এবং তাঁর স্ত্রী, প্রখ্যাত গায়ক শ্রী হেমাঙ্গ বিশ্বাস, তেলুগু কমিউনিস্ট মহাকবি শ্রী শ্রী, জ্ঞানসিং ধিংড়া, দীনেশ পাণ্ডে ইত্যাদি। মৈত্রেয়ী এসময় বার্ধক্যেই প্রায় উপনীত। সমস্ত জীবনভর মৈত্রেয়ী সারা পৃথিবী চষে বেড়িয়েছেন। য়ুরোপ আমেরিকা রাশিয়া তিনি বহুবার গিয়েছেন। ফলে আধুনিক জীবনের অঙ্গরাগে তাঁর চোখ অভ্যস্ত। তবু তাঁকে বিস্মিত করে দিয়েছে চীন। কর্মক্ষমতায়, উন্নয়নের প্রকৃত অর্থে এবং ব্যবস্থাপনায়, দূরদর্শিতায় এবং সর্বোপরি জনসাধারণের শৃঙ্খলায়। প্রতিটি মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের চূড়ান্ত প্রকাশে মুগ্ধ মৈত্রেয়ী। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সৌভ্রাতৃত্ববোধের হীরকচূর্ণ। একটি জাতিগঠনে কিরকম এবং কি মাত্রায় আত্মত্যাগ প্রয়োজন হয় তা চিনে গিয়ে বুঝেছেন মৈত্রেয়ী। ব্যক্তিমালিকানার বদলে সমষ্টির মালিকানা এবং উন্নয়নের প্রচেষ্টার ফলে চিনে দরিদ্রের সংখ্যা হাতে গোনা। মহিলারা অত্যন্ত এগিয়ে গিয়েছেন প্রযুক্তিগতভাবে। শূন্য থেকে শুরু করে সে সময়েই তাঁরা সম্পন্ন চাষী এবং বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে তুলে কাজ করছেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে। ইয়ার অব দ্য গ্রেট লিপ চিহ্নিত করে সত্যিই চিনের অধিবাসী এবং প্রশাসন একই মন্ত্রে সমস্ত দেশকে বেঁধে যেন এগিয়ে দিয়েছেন কয়েকশত আলোকবর্ষ। সততার অন্য নাম হয়ে উঠেছে চিন মৈত্রেয়ীর চোখে।

পাঁচ সপ্তাহের চিন ভ্রমণ বিষয়ে লেখার শুরুতেই মৈত্রেয়ী লিখেছেন,

আজকে নতুন চীন দেখে পুরোনো চীনের কথা ফিরে ফিরে মনে আসে। মাদাম চিয়াং-কাই-শেক ছিলেন এশিয়ার জাগ্রত নারীশক্তির প্রতিমূর্তি। চীনের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রতি আমাদের দেশের মানুষ ছিল সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। আমাদের কাছে চিয়াং-কাই-শেক স্বাধীনতা-কামী চীনের প্রতীক

ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন শুধু কাঠামো, শুধু 'ফর্ম'; মূল বস্তু ছিল চীনের আপামর জনগণ, যাদের অধিকাংশই তখন কমিউনিস্ট মতে আস্থাবান। তাদের নেতা মাও-সে-তুং এর কাছে তখন স্বাধীনতা বস্তুটি কি সেকথা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। অবশ্যই একদিনেই তিনি নিশ্চয় সর্বজ্ঞ হননি। ক্রমে স্বাধীনতার অর্থটা তিনি নিজের ও দেশের লোকের কাছে স্পষ্ট করতে পেরেছিলেন। আজ ভাবি, আমাদেরও স্বাধীনতা-যুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু বিদেশী তাড়ানো ছাড়া মানুষকে স্বাধীন করবার কথা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী ছাড়া আর ক'জন ভেবেছিলেন? এবং তাঁরাও বহুজনের মধ্যে তাঁদের মতকে দৃঢ় করতে পারলেন না কেন? তাঁদের কি বিশ্বাস দৃঢ় ছিল না, বাক্যে জোর ছিল না? তা নয়, আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা শৃঙ্খলাবোধের অভাব—তা কখনোই আমাদের কোনো বিষয়ে একমত হতে দেয় না। কোনো যুদ্ধেই অন্তর ও বাহিরের শৃঙ্খলা ছাড়া জয়ী হওয়া যায় না। [পৃ. ৩-৪]

সমস্ত লেখা জুড়ে মৈত্রেয়ীর কলমে খণ্ডিত স্বাধীনতার যন্ত্রণা। ততোখানি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী না হয়েও যিনি একটি রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণের কারণে সামিল হয়েছেন একটি রাজনৈতিক ভ্রমণে, তাঁর পক্ষেই বোধহয় নির্মোহ ভাবে নিজেদের ভাঙাচোরা সমাজব্যবস্থার ত্রুটিগুলি নির্দেশ এবং বিশ্লেষণ করা সম্ভব। মৈত্রেয়ী ক্রমশ আসেন বাংলার ঘেরাও সংস্কৃতি এবং নকশাল আন্দোলনের কথায়। আসলে তাঁর লেখায় দুটি সমান্তরাল রেখা বয়ে যায়, যার একটিতে তিনি তৎকালীন পরিস্থিতিতে জনমানসে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান বুঝতে চেষ্টা করেন, আর আরেকটি রেখায় দেশীয় সমাজ এবং রাজনীতি কি করলে দেশের মানুষের পক্ষে সত্য এবং মঙ্গলের আধার হয়ে উঠবে তার একটি নিজস্ব দিকনির্দেশ দিতে থাকেন। মৈত্রেয়ী কলকাতার কাছাকাছিই মফস্বলের চিত্র তুলে ধরেছেন, যেখানে তাঁর সমাজসেবামূলক খেলাঘর সংস্থা শিশুদের নিয়ে কাজ করে। সেখানে গ্রামের মানুষের হিংসা এবং নীচু রূপের ছবি লিখেছেন অচেনা চীনে, যা পড়লে বোঝা যায় শত বিপ্লব পেরিয়েও শরৎচন্দ্রে পল্লীসমাজের মানুষের মনের অন্ধকার এখনো একই রকম গাঢ়। অচেনা চীন পড়ে নিজেদের সমাজের ছবিগুলি দেখে খুব আশাব্যঞ্জক আনন্দ-অনুভূতি একেবারেই হয়না। মৈত্রেয়ীই হয়তো সেটা চাননি।

ছয়ের দশকে শুরু হওয়া নকশাল আন্দোলনের সম্পর্কে মৈত্রেয়ীর মনোভাব যে কতখানি সত্য তা পরের দশকগুলিতে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। মৈত্রেয়ী লিখছেন,

যে ছন্নছাড়া ছিন্নমস্তা রাজনীতি তখন বাংলায় ও অন্ধ্রে পাইকারি হারে তাণ্ডব শুরু করল তাতে চীনের প্রভাব আছে এ কথা স্পষ্ট হল দেওয়াল লিখনে। মত ধার করা যেতে পারে, কিন্তু এক দেশের

নেতা অন্য দেশের নেতা হতে পারেননা। পরে বোঝা গিয়েছে, এদেশের অনুকরণপ্রিয়, অল্পবুদ্ধি, ‘অ্যাডভেঞ্চারিস্ট’ কতিপয় নেতা ‘কালচারাল রেভলিউশন’-এর নাটক করতে গিয়ে আমাদের আত্মত্যাগের, বীরত্বের উপকরণে পূর্ণ কতগুলি শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিষ্ফল চেষ্টার দিকে শুধু নয়, অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাদের ধ্বংস নয়, ধ্বংস হয়েছিল আমাদের সকলের সাহস—আমরা মেরুদন্ডহীন জীবে পরিণত হয়েছিলাম। তারপ্র আন্দোলন যখন উগ্র হয়েছে, বারে বারে বন্দী ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছি তৎকালীন হোমসেক্রেটারির অনুমতি নিয়ে আমি, গৌরকিশোর ঘোষ, নির্মল চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু বারে বারে প্রশ্ন করেও ওঁদের আন্দোলন-পরবর্তী সমাজভাবনার এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো ব্লুপ্রিন্ট আমরা পেতে পারিনি। বিপ্লবী ছেলেরা তেমন কিছুই আমাদের দিতে পারেনি। তারপর যাদবপুরে ভাইস চ্যান্সেলর গোপাল সেনকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করার পর ঐ আন্দোলনের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে সমস্ত আলোচনা বন্ধ করে দিলাম। [পৃ. ১০]

এই কালো সময়ে আশার আলো হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। মৈত্রেয়ী ঠিক করেন নতুন যুগের চীনে ছড়িয়ে দিতে হবে রবীন্দ্রভাবনা। কেননা দেশে দেশে সাংস্কৃতিক সাঁকো বেঁধেছিলেন বিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথ। এইসময়ে (মৃত্যুর পর) তিনি বাঙালির তথা ভারতবর্ষের কালচারাল আইডল, সংস্কৃতির মূল স্তম্ভ।

মাত্র নয় ঘন্টার বিমানযাত্রায় পিকিং পৌঁছলেন মৈত্রেয়ী এবং তাঁর সহযাত্রীরা। আগের কোনো ভ্রমণকথায় আমরা বিমানযাত্রা পাইনি। বহুদূর মহাদেশ পাড়ি দিতে হত প্রথমে ট্রেনে দেশের সীমার মধ্যে, এবং তারপর জাহাজে। পিকিং এ গিয়ে খাওয়াদাওয়া নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হন মৈত্রেয়ী। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি মেয়ের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ সমস্ত কুসংস্কার এবং পিছুটানকে ছাপিয়ে যায়, বিফ খাওয়া প্রসঙ্গে তিনি জানান ,

এতো রেভলিউশনের কথা বলি, অথচ আমরা সংস্কার ছাড়তে পারিনা। কোন জিনিস খাওয়া না খাওয়া অভ্যাস ও রুচির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বিফ খাওয়া তো তা নয়, তাতে জাত যায়। শাস্ত্রে নিষেধ। এই নিয়ে একটা দেশ ভাগ হয়ে গেল। কোথায় গরুর হাড় পড়ে আছে, তাই নিয়ে মানুষের হাড় বার করা হয়েছে কতকাল ধরে। [পৃঃ১৮]

এ কথার প্রাসঙ্গিকতা এই থিসিস লেখার দিন পর্যন্ত সমান ভাবে জারি রয়েছে আমাদের সমাজে এবং দেশে।

পিকিং-এর মেয়েদের পরিচালনায় পরিচালিত অপটিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের কারখানা দেখে , তাদের কাজের পরিধি এবং সাফল্য দেখে, তাদের মুখে মাও-সে-তুং এর কবিতার পংক্তি "এসো নারী, তুমিই অর্ধেক আকাশ" উচ্চারিত হতে শুনে, দেশের অভাগিনীদের কথা মনে পড়ে যায় মৈত্রেয়ীর। তিনি লিখলেন,

> চীনের মেয়েরা বিপুল কর্মযজ্ঞে সমান দায়িত্ব নিতে গিয়ে তারা মনুষ্যত্বের ও নিজের শক্তির প্রতি আস্থাবান হল। যখন লি-সু-সুই ঐ সুন্দর বাক্যটি উচ্চারণ করলেন, তখন তাঁর মুখে আমি একটি দীপ্তি দেখতে পেলাম। আমি মাও-সে-তুং কে সামান্য বুঝতে পারলাম। আমার অর্ধনারীশ্বর কল্পনা মনে এলো। এর কিছুদিন আগেই স্বদেশে মহিলা সাহিত্যসভায় কোনো এক মুখ্যমন্ত্রীর এক ঘন্টাব্যাপী ভাষণ শুনেছিলাম- নারীজাতির বন্দনা। তার অসারতা তখনই শ্রোতাদের ক্লান্ত করেছিল। যে কথা সত্য হয়নি, যে কথা সত্য করবার কোন অভিপ্রায়ই যেখানে নেই, সেখানে বাক্যরাশি সফেন বুদ্‌বুদমাত্র। [পৃ. ৪৩]

একইসঙ্গে দেশীয় রাজনীতিকদের সম্পর্কে লেখেন,

> আমি তো ভাবতে পারি না যে, এরকম একটা কার্যকরী বৈষয়িক পরিকল্পনা করবার সময় কোন রাজনৈতিক নেতা আকাশের কথা ভাববেন! সূচ্যগ্র ভূমির জন্য যাঁরা নিম্নমুখী হয়ে তড়পাচ্ছেন ঊর্ধ্ব আকাশের কথা তাঁদের মনেই পড়বে না। আমাদের তো বিপ্লব মানে ঘেরাও করো উৎপাদন ধ্বংস হোক। [পৃ. ২৮-২৯]

মৈত্রেয়ীর লেখায় যুগের গরল স্পষ্ট। ভ্রমণের আনন্দ আছে কিন্তু তার চেয়েও বেশি আছে স্বাধীন ভারতবর্ষের ক্রমাগত রাজনীতিতে পেঁচিয়ে যাওয়া, স্বার্থগন্ধী, কালিমাখা ক্লীব রূপ। তিনি লিখেছেন তাঁর সেবামূলক সংস্থা 'খেলাঘর'কে কিভাবে সমস্যায় পড়তে হয় মানুষের ঈর্ষার আঁচে পুড়ে যেতে যেতে। খন্ডিত ভারতবর্ষের দ্বিধাক্লান্ত মুখ হয়ে ওঠে মৈত্রেয়ী দেবীর অচেনা চীন। তা চীন কে একটি নির্দিষ্ট কালবৃত্তে অবশ্যই চেনায় কিন্তু আরো বেশি করে চেনায় দারিদ্র্য, অন্যায়-অবিচার-লাঞ্ছনার বলিরেখাপুষ্ট ভারতবর্ষকে।

তথ্যসূত্রঃ

১. রবীন্দ্র জীবন কথা, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৬ বিশ্বভারতী, প্রথম আনন্দ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ১৯৯৭ , আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৯৮-১০০

# উপসংহার

নারীমুক্তির পাশ্চাত্য থিওরিগুলি দানা বেঁধে ওঠার অনেক আগেই বাঙালি মেয়েরা নিজেদের মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিলেন। মুক্তি এবং স্বাধীনতার সর্বাত্মক চিন্তা করেছিলেন তাঁরা। তাই বুদ্ধি , জ্ঞান এবং ভাবনার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কায়িক মুক্তির ভাবনাকেও স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁরা। উপসংহার পর্বে এক বিশেষ বাঙালিনীর বিশেষ একটি ভ্রমণকথা বিষয়ে সামান্য আলোচনা করে মেধাবী বাঙালি মেয়ের দেখার চোখ আর বলার কথার পারিপাট্য বিষয়ক কয়েকটি কথা বলে অধ্যায় শেষ করবো। সরলা দেবীর লেখা ভ্রমণকথা, 'বর্ম্মা-যাত্রা'[১] ভারতবর্ষ পত্রিকায় কার্ত্তিক ও চৈত্র ১৩৩৮ এবং শ্রাবণ ১৩৩৯ এ (ইং ১৯৩১-১৯৩২) প্রকাশিত হয়। বাঙালি মেয়ের একাকী দেশের বাইরে ভ্রমণের এক দার্ঢ্যময় কাহিনী এটি। তবু এই লেখাটিকে আমরা আমাদের মূল আলোচনার মধ্যে গ্রহণ করতে পারিনি কারণ আমাদের অভিসন্দর্ভের অভিমুখ অনুযায়ী বাঙালি সমাজের বিবর্তন সেখানে খুব বেশি কিছু ধরা পড়েনি। বরং সমস্ত লেখাটিতে সামগ্রিক ভারতবর্ষীয় সমাজের তৎকালীন বিভিন্ন রকম পরিচয় ঘুরে ফিরে প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্যেই সামান্য এসেছে বাঙালি সমাজ, বাঙালি মেয়েরা এবং কলকাতার কথা।  প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা দরকার সরলা দেবী পঞ্জাবি নেতা রামভুজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে এবং কংগ্রেসের নেত্রী হওয়ার সূত্রে সমস্ত দেশ পর্যটন করার সুযোগ পেয়েছিলেন নিবিড়ভাবে। তাছাড়াও রাজনৈতিক আগ্রহ এবং ব্যক্তিত্ব তাঁর চিরকালই প্রখর। তাই বিশ শতকের প্রথম থেকেই তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯০১ থেকেই কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজক এবং দায়িত্বশীল মুখ ছিলেন সরলা। বিশ শতকের ভারতীয় রাজনীতির মহানায়ক গান্ধীর সঙ্গেও বহুস্তরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল সরলার। এহেন সরলার লেখা শুধুমাত্র বাঙালি মেয়ের সামাজিক ভূমিকার আলোচনায় আটকে না থেকে সার্বিকভাবে আধুনিক মেয়েদের সম্পর্কে এবং দেশ ও জাতির নানাবিধ সামাজিক উপকরণ সম্পর্কে কথা বলবে সেটাই স্বাভাবিক। সরলার লেখার মধ্যে তাছাড়াও প্রকাশ পায় নারী সংক্রান্ত আজন্মলালিত ধারণার আদিপ্রতিমা। ভালো মন্দ সবটুকুই নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন সরলা। ব্যক্তিজীবনে বিভিন্ন বিষয়ে প্রথাবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া সরলার লেখায় তাই আধুনিক আর চিরায়তের অসামান্য মেলবন্ধন।

১৯৩১ এ বর্মা যাত্রা করেন সরলা একা। লেখার শুরুতেই বাঙালি কন্যার সমুদ্রযাত্রা নিয়ে তির্যকভঙ্গীতে লেখেন,

লাহোরের একজন মুসলমান গণৎকার একটি বাঙ্গালী মেয়ের হাত দেখে বলেছিলেন –"এর সমুদ্রযাত্রা অবশ্যম্ভাবী।" সকলে হেসে অস্থির ! যা শতকরায় দেড়শখানা অসম্ভব, এমন একটা বাজে গণনা করলে কে না হাসবে ? [পৃ. ১৩৫, 'বর্ম্মা-যাত্রা', পথের কথা]

এবং,

দৈব আর পুরুষকারের মাঝে ভেদের গন্ডিটা কোথায় টানা যেতে পারে? আমার পক্ষে সমুদ্রযাত্রা করা না করা নিতান্তই আমার স্বেচ্ছাধীন। [পৃ. ১৩৫]

হ্যাঁ সরলা নিজস্ব ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিতে শিখে নিয়েছিলেন সমাজের অন্যান্য স্তরের অবহেলিত উৎপীড়িত মেয়েদের জীবনকে গভীরভাবে দেখে। স্বর্ণকুমারী দেবী এবং জানকীনাথ ঘোষালের উচ্চশিক্ষিত কন্যার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল তা। কিন্তু সরলার লেখা থেকে দেখা যায় নারীর মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে তিনি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে বেশ একটু রক্ষণশীল। বার্মায় ১৯৩১ এর হিন্দু মহাসভার সভানেত্রী হিসেবে তিনি সমুদ্রযাত্রা সত্যিই করলেন। নিজেকেই প্রথমে বিশ্বাস করাতে পারছিলেন না, যদিও সাময়িক সমুদ্রপীড়ার স্বাদ পেয়ে বাধ্য হলেন বিশ্বাস করাতে। তারপর কয়েকদিনের মধ্যে বার্মা পৌঁছে দেখলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়ে সমুদ্রতটে।  লাল নিশানে ছেয়ে গিয়েছে তীরভূমি, বন্দর। স্বাধীনতাপূর্বকালে কোনো বাঙালি নারীর জীবনে এমন বিশ্বের দরবারে লাল সূর্য সম্মানের দিন, অহংকারের দিন খুব বেশি আসার সুযোগ একেবারেই ছিল না। যাওয়ার পথে সমুদ্রের রূপবর্ণনা না দিয়ে বরং সরলা কিছু থার্ডক্লাসের যাত্রী বাঙালি মেয়ের বর্ণনা দিয়েছেন ফার্স্টক্লাসের ডেকে,

মেয়েগুলি খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া পাখীর মতো ঘুরঘুর করতে লাগল। একবার ফার্ষ্টক্লাসের ডেকে একবার সেকেণ্ড ক্লাসের ডেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে। ... বয়স কারো ষোল সতের বছরের বেশী নয়, আলতামাখা খালি পা, সিঁথেয় ধ্যাবড়া করে সিন্দূর মাখা। যদিও একালের ফ্যাশনে ফেরতা দিয়ে শাড়ী পরবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তেমন পারিপাট্য ফুটাতে পারেনি – দেখলেই মনে হয় পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। পরে তাদের সঙ্গে কথা কয়ে জানলুম তারা পাড়াগাঁয়ের নয়, কলকাতারই মেয়ে বটে, কিন্তু এমন শ্রেণীর, যাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা বা অপর শ্রেণীর দশজনের সঙ্গে মেলামেশাটা এখনও

প্রচলিত নেই। বেচারীদের তাই আজ এতো নিঃসঙ্কোচ স্ফূর্ত্তি। কেউ বাধাও দিচ্ছে না। ... অবশেষে এই মেয়েগুলির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলে জাহাজের আধবুড়ো সারিঙ। সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে তাদের দৌরাত্মি সহ্য করে করে , একবারটি এসে বল্লে – "মা'রা, আপনারা এখানটায় বসবেন না, এটা ফাষ্টো ক্লাস, সাহেবরা রাগ করবেন।" মেয়েগুলি তখনকার মতো উঠে গেল। আবার খানিক বাদে এসে সোশ্যালিজম ভাবগ্রস্ত একটি মেয়ে বল্লে, --" এতগুলো চেয়ার পড়ে রয়েছে, বসতে দেবে না? চল্ না ভাই এদিকে টেনে এনে বসি।" আর একটি অপেক্ষাকৃত সুবুদ্ধি বা ভীরু মেয়ে বললে, -- "না ভাই, বকবে।" এই জাহাজে চাঁটগায়ী সারিঙ ছাড়া তাদের সীমা ও মর্য্যাদারক্ষার শিক্ষা দেবার জন্য আর কেউই ছিল না। [পৃ. ১৩৭]

এবং সন্ধ্যেয় জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে আলাপ হলে কাপ্তেন উবাচ তুলে ধরেন পুরুষপ্রজাতি নিজের বক্তব্য সহযোগে,

তাঁর স্ত্রী দাসী-চাকরদের মোটে শাসনে রাখতে পারেন না... মেয়েদের বেশি লেখাপড়া প্রীতি কোনো কাজের নয়, তাতে তারা ঘরকন্নায় অপটু হয়ে পড়ে। তাঁর স্ত্রী তার একটি নিদর্শন। ... স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তাঁর সাধারণ অভিমতটা মনুপ্রমুখ পুরুষপুঙ্গব মাত্রেরই মত, সব অবস্থাতেই তাদের পরবশে রাখা সমীচীন মনে করেন। [পৃ. ১৩৯]

আবার বার্মা পৌঁছে বিপুল রাজনৈতিক এবং উচ্চ-সামাজিক অভিবন্দনায় ভূষিত সরলা বার্মার এক বলিয়ে কইয়ে মিশনারী স্কুলে শিক্ষিতা অতিআধুনিকাকে দেখে পছন্দ করতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছে এমন প্রগলভতা প্রাচ্যদেশীয় কন্যার পক্ষে বেমানান। বার্মার মেয়েদের পোষাকের চলতি ফ্যাশন নিয়েও ঠিক আনন্দিত হতে পারেননি। তবে সব ক্ষেত্রেই বাঙালির অসম্মান বা মেয়েদের অসম্মান তাঁকে বিঁধেছে। বার্মা নিবাসী গুজরাতি ব্যবসায়ী যখন বলেন বাঙালিরা কর্মদক্ষ অথচ স্বার্থপর এবং ভীরু সম্প্রদায়, তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেনা নিজেদের অসুবিধা ঘটবার আশঙ্কায়, তখন সরলার যতটা খারাপ লাগে, ঠিক ততটাই খারাপ লাগে বিখ্যাত প্যাগোডা শোয়ে ডাগন ঘুরতে গিয়ে যখন মুগ্ধ হয়ে দেখেন ঈশ্বর সকলের— ভক্তের এবং পূজারীর; ঈশ্বরকে নিয়ে ব্যবসার কোন পদ্ধতি সেখানে প্রচলিত নয়, নিজেদের দেশের সুপ্রাচীন তীর্থস্থানগুলির দুরবস্থার কথা মনে পড়ে যায় এবং কিভাবে এক একটি মন্দির শোষণের ও বিভেদের যন্ত্র হিসেবে কাজ করে আমাদের দেশে তার অস্বস্তিকর ছবি মনে পড়ে মন বিষাদে পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি লেখেন,

ঠাকুর সকলেরই নিজস্ব, সকলেরই স্বহস্তে সেবনীয়, শুধু পাণ্ডা পুরোহিতের নয়। ... বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই কি ভারতের যত সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি বৌদ্ধজগতে পলাতকা হয়েছে? আর তাকে হতভাগ্য ভারতে ফিরে আনা যায় না? যে মন্দিরের পুরোহিতেরা আচারে ব্যবহারে, আকারে প্রকারে অপরিচ্ছন্নতা ও শ্রীহীনতার প্রতিমূর্ত্তি, সে মন্দিরগুলিও যে শ্রীহীন এবং তার দেবতারাও শ্রীহীন হবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি? [পৃ. ১৫৬-১৫৭]

সরলার আত্মসচেতন নারীদৃষ্টি বেশ সূক্ষ্ম। বার্মা আসার পথে জাহাজে গুজরাটি ব্যবসায়ীর বন্ধু স্থানীয় মুসলমান বণিক সহযাত্রীটি সরলার এবং তাঁর কাজের পরিচয় পেয়েও , কী উদ্দেশ্যে বার্মা যাচ্ছেন তার কথা জেনেও একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি এই বাঙালি কন্যাকে। সরলা তারপর লিখছেন,

মুসলমান বণিক বন্ধুটি বার্মার প্রাদেশিক হিন্দু কনফারেন্সের মনোনীত সভানেত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে বন্ধুর কাছে যেমনি শুনলেন আমার অগ্রজ তাঁদের শহরের ভূতকালীন কমিশনার ঘোষাল সাহেব, অমনি আমার কাছে এসে সেলাম করে তাঁর উল্লেখ করে অনেক আপ্যায়নজনক কথা বললেন। [পৃ. ১৪১]

শুধু ভাবতে পারারই নয়, সেই ভাবনাকে যথাযোগ্য ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশ করায় সরলার দক্ষতা অদ্বিতীয়। জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ে পড়ার বিষয়ে লিখতে গিয়ে নিজেদের সমাজ তথা দেশের কথা লেখেন সরলা।

কালাপানির ঘোর কালো জল ভারতকে আগলিয়ে রয়েছে। ভীষণ অঘোরীর মত শাণিত ফেনিল অস্ত্র দেখিয়ে পথিকের পথ রোধ করতে চাইছে। কিন্তু ব্যর্থ তার আস্ফালন। চেতনের ইচ্ছাশক্তির কাছে জড়ের শত উদ্যম ও পরাস্ত। এই ভীষণ সমুদ্রপথ বেয়েই বিদেশীরা ভারত উপকূলে উপনীত হয়ে ভারতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে। আজ ভারতের লোক ও কালাপানির অভিভাবকতায় আর ত্রস্ত নয়। তারাও কালো থেকে নীল, নীল থেকে সবুজ, সবুজ থেকে সাদা জলের রাজপথ ঘুরে ফিরে বিশাল ভারতের উপান্তে দেশ দেশান্তে উপস্থিত হচ্ছে। সেই পথ ধরে আমিও চলেছি। [পৃ. ১৪৩]

সরলা গেয়েছেন মানুষের জয়গান। নারী আর বিশ শতকে শুধুই নারীত্বের নিয়ম বাঁধা গন্ডিতে আটকে নেই। নিজের অস্তিত্বকে সম্মান করে মহাকালের মহাজীবনের স্রোতে পুরুষেরই মতো সেও এক কণা বিস্ময় বহন করে এবং স্থাপন করে যেতে পারে, এই বোধ সরলার মধ্যে সদাজাগ্রত। আর এই বোধে পৌঁছবার লক্ষ্যেই বাঙালি মেয়েরা শিকল ভাঙার গান শুরু করেছিলেন।

আমরা আমাদের কাজের ছোট-বড় এগারোটি অধ্যায়ে, মোট ২৮ জন নারীর ভ্রমণকথা, তাঁদের ভাবনা এবং কাজের ধারা, সমাজে ও ভাবীকালের লক্ষ্যে তাঁদের অবদান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরা ঘরের চারদেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকলেও যুগের চাহিদা বুঝে নিতে ঠিকই সক্ষম হয়েছিলেন। জাদুকরীর মতো ইন্দ্রজালের মায়ায় নিজেকে গড়ে গুছিয়ে নিয়েছিলেন অনেকেই এবং বেরিয়ে পড়েছিলেন সমস্ত বাঁধন উপেক্ষা করে। ঊনবিংশ শতকে সারদাসুন্দরী দেবী সন্তানের অসুস্থতার জন্য নিজের ভ্রমণ রদ করেননি। আবার বিংশ শতকে রানী চন্দও প্রায় সেই একই কাজ করেছেন। সমাজের সাধারণ অংশের মেয়েদের কাছে এই উদাহরণ গুলি অত্যন্ত মানসিক শক্তি এবং সাহসের পরিচায়ক। স্বর্ণকুমারী দেবী কলকাতা থেকে পুণা আর জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পুণা থেকে ইংল্যাণ্ড গিয়েছেন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়। জ্ঞানদানন্দিনী সন্তান হারিয়েওছেন, কিন্তু তাতে ভ্রমণের দোষ দেখা হয়নি। ঝুটো শাস্ত্রের অন্যায় বচনের দোহাই দিয়ে মেয়েদের আটকে রাখা ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণভাবিনী দেবীর সংগ্রাম জ্ঞানশলাকা লাভের জন্য তাঁদের সময়ের চেয়ে প্রাগ্রসর ছিল। শুধুমাত্র ব্যক্তির নয়, বৃহত্তর স্বার্থে এবং পরিমণ্ডলে নারী পুরুষ উভয়েরই মঙ্গলচিন্তা করেছেন কৃষ্ণভাবিনী। সেই ভাবনায় জারিত হতে দেখেছি তার প্রায় একশ' বছর পরের মৈত্রেয়ী দেবীকেও। তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে তা স্পষ্ট।

তবে একটা কথা অবশ্যই স্পষ্ট যে অনেকটা পথ চলে আসা হলেও এখনো আরো আরো কাজ বাকি আছে, আরো অনেক উদাহরণ হয়ে ওঠা বাকি আছে। তাই পাশ্চাত্যের তত্ত্বগুলির ফ্রেমে বাঙালি মেয়ের নারীমুক্তি সংক্রান্ত ভাবনা এবং সুদীর্ঘ সংগ্রামকে ঠিক ঠিক হয়তো আঁটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। তবে যে সময়ের কথা বলছি, সেখান থেকেও বর্তমানে প্রায় আরো নয়টি দশক পেরিয়ে এসেছি আমরা। মুক্তির ভাবনা সামাজিক পারিবারিক ক্ষেত্রে এখন আর বিশেষ ভাবনা নয়, নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা এক স্বাভাবিক ভাবনা। তবুও এখনো সমস্ত আলোগুলি জ্বলে ওঠেনি। সুচেতনার, সমতার সেই অসামান্য অমৃতনিস্যন্দী পর্বে পৌঁছতে আরো কিছু সময় এবং আরো কিছু প্রয়োজনীয় কাজ করার দরকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। যেহেতু এই লেখাগুলির সবগুলিই সমান পঠিত হয় না বা বেস্ট সেলার নয় তাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ থেকে এই বিষয়ে ভবিষ্যতে যদি কেউ সামান্যও সাহায্যলাভ করেন

তবেই সার্থক হবে আমাদের সমস্ত পূর্বনারীদের ভাবনা এবং লেখাগুলি, সার্থক হবে এই কাজটিও।।

তথ্যসূত্রঃ

১. সরলা দেবী চৌধুরাণী, 'বর্ম্মা-যাত্রা', পথের কথা শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ, অভিজিৎ সেন, উজ্জ্বল রায় (সম্পা), প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ১৯৯৯, স্ত্রী, কলকাতা।

# গ্রন্থতালিকা

## আকরগ্রন্থঃ

১. সারদাসুন্দরী দেবী, ফিরে দেখা -২, প্রথম সংস্করণ ২০১০, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

২. সৌদামিনী দেবী, পিতৃস্মৃতি ও অন্যান্য রচনা, সেপ্টেম্বর ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

৩. রাজলক্ষ্মী দেব্যা, কেদার-বদ্‌রী ভ্রমণকাহিনী ও অন্যান্য তীর্থচিত্র, সংকলন, অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৪১২, সেপ্টেম্বর ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

৪. শ্রী রানী চন্দ, পূর্ণকুম্ভ, প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৫৯, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা

৫. শ্রী রানী চন্দ, হিমাদ্রি, প্রকাশ পৌষ ১৩৬৩, সংস্করণ আষাঢ় ১৩৭১, পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৪১৪ , বিশ্বভারতী, কলকাতা

৬. নবনীতা দেবসেন, 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে', নব-নীতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৩, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৭. নবনীতা দেবসেন, 'হে পূর্ণ তব চরণের কাছে', ভ্রমণ সমগ্র, প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৯, মাঘ ১৪১৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৮. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (অনুলিখন ও সম্পা) , পুরাতনী, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৯. অভিজিৎ সেন,উজ্জ্বল রায় (সম্পা), পথের কথা শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ, প্রথম প্রকাশ- অগাস্ট ১৯৯৯, স্ত্রী, কলকাতা

১০. প্রত্যুষকুমার রীত (সম্পা), স্বর্ণকুমারী দেবীর ভ্রমণকথা, প্রথম প্রকাশ –জানুয়ারি ২০১২, পুনশ্চ, কলকাতা

১১. দময়ন্তী দাশগুপ্ত (সংকলন ও সম্পা), অবলা বসুর ভ্রমণকথা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, পৌষ ১৪২১, পরশপাথর, কলকাতা

১২. পুণ্যলতা চক্রবর্তী, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১৩. অনিল ঘোষ (সম্পা), রোকেয়া রচনাবলী, কথা সংস্করণ ২০১৪, কথা, কলকাতা

১৪. রানী চন্দ, আমার মা'র বাপের বাড়ি, প্রকাশ ১ বৈশাখ, ১৩৪৮, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৩৯৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

১৫. শ্রী নির্মলকুমারী মহলানবিশ, কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে, শ্রী সুপ্রিয় ভট্টাচার্য (সম্পা), দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৪, সাগ্নিক বুকস্, কলকাতা

১৬. শ্রী রানী চন্দ, সব হতে আপন, প্রথম প্রকাশ ২৫ বৈশাখ, ১৩৯১, সংস্করণ পৌষ ১৪০১, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭

১৭. বীণা দাস, শৃঙ্খল ঝঙ্কার, ভূমিকাঃ রবিন পাল, অগ্নিযুগ গ্রন্থমালা ১১, প্রথম র‍্যাডিকাল সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা

১৮. শ্রী রানী চন্দ, জেনানা ফাটক, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জুন ১৯৮৩, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১৯. নবনীতা দেবসেন, ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

২০. সীমন্তী সেন (সম্পাদনা ও ভূমিকা), কৃষ্ণভাবিনী দাসের ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, স্ত্রী, কলকাতা

২১. বিমলা দাসগুপ্তা, নরওয়ে ভ্রমণ এবং কাশ্মীরে ক'দিন, ভূমিকা সীমন্তী সেন, সংকলন অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৭, পৌষ ১৪১৪, দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেন্‌স্‌ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

২২. প্রত্যুষকুমার রীত (সম্পা), 'শোভনাসুন্দরী দেবীর ভ্রমণকথা', ঠাকুরবাড়ির ভ্রমণকথা, প্রথম প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৪১৯, মে ২০১২ , পত্রলেখা, কলকাতা

২৩. অমলাশঙ্কর, সাত সাগরের পারে, য়ুরোপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় প্রকাশ কলকাতা বইমেলা মাঘ ১৪১৩, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

২৪. দুর্গাবতী ঘোষ, পশ্চিমযাত্রিকী, সম্পাদনাঃ অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩, দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেন্‌স্‌ স্টাডিজ, কলকাতা

২৫. উমা সিদ্ধান্ত, ইউরোপের ডায়েরি, প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ২০১২, রক্তকরবী, কলকাতা

২৬. হরিপ্রভা তাকেদা, বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা, সম্পাঃ ড. মঞ্জুশ্রী সিংহ, প্রথম ডি. এম. কলকাতা সংস্করণ পৌষ ১৪১৫, জানুয়ারি, ২০০৯ , ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা

২৭. সীমন্তী সেন (সম্পা), ইন্দুমাধবের চীন ভ্রমণ সরোজনলিনীর জাপানে বঙ্গনারী, প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১০, ছাতিম বুকস্‌, পরিবেশকঃ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা

২৮. মৈত্রেয়ী দেবী, অচেনা চীন, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৭৮, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

আকর পত্র-পত্রিকাঃ

১. রমাসুন্দরী ঘোষ, কাশী-দর্শন, বামাবোধিনী পত্রিকা, সম্পাঃ উমেশ চন্দ্র দত্ত, ফাল্‌গুন ১২৭০, কলকাতা,

২. শ্রী লক্ষ্মীমণি দেবী (বসু), বিদেশ ভ্রমণ, বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ- আষাঢ়, ১২৭৭, কলকাতা

৩. অনামা ভগিনীদ্বয়, 'আমাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত', ভাদ্র-ফাল্‌গুন ১২৭৯, ইং. ১৮৭২, বামাবোধিনী পত্রিকা, সম্পাঃ উমেশ চন্দ্র দত্ত , খন্ড ১০, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, কলকাতা

৪. Samita Sen (Edited by) , Newsletter, School of Women's Studies, vol. 26, November 2010, Jadavpur University, Kolkata


সহায়ক গ্রন্থ তালিকাঃ

বাংলাঃ

১. সোমেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা) , 'প্রফুল্লময়ী দেবী', 'আমাদের কথা', স্মৃতিকথা, ৪র্থ সংস্করণ, বৈতানিক প্রকাশনী, কলকাতা

২.রাসসুন্দরী দাসী, আমার জীবন, দ্বিতীয় কলেজস্ট্রিট সংস্করণ-বইমেলা ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ-অক্টোবর ২০০২, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৩. অরুণা চট্টোপাধ্যায় (ভূমিকা ও সম্পাদনা), সহায়তা অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৪১১, অগাস্ট ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

৪. চিত্রা দেব, অন্তঃপুরের আত্মকথা, প্রথম সংস্করণ বইমেলা ১৯৮৪, সপ্তম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৫. চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, প্রথম সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৩৮৭, তৃতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণের সপ্তম মুদ্রণ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৬. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবন কথা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৬, বিশ্বভারতী, প্রথম আনন্দ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ১৯৯৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৭. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৪০১, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

৮. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, প্রথম প্রকাশ ১৯১৫, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা

৯. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, উপনিষদ, প্রথম ভাগ, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১০. অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী (সংকলক), স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭, দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেন স্টাডিজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

১১. দময়ন্তী দাশগুপ্ত (সংগ্রহ, বিন্যাস ও উপস্থাপনা), আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমহিলাদের ভ্রমণকথা প্রথম পর্ব, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৬, গাংচিল, কলকাতা

১২. ফিরে দেখা-১, প্রসন্নময়ী দেবী, আমোদিনী দাশগুপ্ত, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

১৩. রাজশ্রী বসু, নারীবাদ, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১২, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

১৪. শেফালি মৈত্র, নৈতিকতা ও নারীবাদ দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা, দ্বিতীয় নিউ এজ সংস্করণ জুন ২০০৭, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৫, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১৫. সরলা দেবী, জীবনের ঝরাপাতা, প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ বইমেলা ২০০৭, কলকাতা

১৬. শ্যামলী বসু, সেকাল ও সেকালিনী, প্রথম প্রকাশ ২০০১, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

১৭. অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্তমালা-৩, ফেব্রুয়ারি ২০১১, বঙ্গীয়- সাহিত্য- পরিষৎ, কলকাতা

১৮. শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, স্মৃতিসম্পুট ১, সম্পাদনা অনাথনাথ দাস, ডিসেম্বর ১৯৯৭, রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, কলকাতা

১৯. চিত্ররেখা গুপ্ত, প্রথম আলোর চরণধ্বনি [উনিশ শতকের লেখিকাদের কথা] , প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৯, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা

## সহায়ক গ্রন্থঃ ইংরেজি বই

1. ***Simonti Sen, Travels to Europe Self and Other in Bengali Travel Narratives*** 1870-1910***, First Published*** 2005***, Orient Longman Private Limited, New Delhi***
2. Mary Morris with Larry O' Connor (Edited by), The Virago Book of Women Travellers, 1993, Virago Press, London
3. Virginia Woolf, A Room of One's Own, First published 1928, Published in Penguin Books 1945, Reprinted in Penguin Classics 2000, UK
4. Miriam Brody (Edited by), Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, Penguin Books, Revised Edition 2004, UK

5. Alba Amoia, bettina L. Knapp, Great Women Travel Writers 1750 to present, 1 January 2005, Continuum International Publishing Group Limited , New York, US
6. Ramachandra Guha, Gandhi: The Years That Changed The World 1914-1948, 11 September 2018, Penguin Allen Lane, India
7. Geraldin Forbes, Lost Letters and Feminist History: The Political Friendship of Mohandas K. Gandhi and Sarala Devi Chaudhurani , 4 August 2020, Orient Blackswan Pvt. Ltd., UK

## সহায়ক পত্র-পত্রিকাঃ

১. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার' প্রবন্ধ, 'প্রদীপ' সচিত্র মাসিক পত্রিকা, সম্পাঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় , ভাদ্র ১৩০৬ , পৃ. ৩১৪-৩১৬, খন্ড-৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, কলকাতা

## সহায়ক বৈদ্যুতিন মাধ্যম (আন্তর্জাল)

1. haring.com
2. https://www.tate.org.uk/art/artists/antoine-pevsner-1761
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Mitoraj
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder
5. https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Bangla+Rare+Books%22